সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান

মাহমুদুল হাসান নিজামী

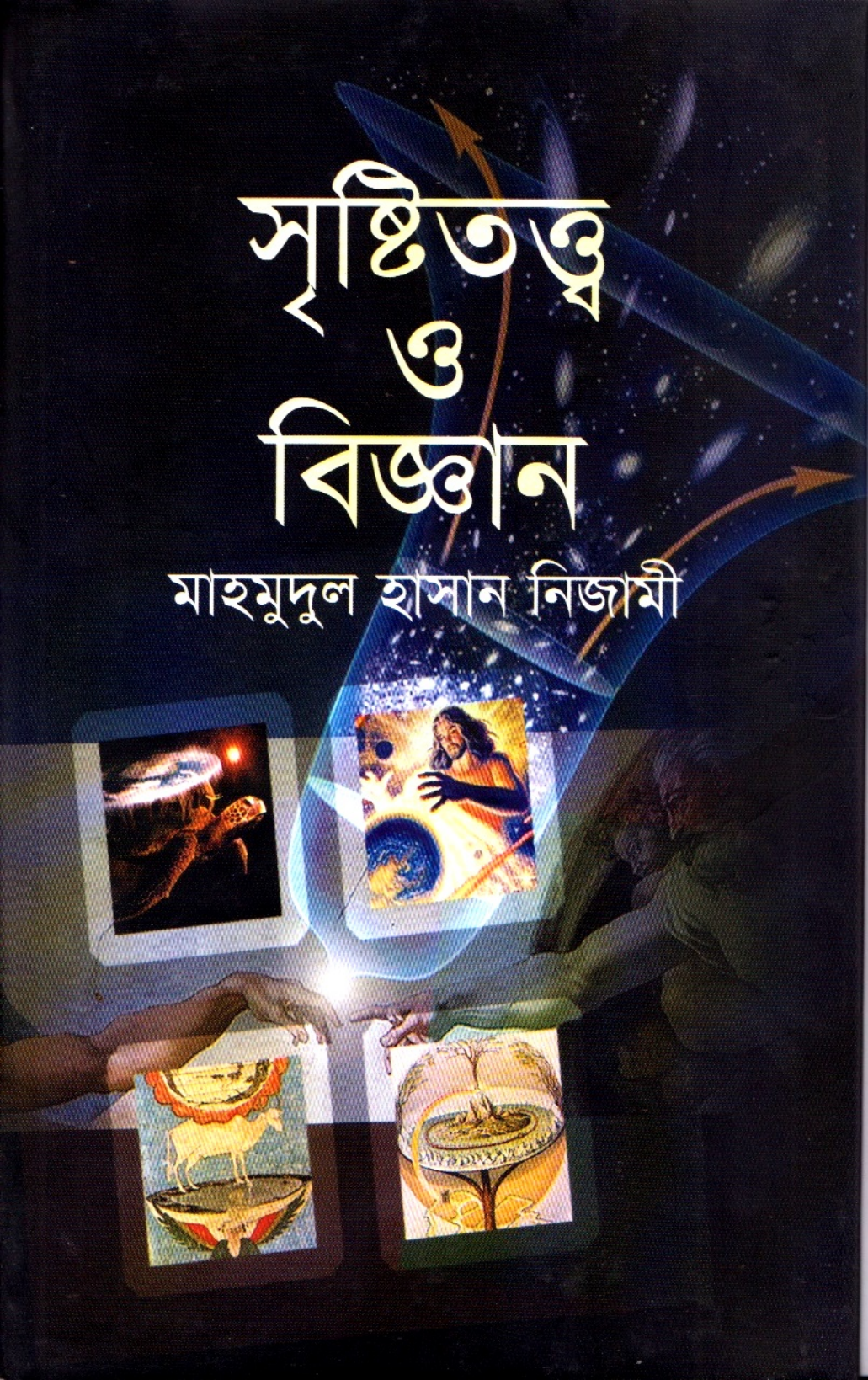

কবি মাহমুদুল হাসান নিজামী বর্তমান সময়ে বাংলা সাহিত্যের অতি পরিচিত নাম। তিনি একাধারে কবি, গল্পকার, গীতিকার, আবৃত্তি শিল্পী, ক্বারী ও সাংবাদিক।

এতসব বিরল প্রতিভা ও গুণের অধিকারী মাহমুদুল হাসান নিজামীর প্রকাশিত গ্রন্থ সংখ্যা ৬০টি। তাছাড়া তাঁর এক হাজারেরও অধিক গাওয়া গান ও আবৃত্তি তাঁকে অনন্য ব্যক্তিত্বের পরিচয়ে অভিষিক্ত করেছে। তিনি নিয়মিত কাব্যচর্চা, বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আবৃত্তি পরিবেশন করে থাকেন। এসবের ভিতর দিয়েই তাঁর পরিচিতি ও ব্যক্তিত্বের প্রসার ঘটে।

পৃথিবী কখন সৃষ্টি হয়েছে : কিভাবে সৃষ্টি? মানুষ কখন সৃষ্ট হয়েছে কিভাবে সৃষ্টি হয়েছে ; মানুষ ও পৃথিবী সৃষ্টি নিয়ে বিজ্ঞান কি বলে এবং প্রধান প্রধান ধর্মগ্রন্থগুলো কি বলে? এ সব বিষয়ে একটি তথ্যবহুল যুক্তিক ব্যখ্যায় সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান নামক গ্রন্থ : জ্ঞান পিপাসুদের জন্য বই অনন্য প্রেরণা যোগাবে।

প্রচ্ছদ : মোবারক হোসেন লিটন

সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান

মাহমুদুল হাসান নিজামী

প্রকাশ

www.pathagar.com

সৃষ্টিতত্ত্ব ও বিজ্ঞান
মাহমুদুল হাসান নিজামী

© লেখক

প্রথম প্রকাশ
একুশে বইমেলা ২০১৮

রোদেলা ৪৯৫

প্রকাশক
রিয়াজ খান
রোদেলা প্রকাশনী
রুমি মার্কেট (২য় তলা) ৬৮-৬৯ প্যারিদাস রোড
বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০।
সেল: ০১৭১১৭৮৯১২৫

প্রচ্ছদ
মোবারক হোসেন লিটন

অনলাইন পরিবেশক
http://rokomari.com/rodela

মেকআপ
ঈশিন কম্পিউটার
৩৪ বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

মুদ্রণ
আল-কাদের অফসেট প্রিন্টার্স
৫৭, হৃষিকেশ দাস লেন, ঢাকা-১১০০

মূল্য : ২০০.০০ টাকা মাত্র

Srisritotto O Biggan : By Mahmudul Hasan Nizami
First Published Ekushe Boimela 2018
Published by Riaz Khan, Rodela Prokashani
68-69. Paridas Road, Banglabazar, Dhaka-1100.
E-mail: rodela.prokashani@gmail.com
Web. www.rodelaprokashani.com

Price : Tk. 200.00 Only US $ 8.00
ISBN: 978-984-93110-1-0 Code : 495

www.pathagar.com

উৎসর্গ

ফিরোজা হক

www.pathagar.com

www.pathagar.com

বইটি লেখার প্রয়োজনীয়তা

সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞান ধর্ম নামক বইটি কেন লিখলাম? চিন্তাশীল মানুষ সৃষ্টি রহস্য নিয়ে গভীরভাবে ভাবেন। সদা উৎসুক্য থাকেন রহস্য জানতে। জ্ঞানী-গুণী, বিজ্ঞানীরাও এ বিষয়ে অনেক গবেষণা করেছেন এখনো অব্যাহত রেখেছেন সৃষ্টির আদি রহস্য উদঘাটনে। চিন্তাশীল মানুষ, মানুষ সৃষ্টির রহস্য উদঘাটনেও অধীর। তাই রহস্যতত্ত্ব নিয়ে আমারও ভাবনা জাগে। পড়ালেখা শুরু করি এ বিষয়ে–বিভিন্ন ধর্ম গ্রন্থ, বিজ্ঞানী ও চিন্তাশীল গুণী মানুষের বই। খুলে যায় সৃষ্টিতত্ত্ব নিয়ে আমারও অন্য একটি দরোজা। তাইজন্যই এ বইটি লেখায় হাত দিলাম। সৃষ্টি রহস্য নিয়ে জ্ঞানী-গুণী চিন্তাশীল মহৎজনের চিন্তার সাথে আমার ভাবনাটাকে আরো সহজ করে পাঠকের উপস্থাপনই আমি করেছি মাত্র। যে সব জ্ঞানী-গুণী মানুষের বই থেকে তথ্যগুলি নিয়েছি তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞ। বইটিতে কোন যুক্তি যুক্ত-ভ্রম ধরা পড়লে দয়া করে জানালে পরবর্তী মুদ্রণে সংশোধনী আনা হবে। কারণ মানুষ হিসাবে কেউই ভুলে উর্ধ্বে নয়।

মাহমুদুল হাসান নিজামী
কবিতা বাড়ী
৫৮/১ এ পুরানা পল্টন, ঢাকা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচি

আধুনিক বিজ্ঞানে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ৪৬০ কোটি বছর পূর্বের পৃথিবী	১১
বিজ্ঞানীদেরসূত্রে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি	১৪
বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ	১৬
কিয়ামত, মহাধবংস বৈজ্ঞানিক ও কোরআনের সূত্র	২০
মহাধ্বংস বা বিগ ব্যাং ক্লোজড বিষয়ে কোরআনের সূত্র	২১
সৌর প্রতিরক্ষা, স্তর সম্পর্কে কোরআন এর সুত্র	২৫
বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবী সৃষ্টির পর্যায় ও গতি:	২৮
কোরানের আলোকে পৃথিবীর সৃষ্টি পর্যায় ও গতি সূত্র:	৩১
বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পৃথিবী, প্রাণ ও মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে	৩৪
বাইবেল ঐশী গ্রন্থের আলোকে প্রাণ সৃষ্টি	৩৭
আদম ও নারী সৃষ্টি বাইবেল দৃষ্টিতে	৪০
মানুষের আদি উৎস নিয়ে নানা মতবাদ	৪৩
প্রত্যেক বস্তুই তার মৌলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়-আরবী প্রবাদ	৪৪
ডিএনএ ও ফিঙ্গার প্রিন্ট	৪৫
কোরআনের আলোকে মানব দেহ গঠনের সাতটি বৈজ্ঞানিক পর্যায়	৪৯
আধুনিক বিজ্ঞান ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গ	৫২
মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে : ধর্মগ্রন্থ বাইবেল	৫৯
মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে : ঐশী গ্রন্থ তাওরাত ও জবুরের বর্ণনা	৬৩
প্রাণী তত্ত্ব-বৈজ্ঞানিকউপকরণ ও সভ্যতার অগ্রগতিসাধক কোরআনে বর্ণিত প্রাণী গুলো Zoology	৭১
প্রকৌশলী প্রাণী–মাকড়সা	৭৩
অক্সিজেন সংরক্ষণকারী বিজ্ঞানী প্রাণী মরু জাহাজ উট	৭৫
গৃহ পালিত পশু বা ক্যাটল ও গরম কাপড় তৈরি স্বাস্থ্য উপকরণ	৭৭
রাসায়ন বিদ্যা ধর্ম ও মানব দেহ	৮০
মানব দেহের উপকরণ ও পানি ও প্রাণ	৮১
মানব দেহের আকার ও ধর্মীয় ব্যখ্যা	৮৩
নিউরন বা দেহ সংকেত যন্ত্র	৮৫
চোখ ও ক্যামেরা	৮৮
কথা সেন্টার ও ডারউইনের বির্বতনবাদ	৯৩

www.pathagar.com

নিদ্রাতত্ত্ব ও স্বপ্ন ৯৫
আবহাওয়া তত্ত্ব ৯৯
মেঘ সৃষ্টি ১০১
ছায়া ১০৪
কৃষিতত্ত্ব বা ধর্ম ১০৭
ক্লোরোফিল বা আলোক চোষা সবুজ এন্টেনা ১০৯
প্রাণীর খাদ্য ও খাদ্য গুণ বৈজ্ঞানিক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ ১১১
রোমান্টিক খাদ্য মধু ও শিল্প নৈপুন্যে মৌমাছির বাসা ১১৫
সালোক সংশ্লেষণ আকাশ থেকে খাবার ১২০
পরাগায়ণ বা উদ্ভিদের তত্ত্ব : ১২২
ভূ-বিজ্ঞান ও সামুদ্রিক ভূ-বিজ্ঞান ১২৪.
সমুদ্র তত্ত্ব নিয়ে কোরআনের বাণী ১২৯
পানি বা জল তত্ত্ব ১৩১
সময়ের একক নির্ধারণের সহায়ক
দিন মাস এর গণনা ও সময়ের পরিমাপ ও বারো মাস ১৩৮
জ্যোতিবিদ্যা জ্যোতিবিদ্যায় কোরানিক সূত্র ১৪২
নবম শতাব্দীর বিশিষ্ট মুসলিম বিজ্ঞানী আল কারেজমী ১৪৫
সৌর পরিবার ১৫১
সূর্য ১৫৩

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞানে সৃষ্টিতত্ত্ব ও ৪৬০ কোটি বছর পূর্বের পৃথিবী

অতীতে যাহার অস্তিত্ব ছিল না, তাকে নতুনভাবে নির্মাণের মাধ্যমে দৃশ্যমান করার নাম সৃষ্টি। যে বিজ্ঞানে মহাবিশ্বের উৎপত্তি, বিবর্তন, উপাদান ও গঠন প্রভৃতি নিয়ে আলোচনা করা হয়, তাকে ইংরেজী ভাষায় Cosmology বলে। গ্রীক দার্শনিক এমপেডোকিস সৃষ্টিতত্ত্বের মৌলিক উপাদান চারটি বলে উল্লেখ করেছেন উপাদানগুলো হলো–মাটি, পানি, অগ্নি ও বায়ু।

বর্তমান বিশ্বে সৃষ্টিতত্ত্ব সমূহের মধ্যে সব বিজ্ঞানীদের কাছে গ্রহণযোগ্য এবং স্বীকৃত তত্ত্ব হলো Big Bang Theory বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। এই শতাব্দীতে আবিষ্কৃত হয়েছে নতুন আরেক তত্ত্ব তা হলো মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ তত্ত্ব। বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন, মহাবিশ্ব সংকোচন তত্ত্ব যা একটি বিন্দুতে এসে বিস্ফোরিত হবে।

বিগ ব্যাং তত্ত্ব বা মহা বিস্ফোরণ তত্ত্ব আধুনিক বিজ্ঞানীরা আবিষ্কার করেন সাম্প্রতিককালে। ১৯২৭ সনে বেলজিয়াম জ্যোতির্বিজ্ঞানী G. Lemaitre উক্ত তত্ত্বের উদ্ভাবক। এরপর বিগব্যাং তত্ত্বটি বিস্তারিতভাবে উপস্থাপন করেন বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামও, এইচ. আলফার ও আর হেরমান।

মহাবিস্ফোরণ হলো বা বিগব্যাং তত্ত্ব এমন বিপ্লব যার আগে নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল, চন্দ্র সূর্য, গ্রহ, ক্ষত্র, গ্যালাক্সি, কোয়াসার, পালসার, কিছুই ছিল না। অর্থাৎ বর্তমান মহাবিশ্বে পদার্থ, শক্তি ও স্থান-কাল একটি বস্তুপিণ্ডে একীভূত ছিল। এ বস্তুপিণ্ডের অসীম ঘনত্ব ও অসীম উষ্ণতা ছিল। ১০৩২ ডিগ্রি তাপমাত্রার একক বলে যে উষ্ণতা কে ধরা হয়।

'বিগব্যাং' বা মহাবিস্ফোরণ সংগঠিত হওয়ার পরবর্তী ১০ থেকে ৪৩ সেকেন্ড সময় থেকে সংগঠিত ঘটনাবলি সম্পর্কে কিছুই জানা যায়নি। তবে এতটুকু জানা যায় যে চারটি শক্তি যথা মহাকর্ষীয় সবল নিউক্লিয়ার, দুর্বল নিউক্লিয় এবং বিদ্যুৎচুম্বকীয় শক্তি বিস্ফোরণ ঘটার আগে ঐ আদি অগ্নিবলের ভেতরে একিভূত ছিল।

বিগব্যাং বা বিস্ফোরণের সাথে সাথে মহাকর্ষ শক্তি অন্য তিনটি শক্তি থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। পদার্থ, শক্তি ও স্থান-কালের আধার অগ্নিবল বা 'ফায়ার

www.pathagar.com

বল' টি বিস্ফোরণের পর খণ্ড খণ্ড পুঞ্জ বস্তু চারিদিকে ছড়িয়ে ছিটিয়ে ছুটতে থাকে এবং প্রবাহ ও সম্প্রসারণ গতি তড়িত বৈশিষ্ট্যে ধাবিত হয়ে ধারাবাহিক প্রসারের মাধ্যমে বিরাট অবস্থান গড়ে তোলে।

মহাবিস্ফোরণ ও সম্প্রাসারণ এর পর যেসব বস্তুর উদ্ভব হয়, সেগুলো হচ্ছে-- ইলেকট্রন, প্রোটন, কিছু ডিউটেরন হিলিয়াম এবং হাইড্রোজেন। এগুলোর সুবিশাল 'ফোটন' সাগরে ডুবে যায় এবং অগ্নি-গ্যাসের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়। সম্প্রসারণ গতির কারণে ঐ ক্ষুদ্র বস্তু খণ্ডগুলি একে অপর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে উড়তে থাকে। সে বস্তু খণ্ডগুলির আপন মহাকর্ষ শক্তি থাকার ফলে তারা সংকোচিত হতে পারত। কিন্তু কোন অলৌকিক নির্দেশে মহাকর্ষ শক্তির টানে সংকোচেনের পরিবর্তে সম্প্রসারণ শক্তি সৃষ্টি করে দেয়ার ফলে ভয়ংকর সংঘর্ষ ঘটেনি। দুই পরস্পর বিরোধী শক্তির ক্রিয়া বিক্রিয়ার কারণে গ্যাস দ্বারা গঠিত ক্ষুদ্র পিণ্ডগুলো বিভিন্ন আকার ধারণ করে। কোনটা মোচাকৃতি, কোনোটা গোলাকার এবং আরো অন্যান্য আকারের।

মহাবিস্ফোরণ ও সম্প্রাসারণ এর পর মহাবিশ্বের বয়স যখন ১ সেকেন্ড তখন এর তাপমাত্রা ছিল 1 mg/cc। যদি ঐ মুহূর্তে সম্প্রসারণের মাত্রা এক হাজার বিলিয়নের এক ভাগও কম হতো তাহলে গোটা বিশ্ব কয়েক মিলিয়ন বৎসরের মধ্যে ধ্বংস হয়ে যেত। আর যদি অনুরূপ মাত্রায় সম্প্রসারণ বৃদ্ধি পেত তাহলে গোটা বিশ্ব এমন বিশাল আকার ধারণ করতো যে, তখন মহাকর্ষ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রণ করা অসম্ভব হয়ে পড়তো।

মহাবিশ্বের বয়স যখন ১০ থেকে ১০০ সেকেন্ড তখন হিলিয়াম নিউক্লীয় গঠিত হয়। যদি ঐ সময় হিলিয়াম নিউক্লীয় বিশ্বের সকল প্রোটনকে আত্মীকরণ করে নিতো তাহলে মহাবিশ্ব প্রায় সবটুকু ডিওটেরিয়াম বা হিলিয়াম নিউক্লীকে ধরে রাখত। আর যদি ডিওটেরিয়ামই প্রধান উৎপন্ন বস্তু হতো তাহলে তারকাগুলো হাইড্রোজেন বোমার মতো বিস্ফোরিত হতো।

তাপমাত্রা যখন ৩০০০শ-এ নেমে আসে তখন ইলেকট্রন ও প্রোটন থেকে এটম তৈরি হয়। অধিকাংশ হাইড্রোজেন এটমের সাথে কিছু হিলিয়াম নিয়ে বস্তুপিণ্ড গঠন করে এবং দূরত্ব বজায় রেখে উড়তে থাকে। এ অবস্থায় 'বিগ ব্যাং' সংগঠিত হওয়ায় প্রায় ১০১০ বছর পরে গ্যাস গঠিত বস্তুপিণ্ডগুলো মহাকর্ষ শক্তির টানে একত্রিত হয়ে প্রোটোগ্যালাক্সি এযং পরিশেষে গ্যালাক্সি জন্ম দেয়।

মহাজগত আর এ পর্যায়ে আসতে সময় লাগে ২৫০ মিলিয়ন বৎসর। গ্যালাক্সির মধ্যকার ধূলি ও নিউক্লিয়ার গ্যাস থেকে নক্ষত্র পুঞ্জের সৃষ্টি হয়। নক্ষত্রপুঞ্জের মধ্যকার বস্তু যখন ঘনিভূত হয়, তখন ঘূর্ণায়মান সৌর নীহারিকার কেন্দ্রীয় অংশ সংকুচিত হয়ে প্রটোসন গঠন করে। আর বাইরের চক্র- গ্রহ,

www.pathagar.com

উপগ্রহের জন্ম দেয়। এসব ঘটনা ঘটতে সময় লাগে ৭৫০ মিলিয়ন বৎসর। সূর্য সৃষ্টির সাথে সাথেই পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। এভাবে বহু অবস্থার বির্বতনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী আজকের অবস্থায় এসেছে। সৌরজগতের সদস্য, গ্যাস ও ধূলায় ঘূর্ণায়মান লাল উষ্ণ অনুজ্জ্বল গোলকের মতো আমাদের পৃথিবী কম করে হলেও ৪৬০ কোটি বছর পূর্বে যাত্রা শুরু করে। তাপমাত্রা পাওয়ার পরে তাকে একটি তরল অবস্থা অতিক্রম করতে হয়। পরবর্তী ১০০০ মিলিয়ন বৎসর পর আজকের পৃথিবীর কিছু অংশে শক্ত আবরণের সৃষ্টি হয়। বিদ্যুৎ ও আগ্নেয়গিরির ক্রিয়াকলাপ দারুণভাবে বিস্তার লাভ করে এবং একটি বাষ্পীয় পরিমণ্ডল একে ঘিরে ফেলে। যখন পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হলো তখন জলীয় বাষ্প জমে ঘনীভূত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত শুরু করে। এ বৃষ্টির পানিতে সৃষ্টি হয় লেক, নদী, সাগর ও মহাসাগর। তখনো ত্বক প্রাণ সৃষ্টি হয়নি এবং পৃথিবীর কোথাও প্রাণের সন্ধান পাওয়া যায়নি। তবে শুধু গড়ে ওঠেছিল পাহাড়-পর্বত ও মরুভূমির রুক্ষ-সূক্ষ্ম প্রতিচ্ছবি।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানীদেরসূত্রে পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের সৃষ্টি

পৃথিবী জমাটবাঁধার ৩০০০ মিলিয়ন বছর পর প্রথম উষ্ণ সাগরেই প্রাণের উৎপত্তি ঘটে বলে বিজ্ঞানীদের ধারণা। প্রাণ সৃষ্টির আগ পর্যন্ত সময়ে পৃথিবীতে কি হয়েছে সে সম্পর্কে বিশেষ কিছুই জানা যায়নি।

প্রথমে যে প্রাণ সৃষ্টি হলো তা ছিল এক কোষ বিশিষ্ট।

এরপরে এলো সামুদ্রিক অ্যালজে এবং সামুদ্রিক মেরুদণ্ডহীন প্রাণী।

মেরুদণ্ডী প্রাণী এবং আদিম কালের মাছের মত প্রাণীদের আবির্ভাব ঘটেলো আরো ১০০ মিলিয়ন বছর পর।

উদ্ভিদ জন্মাতে শুরু হবার পরই মাটির উপরে অমেরুদণ্ডী প্রাণীরা স্থলভাগে বিচরণ শুরু করে এবং ক্রমান্বয়ে তা বৃদ্ধি হতে থাকে।

পৃথিবীর উপরিভাগ তখন কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত ছিল। এ খণ্ডগুলি ছিল শীতল, অনড় এবং ১০০ কিঃ মিঃ বিস্তৃত প্লেট এর মত। যেগুলি উত্তপ্ত ও টলটলে গলিত অঞ্চলের উপর ভেসে বেড়াতো। সে টলটলে এলাকাকে বলা হয় এস্থেনোস্ফিয়ার।

উক্ত প্লটগুলো অভিকর্ষ শক্তির প্রভাবে ক্রমে গতিশীল হয়ে ওঠে। যাকে বলা হয় প্লেট-টেকনিকস। উক্ত উপমহাদেশীয় প্লেটগুলো পরস্পরের সাথে ধাক্কা খাওয়ার ফলে বিশাল সংকুচিত পার্বত্য এলাকা মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে দাঁড়ায়। ফলে কালক্রমে সামুদ্রিক জীবের আধিপত্য কমে আসে। আর ইউরোপ ও এশিয়ায় জেগে ওঠে সুউচ্চ পর্বত শ্রেণি।

এর পরবর্তী ১৪০ মিলিয়ন বছরকে বলা হয় সরীসৃপের যুগ। এ সময় সরীসৃপরা আকারে এবং সংখ্যায় খুব বেশি বৃদ্ধি পায়। তারপর দেখা দেয় পাখি ও স্তন্যপায়ী প্রাণীর। তবে এরা বিশেষ বৈশিষ্ট্যের অধিকারী হতে পারেনি। সবচেয়ে বৃহদাকার সরীসৃপ ডাইনোসর স্থলভাগে অধিককাল কর্তৃত্ব বিস্তার করে রেখেছিল।

তারপরে ৬৫ মিলিয়ন বছরে পৃথিবীতে স্তন্যপায়ী প্রাণী বৃদ্ধি পায়। তার পরবর্তী শেষ ১,০০,০০০ বা এক লক্ষ বছর ধরে মানুষ প্রাধান্য বিস্তার করে রেখেছে।

আজো মহাবিশ্বে নূতন নূতন গ্রহ, উপগ্রহ এবং নক্ষত্র সৃষ্টি অব্যাহত রয়েছে, যা

www.pathagar.com

নিত্য আবিষ্কার হচ্ছে। নক্ষত্র সমূহ মহাকর্ষ বলের প্রভাবে গ্যালাক্সি ও গুচ্ছ গ্যালাক্সি গঠন করে চলেছে। বর্তমানে এমন অসংখ্য গ্যালাক্সি আবিস্কৃত হয়েছে। মহাবিশ্ব সৃষ্টির এই মহাবিস্ফোরই Big Bang।

কোরআনে সৃষ্টিতত্ত্ব ও মহাবিশ্ব সম্প্রসারণতত্ত্ব

অবিশ্বাসীরা কি লক্ষ্য করে দেখে না, নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডল (একটি বস্তুর ন্যায়) পরস্পর সংযুক্ত ছিল; অতঃপর আমরা এদের ভেঙ্গে বিচ্ছিন্ন করে দিয়েছি। (আম্বিয়া-৩০)

সৃষ্টির বিস্ময়কর তত্ত্ব সম্পর্কে ঐশী গ্রন্থ কোরআন আমাদের তথ্য দিয়েছে এভাবে–"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের উদ্ভাবক তিনি আল্লাহ, যিনি কোনো জিনিসের প্রতি যখন আদেশ দেন তখন শুধু বলেন "হও" আর অমনি তা হয়ে যায়।"

সুরাবাকারা-১১৭ আয়াত।

প্রকৃতপক্ষে কোন কিছু সৃষ্টির জন্য তিনি যখন ইচ্ছা করেন শুধু বলেন "হও" অমনি তা হয়ে যায়। (ইয়াসীন-৮২)

১৫ বিলিয়ন বৎসর পূর্বে সপ্ত আকাশ, সৌর জগত, গ্যালাক্সি, গ্রহ উপগ্রহ, নেবুলা, সোপার নোভা, কোয়াসার, পালসার এসব কিছুই ছিল না। তখন যিনি ছিলেন-তিনি সর্বময় মহাবিজ্ঞানী, এক এবং একক সার্বভৌম ক্ষমতার মালিক মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

কোরআনে বিশ্ব সম্প্রসারণ সূত্র

" বস্তুতঃ আমি দেখার আহবান করি সেসব নক্ষত্রের প্রতি, যেগুলো পশ্চাদগামী হয়, সোজা চলে কিংবা অদৃশ্য হয়ে যায়।" (তাকভীরঃ ১৭-১৮)

এ আয়াতে গ্রহ-নক্ষত্রসমূহের পেছনে সরে যাওয়া, চারিদিকে ছড়িয়ে পড়া তথা মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ সম্পর্কে এত স্পষ্ট নির্দেশনা রয়েছে যা বলার অপেক্ষা রাখে না। .

আল্লাহ তার সৃষ্টিকে যেমন ইচ্ছা বর্ধিত করেন এবং তিনি প্রত্যেক বিষয়ে পূর্ণ ক্ষমতা রাখেন। (ফাতির-২১)

"সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন।" (ফাতির-১)

"প্রবল ক্ষমতা বলে আমরা আকাশ সৃষ্টি করেছি এবং অবশ্যই তা সম্প্রসারণ করে চলেছি।" (যারিয়াত-৪৭)

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ

দূরবর্তী বিপুল নক্ষত্র কিংবা গ্যালাক্সি থেকে একটি নতুন প্রযুক্তির কৌশলের মাধ্যমে আলো দীর্ঘ সময়ের জন্য সংগৃহীত হয়ে থাকে। এ আলো দ্বারা ফটোগ্রাফিক প্লেটে ইমজ তৈরি করা হয়। এ ইমেজ বা প্রতিচ্ছবি তৈরি হয় শক্তিশালী টেলিস্কোপের মাধ্যমে। অন্য আর এক পন্থায় সৌর থেকে আলো সংগ্রহ করা হয়। যে অণুকণা থেকে আলো উদগত হয়। সে সূত্র বিজ্ঞানীদের ঐ উপাদান বা অণুকণাকে চিনে নিতে সহায়তা করে।

ডপলার ইফেক্ট-এর সহায়তায় পদার্থ বিজ্ঞানের প্রত্যেক ছাত্র একথা জানে যে, আমাদের কাছ থেকে নক্ষত্রসমূহ দূরে সরে যাচ্ছে এবং সমগ্র আলো-দৃশ্য লাল বা দীর্ঘ তরঙ্গের শেষ দিকে সরে যাচ্ছে। এ ধরনের সরে যাওয়াকে জ্যোতির্বিজ্ঞানে বলা হয় "রেড শিফট"। ১৮১৮ সালে জার্মান জ্যোতির্বিজ্ঞানী এইচ, সি, ফসেট প্রথম নক্ষত্র সমূহের Red shift আবিষ্কার করেন।

রেডিও জ্যোতির্বিদ্যা নামে বিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে আরো একটি শক্তিশালী পদ্ধতি আবিস্কার হয়েছে। যার মাধ্যমে জ্যোতিষ্ক বিজ্ঞানীরা আকাশের ঐ দূরবর্তী অঞ্চলে তাদের গবেষণা কর্ম চালিয়ে যান, যেখানে শক্তিশালী অপটিক্যাল টেলিস্কোপ এ যাবত পৌছাতে পারেনি। এ প্রযুক্তি কৌশলের দ্বারা রেডিও সিগন্যাল নক্ষত্রসমূহের মাধ্যমে প্রেরণ করা হয়। এসব রেডিও-সিগন্যাল তাৎক্ষণিকতায় রাডারে ধরা পড়ে এবং সিগন্যালগুলো বিশ্লেষণ করে বিজ্ঞানীরা জানতে পারেন যে, সিগন্যালগুলো উদ্ভুত হয় কোন অণুকণা থেকে।

গ্যালাক্সিগুলো আমাদের দিক থেকে সকল দিকে ছুটে চলেছে -১৯২৯ সনে বিজ্ঞানী হাবল এ সূত্র প্রকাশ করেন। এ গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব এবং এদের পশ্চাদগামী হওয়ার গতিবেগের মধ্যে একটি রৈখিক সম্পর্ক বিরাজমান এদের এ গতিবেগ এদের দূরত্বের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। অর্থাৎ দূরত্ব যত বৃদ্ধি পায় গতিবেগও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে।

এ বিশাল মহাবিশ্ব অসংখ্য গ্যালাক্সির সমষ্টি। বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য অনুযায়ী ২০০০ সাল ৫০,০০০ কোটি গ্যালাক্সি আমাদের মহাবিশ্ব জুড়ে বিস্তৃত হয়ে রয়েছে। এখনো প্রতিদিন নিত্য নতুন গ্যালাক্সির জন্ম হচ্ছে এবং গ্যালাক্সির

www.pathagar.com

সংখ্যাও দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। গ্যালাক্সিগুলির মধ্যে পারস্পরিক দূরত্ব বৃদ্ধির কারণ হচ্ছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতি অর্থাৎ, বিশাল মহাজগত সমহারে প্রতিনিয়ত সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ সম্প্রসারণ গতির ফলে সৃষ্ট দূরত্ব পরিমাপের জন্য বিজ্ঞানী হাবল একটি সূত্র উপস্থাপন করেছেন। তা হচ্ছে, "একটি গ্যালাক্সির লাল বিচ্যুতি আমাদের কাছ থেকে তার দূরত্বের সমানুপাতিক।" অর্থাৎ গ্যালাক্সিগুলো দূরত্বের সমানুপাতে আমাদের কাছ থেকে দূরে সরে যাচ্ছে।

বিজ্ঞানীরা দূরত্ব নির্ণয়ের প্রচলিত পদ্ধতি ব্যবহার করে হাবল ধ্রুবকের মান বের করেছেন তা হচ্ছে গ্যালাক্সিগুলো প্রতি সেকেন্ডে 50km দূরে সরে যাচ্ছে আর একদল বিজ্ঞানী বেতার টেলিস্কোপ দিয়ে গ্যালাক্সি দীপ্ত রশ্মি এবং গ্যাসের গতি নির্ণয় করেছেন। এ পদ্ধতিতে হাবল ধ্রুবকের মান পেয়েছেন 100km/sec/Mpc। এভাবে বিজ্ঞানীরা একটি স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে প্রতি সেকেন্ডে মহাজগত 50km থেকে 100km পর্যন্ত সম্প্রসারণ অব্যাহত রয়েছে।

বিশ্বখ্যাত বিজ্ঞানী Albert Einstein তার আলোড়ন সৃষ্টিকারী তত্ত্ব Cosmological Constant এ বলেছেন "একটি রহস্যময় স্বতাড়িত বৈশিষ্ট্যের কারণে মহাবিশ্ব ক্রমেই সম্প্রসারিত হয়ে চলেছে। এ বিস্ময়কর তত্ত্বটি টাইপ-লা-সোপার লোভা নামে পরিচিত।"

সৌরজগতে সবকিছুই সৃষ্টির নির্ভুল অনুপাতে

নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল জুড়ে যেখানে যা কিছু রয়েছে সে সবির মধ্যে একটি নির্ভুল অনুপাত-চিহ্ন সৃষ্টিতত্ত্ব বিজ্ঞানীরা উদঘাটন ও উপলব্ধি করেছেন। সুশৃংখল নিয়মের এ অনুপাত নির্ধারণের মধ্যে সুপরিকল্পনা ও বুদ্ধির বিকাশ পরিলক্ষিত হয়েছে বিজ্ঞানীদের মাঝে।

নির্ধারিত কক্ষপথও নিয়মে পৃথিবীর বৈশিষ্ট্যাবলি এবং আকাশমণ্ডলের দৃশ্যাবলি নির্ধারিত হয়ে থাকে পদার্থ বিজ্ঞানের কিছু নিয়মের মাধ্যমে। এ নিয়মগুলো একটি সুন্দর সূক্ষ্ম সমতাময় কার্যকর ভূমিকা পালন করে থাকে।

সৌরজগতের গ্রহ-উপগ্রহগুলির ঘূর্ণন প্রকৃতির নিয়মগুলির কথা বল যাক। এ সব নিয়মগুলির তথ্য সর্বপ্রথম আবিষ্কার করেন বিজ্ঞানী জোহান্স কেপলার। তাই এ নিয়মগুলোর নাম দেয়া হয়েছে -"কেপলারের সূত্র" নামে। প্রথম সূত্রের ভাষা হলো, "প্রত্যেকটি গ্রহ একটি উপবৃত্তীয় কক্ষে সূর্যকে পরিক্রমন করে এবং এ উপবৃত্তের কোন ফাঁকা সে সূর্য অবস্থান করে।"

কেপলারের দ্বিতীয় সূত্র হচ্ছে-"সূর্য ও গ্রহে যোদকারী রেখা সমান কালে সমান কেন্দ্র অতিক্রম করে।"

www.pathagar.com

কেপলারের তৃতীয় সূত্র হচ্ছে, "সে কোনগ্রহের নক্ষত্রকালের বর্গ তাদের সূর্য থেকে মধ্যবর্তী দূরত্বের ঘন অনুপাতের সমান।"

এসব সূত্রের গাণিতিক বিশ্লেষণ থেকে দেখা যায়, সূর্য এবং গ্রহসমূহের মধ্যে একটি নির্দিষ্ট এবং নির্ভুল অনুপাত বিদ্যমান। যা না হলে হয়তো একটি বিপর্যয় ঘটে যাওয়ার সম্ভাবনা সব সময় থেকে যেত।

পৃথিবী বর্তমানে যে অবস্থানে রয়েছে তার থেকে যদি কয়েক সেঃ মিঃ সূর্যের কাছাকাছি থাকতো তাহলে এ সুন্দর সবুজ পৃথিবী জ্বলে-পুড়ে লাল হয়ে শুক্র গ্রহে রূপ ধারণ করতো। পৃথিবী যদি সূর্য থেকে ১% মাত্র দূরে সরে যেতে তাহলে এটি মঙ্গল গ্রহের মতো চিরকালের জন্য তুষারাচ্ছন্ন হয়ে যেত।

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ চাঁদ যদি তার অবস্থান থেকে কয়েক কিঃ মিঃ পৃথিবীর কাছে হতো তাহলে নদী-সমুদের পানিগুলি মহাপ্লাবিত হয়ে গোটা ভূ-পৃষ্ঠ বন্যার জলে মহা সাগওে পরিণত হয়ে যেত। আর যদি চাঁদ কয়েক বিন্দু পৃথিবী থেকে দূরে সরে যেত তাহলে পৃথিবী মরুভূমিতে পরিণত হতো। পাওয়া যেত না পানি কোথাও।

মহাবিশ্ব যে অনুপাতে সম্প্রসারিত হচ্ছে, তার চেয়ে যদি সম্প্রসারণের হার অতি সামান্য ডিগ্রি কম হতো তাহলে সৃষ্টির পর মুহূর্তে পৃথিবী নিশ্চিহ্ন হয়ে যেত। সম্প্রসারণের হার যদি প্রান্তিক মাত্রায় বৃহত্তর হতো তাহলে মহাবিশ্ব এত বিপুল আকারে বৃদ্ধি যে, সেখানে মহাকর্ষ শক্তি কোনভাবে কাজ করতে পারতো না।

আমরা পর্যবেক্ষণ করি যে, সোলার সিস্টেম এ্যাটমিক মডেলে সেখানে নিউক্লিয়াসকে ঘিরে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউট্রন পাক খায়। চারটি মৌলিক শক্তি যথা–সবল নিউক্লিয় শক্তি, দুর্বল নিউক্লিয় শক্তি, মহাকর্ষ শক্ত ও বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্ত পরমাণুর গঠন উপাদানগুলির উপর সক্রিয় রয়েছে। সবল নিউক্লিয় শক্তি দুটি প্রোটনকে একসঙ্গে আকর্ষণ করে। কিন্তু বিদ্যুৎ শক্তি ঐ দুটিকে গ্রহণ করে না। যদি সবল নিউক্লিয় শক্তি সামান্যতম দুর্বল হতো তাহলে সাব-এ্যাটমিক কণিকাগুলো একসঙ্গে সংযোজিত হয়ে পরমাণুর নিউক্লীয় গঠন করতে পারতো না। অপরপক্ষে বল নিউক্লিয় শক্তি যদি আরো বেশি সবল হতো তাহলে মহাবিশ্বের সকল হাইড্রোজেন হিলিয়ামে রূপান্তরিত হতো।

মহাবিশ্বজগতে হাইড্রোজেন আর খুঁজে পাওয়া যেত না। কিন্তু হাইড্রোজেন আমাদের কাছে দুভাবে প্রয়োজন হয়। যেসব রাসায়নিক উপাদান জীবকোষ গঠন করে তার জন্য হাইড্রোজেন একান্ত অপরিহার্য। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্র যে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে আমাদের কিরণ দিয়ে যাচ্ছে তাও এ হাইড্রোজেন জ্বালানীর বদৌলতে।

www.pathagar.com

রসায়ন বিজ্ঞানে আমরা দেখি, প্রত্যেকটি উপাদান নির্দিষ্ট আনুপাতিক হারে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। দুই পরমাণু হাইড্রোজেন ও এক পরমাণু অক্সিজেনের বিক্রিয়ায় এক অণু পানি গঠিত হয়। এর ব্যতিক্রম করে পানির অণু সৃষ্টি করা সম্পূর্ণ অসম্ভব, বাতাসে নাইট্রোজেন ও অক্সিজেনের আণুপাতিক হার ৪:১। যদিএ অণুপাত উল্টে দেয়া হতো। অর্থাৎ ৪ ভাগ অক্সিজেন ও ১ ভাগ নাইট্রোজেন হতো তাহলে কোনো কিছুতে আগুন লাগলে সে আগুন প্রসারিত হয়ে গোটা পৃথিবীকে পুড়িয়ে শেষ করে দিত। আর অক্সিজেনের আধিক্যের কারণে সমগ্র প্রাণী জগত বিনাশ হয়ে যেত। অপরপক্ষে নাইট্রোজেনের পরিমাণ কম হলে উদ্ভিদ জগতের নাইট্রোজেনীয় উপাদান প্রক্রিয়া ব্যাহত হতো। ফলে বৃক্ষরাজির বিকাশ ঘটতো না।

সৌরজগতের নির্ভুল কক্ষ পথ বিষয়ে কোরআনের সূত্র

সৌর জগতের নির্ভুল কক্ষ পথ মহাজগতের নির্দিষ্ট নিয়মে পরিচালিত হচ্ছে তা পবিত্র কোরআনে রয়েছে বৈজ্ঞানিক সূত্র–যে সূত্রগুলো বিজ্ঞানের বর্তমান সূত্রগুলো আস্কিারের হাজারো বছর আগেই কোরআনে বিবৃত হয়েছে।

'তিনিই সর্বময় সত্তা যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন নির্ভুল অনুপাতে।' (আনআম-৭৩)

'মহান আল্লাহ সঠিক অনুপাতে আকাশ মণ্ডল ও পৃথিবীমণ্ডল সৃষ্টি করেছেন। অবশ্যই যারা বিশ্বাস রাখে তাদের জন্য এতে রয়েছে প্রমাণ।'

(আনকাবুত-৪৪)

আর তিনি সূর্য এবং চাঁদকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন সর্বদা একই নিয়মে এবং রাত ও দিনকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করেছেন। (ইব্রাহীম-৩৩)

"অতএব আকাশের দিকে দৃষ্টি ফিরাও, কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? তাহলে বার বার তাকাও।" (মূলক-৩-৪)

www.pathagar.com

কিয়ামত, মহাধ্বংস বৈজ্ঞানিক ও কোরআনের সূত্র

এটা হবে এক মহাবিস্ফোরণ। আর তারা সবাই আমার সমীপে স্থানান্তরিত হবে। (ইয়াসীন-৫৩)

এ মহাবিশ্বের সকল বস্তুই পরস্পরকে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণকে বলা হয় মহাকর্ষীয় শক্তি। সৌরজগতের গ্রহগুলি সূর্যের আকর্ষণে আবর্তিত হয়। উপগ্রহ গ্রহের আকর্ষণে ঘুরে বেড়ায়। গ্রহানুপুঞ্জ সূর্যের চারদিকে ঝাঁক বেঁধে পরিক্রমন করছে। এভাবে গ্যালাক্সি গুচ্ছ গ্যালাক্সির টানে ঘুরে। অর্থাৎ প্রত্যেকটি বস্তু একে অপরের সাথে মিলতে চায়। কিন্তু এ মিলন ঘটতে পারে না তার কারণ হচ্ছে মহাবিশ্বের সম্প্রসারণ গতির ফলে সৃষ্টি হওয়া দুরত্ব। ফলে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়।

যখন সম্প্রসারণ গতি ক্রমান্বয়ে থেমে যাবে, তবে মহাকর্ষীয় টানে গ্রহ, নক্ষত্রগুলি পরস্পরের কাছাকাছি এসে যাবে। ফলে প্রচণ্ড সংঘর্ষ শুরু হবে।

এই অবস্থাকে "ক্লোজড বিগব্যাং" বলা হয়েছে। আমেরিকান বিজ্ঞানী Freeman Dyson এটাকে Big Crunch বলেছেন। মানে- পুনরায় মহাজগত একটি বিন্দুতে এসে বিস্ফোরিত হবে। সাম্প্রতিক বৈজ্ঞানিক তথ্যগুলো থেকে দেখা যায় মহাকাশে নতুন নতুন নক্ষত্র, কোয়াসার তথা নতুন গ্যালাক্সি জন্ম নিচ্ছে, যার কারণে মহা জাগতিক গড় ঘনত্ব প্রভাবিত হচ্ছে। আবার বিশ্বের প্রতিটি পরমাণুর ভেতর ১০ কোটি নিউট্রিনো আছে। তাদের পরিমাণও বিশাল ভরে সমৃদ্ধ এবং তাদের মোট ওজন মহাবিশ্ব ক্লোজড বা ধ্বংস করার জন্য যথেষ্ট। তাছাড়া বিপুল পরিমাণ মহাজাগতিক ধুলি মহাবিশ্বের গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি করে চলেছে, যেমন প্রতি বছর ১০ হাজার টন ধুলিকণা শুধু পৃথিবী গ্রহে পতিত হয়। এখন মহাকাশে অনেক কৃষ্ণ গহবর সন্ধান পাওয়া গেছে। বিজ্ঞানীরা ধারণা করেন মহাকর্ষের টানে নক্ষত্রগুলো পরস্পরের নিকটবর্তী হলে সংঘর্ষ বাঁধে। যার কারণে ব্লাক হোলগুলির সৃষ্টি হয়েছে।

www.pathagar.com

মহাধ্বংস বা বিগ ব্যাং ক্লোজড বিষয়ে কোরআনের সূত্র

মহাধ্বংস বা বিগ ব্যাং ক্লোজড বিষয়ে কোরআন যে সব সুত্র দিয়েছে তা এমন 'সে দিন আমরা মহাবিশ্ব -মহাকাশ গুটিয়ে নেব যেমনি করে গুটিয়ে নেয়া হয় লিখিত বইপত্র। আর প্রথমবার সৃষ্টি করার সময় আমরা যেভাবে বিগব্যাং আরম্ভ করেছিলাম অনুরূপভাবে তা গুটিয়ে নেয়া হবে'। (আম্বিয়া-১০৪)।

কোরআনের অন্য সুত্র সমুহ–

'এটা হাবে এক মহাবিস্ফোরণ, আর তারা সবাই আমার সমীপে সমবেত হবে।' (ইয়াসীন-৫৩)

'সেদিন আকাশ বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং গ্রহসমূহ ছড়িয়ে পড়বে।' (ইনফিতার-১-২)

'সে দিন আকাশ বিদীর্ণ হয়ে পৃথক হয়ে যাবে'। (ইনশিকাক-১)

'সেদিন পৃথিবী চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গুড়া হয়ে যাবে'। (ফজর-২১)

উক্ত কোরানিক বিজ্ঞানে ইঙ্গিত পাওয়া যাচ্ছে যে, পৃথিবী নামক গ্রহটি চূর্ণবিচূর্ণ হবে।

'সেদিন পৃথিবী বিরাট ঝাঁকুনি খেয়ে কম্পিত হয়ে উঠবে। পাহাড়গুলো গুড়ো হয়ে পাউডারে পরিণত হবে এভাবে যে, সবগুলো ধুলি-কণার আকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়বে'। (ওয়াকিয়া-৪-৬)

ইহা ধ্বংস বা মহাবিশ্বের সমাপ্তি ঘটবে এমন এক সময়ে যখন এর গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি পাবে এবং মহাকর্ষীয় শক্তির প্রাবল্য বেগবান হবে। সাথে সাথে সম্প্রসারণ গতি থেমে যাবে। ফলে গ্রহ, উপগ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, কোয়াসার প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক মহাকর্ষীয় টানে পরস্পরের নিকট এসে সংঘর্ষ শুরু করবে। বিশাল মহাজগৎ একটি বিন্দুতে এসে Closed হবে। এটাই হচ্ছে মহান সৃষ্টির পরিসমাপ্তি বা কেয়ামত।

ক্লোজড বিগ ব্যাং তত্ত্বে বিশ্বাসী বিজ্ঞানীরা বলেছেন, মহাবিশ্ব একটি বিন্দুতে Closed হওয়ার পর এমন এক শক্তিধর সত্তা দৃশ্যমান হয়ে ওঠবে যিনি মহাকর্ষ ও অভিকর্ষ শক্তি দ্বারা সমগ্র সৃষ্টি জগতকে ধারণ করে রেখেছিলেন। তাহলে এ মহাশক্তিধর সত্তা কে?

www.pathagar.com

শীঘ্রই মহবিশ্বের দিগন্তে এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আমাদের নিদর্শনসমূহ প্রদর্শন করা হবে। ফলে তাদের কাছে ফুটে ওঠবে– এ তথ্য অতি সত্য। (হা মীম-৫৩)

"মহাবিশ্বের সব কিছু ধবংশ হয়ে যাবেআর আপনার একমাত্র প্রভুর সত্তা অবশিষ্ট থাকবে যিনি মহীয়ান ও গরীয়ান।" (রহমান-২৬-২৭)।

বিগ ব্যাং ও চার মৌলিক শক্তির বিচ্ছিন্ন করণ ও ১৫ বিলিয়ন বছর আগে মহাজগতের সৃষ্টি

কখন থেকে মহাবিশ্বের যাত্রা শুরু ? মহাজগত সৃষ্টির সূচনা কিভাবে হয়েছিল? এসব প্রশ্ন সভ্যতার শুরুতেই মানুষের মনে অনুসন্ধিৎসা জাগিয়েছে। আর এসব প্রশ্নকে কেন্দ্র করে বহু কল্প-কাহিনীর জন্ম হয়েছে অতীতে।

বর্তমান সময়ে এসব প্রশ্নের জবাব সন্ধানে চিন্তাশীল বিজ্ঞানী গবেষণায় নিয়োজিত রয়েছেন। গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ থেকে মহাবিশ্ব সৃষ্টির যে তত্ত্ব বেরিয়ে এসেছে তার নাম বিগব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ তত্ত্ব। এ তত্ত্ব বা সুত্রকে সব বিজ্ঞানীরাই স্বীকৃতি দিয়েছেন এবং মহাজাগতিক বিকিরণ পটভূমি থেকে বিজ্ঞানীরা নিশ্চিত হয়েছেন যে, প্রায় ১৫ বিলিয়ন বছর আগে এক ভয়ানক মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে মহাজগত সৃষ্টির সূচনা হয়।

বিগব্যাং তত্ত্ব অনুযায়ী মহাবিশ্বের সব অংশ এক সময় খুব সন্নিবিষ্ট ছিল। প্রকৃতপক্ষে এরা অতি ক্ষুদ্র অতি ঘন, অতি তপ্ত গুচ্ছের মধ্যে আটিবদ অবস্থায় ছিল। এগুলো সুদুর অতীতে বিগ ব্যাং নামক ভয়ংকর মহাবিস্ফোরণের মাধ্যমে প্রসারতা লাভ করতে থাকে এবং স্থান কাল, পদার্থ ও শক্তিকে অস্তিত্ব দান করে প্রথমে চারটি মৌলিক শক্তি যথা–

১.মহাকর্ষ শক্তি
২. বিদ্যুৎ চুম্বকীয় শক্তি
৩.সরল নিউক্লিয় শক্তি
৪. এবং দুর্বল নিউক্লিয় শক্তি

ঐ একটি টুকরো বস্তুপিণ্ড অবস্থায় ছিল। বিকিরণের চাপে সম্প্রসারণের সহায়ক ছিল। ফলে ইলেকট্রন, প্রোটন, নিউট্রন, কিছু পরিমাণ হাইড্রোজেন এবং হিলিয়ামগ্যাসের সমন্বয়ে গঠিত বস্তুপিণ্ড ঘন মেঘপুঞ্জে পরিণত হয়েছিল। এসব মেঘপুঞ্জের নিজস্ব মাধ্যাকর্ষণ শক্তি হওয়ার কারণে সংকুচিত হতে পারতো। কিন্তু পরস্পর দুই বিপরীত শক্তির মিথস্ক্রিয়ার ফলে ঐ মেঘপুঞ্জের মধ্যে তীব্র গতির আবির্ভাব ঘটে। এদের জোরালো আবর্তন গতিও ছিল। এ

www.pathagar.com

গতি আবর্তনের প্রভাবে গ্যাসীয় মেঘমালা বিভিন্ন আকার ধারণ করতে লাগলো।

১. গোলাকার,

২. মোচাকার,

৩. ডিম্বাকার এবং

৪. আরও অন্যান্য আকার।

এই সব আকৃতি বিশিষ্ট গ্যাসীয় মেঘপুঞ্জ শেষান্তে গ্যালাক্সিতে পরিণত হয়।

এই মহাবিশ্বের বিকিরণ পটভূমি এবং বিগব্যাং তত্ত্বের সত্যতা বা মহাবিস্ফোরণ উত্তর পরিস্থিতি এবং বিগ ব্যাং যে কি ঘটেছে তার অবস্থা জানার জন্য ১৯৪৬ সালে বিজ্ঞানী জর্জ গ্যামো আদি অগ্নিবলের তাপমাত্রা নির্ণয় করার মতো কঠিন কাজে মনেনিবেশ করেছিলেন। যার সঠিক তথ্য লাভ করা খুবই কঠিন। যে ঘটনা সুদূর অতীতে ঘটে গেছে তার সম্পর্কে কতটা বিশ্বাসযোগ্যভাবে তুলে ধরা সম্ভব সে বিষয়ে চিন্তা করলে এটা খুবই বিস্ময়কর। আদি বস্তুপিণ্ডকে ১০১৩ ডিগ্রি K তাপমাত্রায় রেখে প্রচণ্ড চাপ প্রয়োগ করে একটি অবিশ্বাস্য মাত্রার ঘনত্বে পর্যবসিত করা যায়। এরূপ প্রতি উষ্ণ ও অতি ঘনত্বের আদি বস্তুপিণ্ডটির মহা বিস্ফোরণের পর সমগ্র বিশ্ব ঠাণ্ডা হতে শুরু করছিল। বিজ্ঞানী গ্যামো প্রমাণ করেছিলেন যে, উত্তপ্ত আদি যুগের বিকিরণ যে ঠাণ্ডা হয়ে আজকের অবস্থায় এসেছে তা এখনো দর্শনযোগ্য। এ বিকিরণই হলো মহাজাগতিক পটভূমি বিকিরণ বা পশ্চাতের বিকিরণ যা ২ মিঃ মিঃ মাইক্রোওয়েভ তরঙ্গ দৈর্ঘ্যের উপরে আরোহন করে এবং ৩০k ব্ল্যাকবডী Black body বিকিরণের সঙ্গে সমন্বয় সাধন করে চলে। মাইক্রোতরঙ্গ বিকিরণের সুষম ফাক্স যা মহাশূন্যে সর্বত্রগামী বলে বিশ্বাস করা হয়।

১৯৬৫ সনে এ বিকিরণ এর তথ্য আবিষ্কার করেন আরনো পেনজিয়াস এবং রবার্ট ইউলসন নামক দুইজন পদার্থ বিজ্ঞানী এবং যা মহাবিশ্বের প্রকৃতি ও ইতিহাস অনুধাবনের কেক্ষে বিশেষ প্রভাব ফেলেছে। জ্যোতি : ও পদার্থবিদগণ ১৯৭০ দশকের শেষ দিকে প্রায় সবাই স্বীকার করে নেন যে, মাইক্রোতরঙ্গ বিকিরণের উৎস হলো বিগ ব্যাং বা মহাবিস্ফোরণ কালে উৎক্ষিপ্ত অগ্নিগোলকের অবশেষ। মাইক্রোওয়েভ বিকিরণের বর্ণালির একটি মাত্র কম্পাঙ্গে প্রাখুর্য পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে বিজ্ঞানীরা সমগ্র বর্ণালী সম্পর্কে যে সঠিক ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যা মহাবিশ্বের সৃষ্টিতত্ত্বের আবিস্কারের ক্ষেত্রে বিশাল সূত্র। উত্তপ্ত এবং সংকুচিত আদি মহাবিশ্ব ধারণার পক্ষে মহাজাগতিক মাইক্রোতরঙ্গ বিকিরণ এখনো পর্যন্ত প্রমাণিত প্রমাণ সমূহের থেকে আরো জোরালো প্রমাণ।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানী হাবলের সূত্র: ১৯২৯ সনে বিজ্ঞানী হাবল সূত্র দেন যে, "গ্যালাক্সিগুলো আমাদের দিক থেকে সকল দিকে ছুটে চলেছে। এ গ্যালাক্সিগুলোর দূরত্ব এবং এদের পশ্চাদগামী হওয়ার গতিবেগের মধ্যে একটি রৈখিক সম্পর্ক বিদ্যমান। এদের এ গতিবেগ এদের দূরত্বের সঙ্গে সম্পর্ক রেখে বৃদ্ধি পেয়ে থাকে।"

যার অর্থ হচ্ছে- দূরত্ব যত বৃদ্ধি পায় গতিবেগও তত বৃদ্ধি পেতে থাকে। এ নিয়মকেই বলা হয় "হাবল সূত্র"। মাউন্ড উইলসনে অবস্থিত জ্যোতিষ্ক বিষয়ক গবেষণাগারে গ্যালাক্সিদের Red shift সম্বন্ধে গবেষণা চালিয়ে হাবল এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছিলেন যে, গ্যালাক্সিদের দূরত্ব যত বৃদ্ধি পায় তাদের গতিবেগও ততো বৃদ্ধি পেয়ে থাকে। দূরত্বের সঙ্গে গতিবেগের অনুপাতকে বলা হয় হাবলস কনস্ট্যান্ট। এর অনুপাতের বিপরীত হলো হাবল সময়, যে সময়ে একটি গ্যালাক্সি তার বর্তমান গতিবেগসহ তার বর্তমান অবস্থায় পৌছতে পারে। অন্যভাবে বলতে গেলে এভাবে বলতে হয় যে, বিগব্যাং এর সময় থেকে তার বর্তমান সময় পর্যন্ত। হাবলের এ তথ্য বা সুত্র অনুসারে ১৫ বিলিয়ন বছর আগে, চাঁদ, সূর্য, গ্যালাক্সি কিছুই ছিল না, ছিল না নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডলের কোন অস্তিত্ব।

www.pathagar.com

সৌর প্রতিরক্ষা, স্তর সম্পর্কে কোরআন এর সূত্র

"আর আমরা তোমাদের উপর সপ্ত স্তর বানিয়েছি এবং আমাদের সৃষ্টির ব্যাপারে আমরা কখনো অমনোযোগী নই।" (মুমিনুন-১৭)

"আর অমরা আকাশকে নক্ষত্র খচিত করেছি আলোর জন্য এবং প্রতিরক্ষার জন্য।" (হামীম সিজদা-১২)

"আমরা আকাশকে প্রতিরক্ষা ছাদ বানিয়েছি। তবুও তারা আমাদের নির্দেশনাগুলো এড়িয়ে যায়।" (আম্বিয়া-৩২)।

সাত রংয়ের সমাহার ও সাত আকাশ

শপথ সূর্য ও তার আলাক রশ্মির। (শামস-১)

বৈদ্যুতিক ভাল্বের আলো আর সূর্যের আলো সমান নয়। এক কথায় বলা যায় উভয় আলোতে রয়েছে আকাশ পাতাল ব্যবধান। সূর্যের আলোতে সাত রংয়ের সমাহার আছে বলেই দিনের দীপ্তিময়তা সৃষ্টি হয় যা বৈদ্যুতিক আলোতে অনুপস্থিত।

সূর্যের আলোর রংগুলির সংক্ষিপ্ত প্রকাশ ইংরেজীতে 'বেঅনীসহকলা'।

1. V-violet- বেগুনী
2. Y-Yellow-হলুদ
৩. I-Indigo-অভিনীল
৪. O-Orange-কমলা
5. B-Blue-নীল
৬. R-Red-লাল
7. G-Green-সবুজ

তিন কোণা বিশিষ্ট অতি স্বচ্ছ কাচ বা প্রিজমের মাধ্যমে সূর্যালোকের সাত রং আলাদা করা যায়। সূর্য রশ্মির সামনে প্রিজম ধরলে তাতে সূর্যলোক প্রতিসারিত হয়ে সাতভাগে বিভক্ত হয়ে যায়।

সূর্যালোকের সাত রং রংধনুর rainbow মধ্যে ফুটে ওঠে। পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর সূর্য যখন পশ্চিম আকাশে ঢলে পড়ে তখন বায়ুতে ভাসমান জলীয় কণায়

www.pathagar.com

রবির আলো প্রতিফলিত হয়ে আকাশে সাত রংয়ের মনোরম আলোক রেখা সৃষ্টি করে। এর নাম রংধনু বা rainbow। মহাবিশ্বের সৃষ্টি নিদর্শনগুলির এটি অন্যতম।

কোরআনে বর্ণিত অসংখ্য সাত-এর মর্ম

কোরআনে বর্ণিত "ছাবআ" শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বার-বার ছাবআ মানে সাত। জ্ঞানীদের জন্য 'ছাবআ' শব্দটি ভীষণভাবে তথ্য ও তত্ত্ব নির্ভর।
বৈজ্ঞানিক অনুধাবনে আকাশে সাতটি অঞ্চল বা Region বিদ্যমান। বায়ুমণ্ডলেও রয়েছে সাতটি স্তর। পৃথিবীর স্তরও সাত, মহাকাশের দৃশ্যমান।

জ্যোতিষ্ক সাত প্রকার।

1. Stars
2. planets
3. Satellites
4. Comets
5. Nebula
6. Galaxies
7. Quasars

এবং তারকাও সাত প্রকার :

1. Brown dwarf stars
2. Main sequences stars
3. Red giants stars
4. pulsating stars
5. White dwarf stars
6. Neutron stars
7. Black holes ইত্যাদি।

দেখা যাচ্ছে সূর্যের আলোতেও সাত রংয়ের সমাহার বিদ্যমান।
অতএব- 'ছাবআ' বা সাত শব্দের বিশেষত্ব স্পষ্ট–

কোরআন বিভিন্ন আয়াতে তার সমর্থন সূত্র

"আমরা তোমাদের উপর সাতটি সুরক্ষিত (স্তর) তৈরি করেছি।"

(নাবা-১২)

"আমরা তোমাদের উপর সাত স্তবক সৃষ্টি করেছি।" (মুমিনুন-১৭)

www.pathagar.com

মহাকাশের পরিমাপ সূত্র

কোটি কোটি কিঃ মিঃ ব্যবধানে অবস্থিত মহাকাশে নক্ষত্রগুলির দূরত্ব নির্ণয় করা অনেক কঠিন বিষয় ছিল। শক্তিশালী টেলিস্কোপের সাহায্যে ১১০০০ মিলিয়ন আলোক বর্ষ পর্যন্ত দেখা যায়। বিজ্ঞানী হাবলের আবিস্কৃত হাবল টেলিস্কোপ দ্বারা M100 গ্যালাক্সি পর্যন্ত দূরত্ব নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। কিন্তু মহাবিশ্বের অন্তহীন অঞ্চলে যে সব নক্ষত্রের অবস্থান আমাদের গ্যালাক্সির থেকে ঐ সব নক্ষত্র মণ্ডলীর দূরত্ব কিভাবে নির্ণয় করা যায়।

নক্ষত্রগুলি পর্যবেক্ষণ করতে করতে বিজ্ঞানীরা দেখলেন যে কোন নক্ষত্রের উজ্জ্বলতার তারতম্য ঘটে অর্থাৎ নক্ষত্রগুলি কখনো অতি উজ্জ্বল কখনো মৃদু উজ্জ্বল চরিত্র প্রদর্শন করে থাকে। আলোর গতি প্রতি সেকেন্ডে 300000 কিঃ মিঃ। এরি ভিত্তিতে তীব্র আলোক রশ্মি আর মৃদু রশ্মির গতিবেগের দূরত্বে একটি পার্থক্য ধরা পড়ল বিজ্ঞানীদের গবেষণায়। এ পার্থক্যটুকু হিসাব করে বিজ্ঞানীরা একটি নক্ষত্র থেকে অন্য নক্ষত্রের দূরত্ব এবং আমাদের গ্যালাক্সি থেকে দূরবর্তী গ্যালাক্সির দূরত্ব পরিমাপ করার একটি সহজ কৌশল পেয়ে গেলেন। দূরত্ব মাপার এ কৌশলকে বলা হয় স্পেকট্রস্কোপি। বা বর্ণালী অনুবীক্ষণ পদ্ধতি বা Spectroscopic Analysis এ পদ্ধতিতে নক্ষত্র সমূহর দূরত্ব পরিমাপ করা সহজ হয়।

কোরানিক সূত্র

"অতএব তিনি আকাশকে সুউচ্চ করেছেন এবং সেখানে পরিমাপ সহায়ক স্থাপন করেছেন।" (রহমান-৭)।

নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণয় করার জন্য মহাকাশে যে সকল নক্ষত্র মাইলফলক হিসাবে স্থাপন করা হয়েছে, নিশ্চয় সেসব পরিমাপ সহায়ক নক্ষত্রের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে কোরানে। এটা স্পষ্ট।

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের আলোকে পৃথিবী সৃষ্টির পর্যায় ও গতি:

বিগব্যাং-এর মাধ্যমে মহা জগত সৃষ্টির সময়কাল ও বিভিন্ন পর্যায় এখানে পর্যালোচনা করা হলো।

মহা জগত সৃষ্টির প্রথম বা গ্যালাক্সি গঠন পর্ব

মহাজগত সৃষ্টির শুরুতে এমন দ্রুত সম্প্রসারণ হতে থাকে যার ফলে - মহাকর্ষীয় শক্তি অপর তিনটি শক্তি। যথা ১. সবল নিউক্লিয়, ২. দুর্বল নিউক্লিয় ৩. এবং বিদ্যুৎ চুম্বকীয় থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের বিরাট মেঘমালা মহাকর্ষীয় ভাঙ্গনের ফলে পুঞ্জবস্তুপিণ্ডে পরিণত হয়। এসব গ্যাস গঠিত বস্তুপিণ্ড উড়ে উড়ে স্থানান্তরিত হতে থাকে, যা প্রকারান্তরে নক্ষত্রে রূপ লাভ করে। নক্ষত্রসমূহ মহাকর্ষীয় শক্তির টানে কখনো গোলাকার, কখনো শঙ্কিল, কখনো উপবৃত্তাকর গ্যালাক্সি গঠন করে। এ পর্বে সৃষ্টিসমূহ সম্পন্ন হতে ২৫০ মিলিয়ন বৎসর সময় অতিবাহিত হয় এবং এটাকে গ্যালাক্সি গঠনের পর্বও বলা হয়।

মহাজগত সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্ব :
বৃষ্টি ও সাগরের সৃষ্টি
প্রথম মহাযুগ

কোন কোন নক্ষত্রে ব্যাপক বিস্ফোরণ ঘটে এবং ভারী মৌলিক পদার্থ ছিটকে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে যার মাধ্যমে নেবুলা গঠিত হয়। নেবুলাগুলো মহাকাশে ভ্রমণ করে পরস্পর কাছাকাছি আসলে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়। যে সংঘর্ষের কারণে ভারী পদার্থ বিচ্যুত হয়ে অবশেষে তা গ্রহ,উপগ্রহে পরিণত হয়। গ্রহ, উপগ্রহগুলো নির্দিষ্ট নক্ষত্রের চার পার্শ্বে ঘুরতে থাকে, এভাবে আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সির নক্ষত্র সূর্যের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে একটি জগত গড়ে তোলে। যার নম সৌরজগত। এ পর্যায়কে সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্ব হিসেবে চিহ্নিত করা হয়। উপরোক্ত দু'পর্বের নিরিখে গঠিত হয় আমাদের পৃথিবী। মহাজাগতিক সৃষ্টি প্রক্রিয়ায় তার জন্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ভু-বিজ্ঞানীদের গবেষণা লব্ধ তত্ত্ব থেকে এ সত্য প্রতিভাত হয়েছে যে, পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ সমুদয় সৃষ্টি চার পর্বে সমাপ্ত হয়েছে। এ সকল পর্বকে ভূতাত্ত্বিক অধিযুগ হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে।

www.pathagar.com

চার প্রক্রিয়ায় পৃথিবীর নির্মাণ

প্রথম অধিযুগ :

এটি ছিল দীর্ঘ অধিযুগ। এ অধিযুগের যাত্রা হয়েছিল ৪.২৫ বিলিয়ন বৎসর পূর্বে এবং এর স্থায়িত্ব ছিল ৩.৬৫ বিলিয়ন বৎসর। এ দীর্ঘ অধিযুগে সমগ্র বসুন্ধরায় ধারাবাহিক রূপান্তর ও বিবর্তন ঘটতে থাকে। এ সময় বিভিন্ন গ্যাস মিশ্রিত উত্তপ্ত গ্যাসীয় মণ্ডল পৃথিবীময় প্রসারিত ছিল। ক্রমান্বয়ে তাপ বিকিরণের ফলে তা তরল পদার্থে রূপান্তরিত হয় এবং এর মধ্যে ক্রিয়া বিক্রিয়ার এক পর্যায়ে H_2 ও O_2 এর রাসায়নিক বিক্রিয়ায় জলীয় বাষ্প গঠিত হয়। তাপমাত্রা আরো হ্রাস পেলে বাষ্পকণা জল কণায় পরিণত হয়ে বৃষ্টিধারায় তা মাটিতে নেমে আসে। এভাবে ১০০ কোটি বছরের মধ্যে বায়ু মণ্ডলের উন্নতি ঘটে। যার ফলে বসুন্ধরায় একাধারে বৃষ্টিপাতের ঘটনা ঘটে এবং সাগর মহাসাগর ও নদ-নদী সৃষ্টি হয়। সৃষ্টির এ পর্যায়কে প্রোটেরোজয়িক অধিযুগ নাম দেয়া হয়েছে।

দ্বিতীয় মহাযুগ:

দ্বিতীয় মহাযুগ বা প্লোয়েজোয়িক মহাযুগ। এ যুগে ক্রমাগত ধারায় ভূ-পৃষ্ঠের রূপান্তর ঘটতে থাকে। মৎস্য প্রাণী, উভয়চর প্রাণী এবং সরীসৃপ প্রাণী এ অধিযুগে আবির্ভূত হয়। এ অধিযুগ শুরু হয়েছিল ৬০০ মিলিয়ন বৎসর পূর্বে এবং এর স্থায়ীকাল ছিল প্রায় ৩৮০ মিলিয়ন বৎসর।

তৃতীয় মহাযুগ :

এ যুগের নামকরণ করা হয়েছে মেসুজয়িক মহা যুগ: এ যুগে মাটির উর্বরতা সৃষ্টি হয়। মরুভূমি বনাঞ্চল, পর্বতমালা এবং সামুদ্রিক অঞ্চল সম্প্রসারিত হতে থাকে। স্তন্যপায়ী জীব প্রথমবারের মতো আবির্ভূত হয় এবং বিরল প্রাণী ডাইনোসর এ কালে আবির্ভূত হয়ে প্রাধান্য বিস্তার করে। এ যুগের স্থায়ীকাল ছিল প্রায় ১৫০ মিলিয়ন বৎসর।

৪র্থ মহাযুগ : ও প্রথম মানব আদমের সৃষ্টি :

এ পর্বের নাম নবজীয়িক মহাযুগ। এটি এমন একটি কাল যার যাত্রা শুরু হয়েছে প্রায় ৭০ মিলিয়ন বৎসর পূর্বে এবং তা এখনো অব্যাহত রয়েছে। ডাইনোসর বিলুপ্ত হয়েছে এবং 'মানুষ' এযুগে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবীর প্রথম মানুষের নাম আদি পিতা আদম (আঃ)। তাঁকে মাটির আর পানির রাসায়নিক বিক্রিয়ায় সৃষ্টি করা হয়। অতএব পৃথিবী সৃষ্টির এ সকল পর্ব সম্পর্কে আল কোরআন তথ্য পেশ করা হয়েছে।

পৃথিবীর গতি

একটি গতিশীল গ্রহ এর নাম পৃথিবী। পৃথিবী নামক গ্রহটি মাধ্যাকর্ষণ শক্তি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়ে এটি সুনির্দিষ্ট পথে সূর্যের চারদিকে ঘুরে বেড়ায়। এবং পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর লাটিমের মতো পাক খায়। সম্প্রতি আরো দুটি তথ্য

www.pathagar.com

জানা গেছে, পৃথিবী সূর্যের কক্ষপথে সূর্যকে নিয়ে আবর্তন করে এবং পৃথিবী সহ গোটা সৌরজগত অভিমুখে পরিক্রমণ করে। পৃথিবীর চারটি গতি :

১। আহ্নিক গতি
২। বার্ষিক গতি
৩। সৌর গতি
৪। সূর্যাক্ষের গতি

১। আহ্নিক গতি

নিজ অক্ষরেখার উপর সূর্যকে কেন্দ্র করে পৃথিবী পশ্চিম দিক থেকে পূর্বদিকে আবর্তিত হয়। এ আবর্তন করতে সময় লাগে ২৩ ঘন্টা ৫৬ মিনিট ৪ সেকেন্ড। প্রায় ২৪ ঘন্টা। এরি আলোকে ২৪ ঘন্টায় ১ দিন নির্ধারিত হয়েছে। আর এটাকে বলা হয় আহ্নিক গতি বা সৌরদিন। পৃথিবী একটি গ্রহ বলেই সূর্যের আলো দ্বারা আলোকিত হয়। সূর্যের আলো যে অংশে পতিত হয় সে অংশে দিন হয়। সুর্য়েও আলো যে অংশে পড়ে না সে অংশে রাত নামে। আহ্নিক গতির কারণেই পৃথিবীতে রাত-দিন পরিণত হয়। পৃথিবীর নিজ অক্ষের উপর আহ্নিক গতি যদি থেমে যেত তাহলে এ বসুন্ধরায় এক অংশে চিরকাল দিন অপর অংশে চিরকাল রাত থাকত। অর্থাৎ রাত আর দিনের পরিবর্তন কখনো ঘটত না।

২। বার্ষিক গতি

নিজ অক্ষে ২৪ ঘন্টায় একবার আর্বতনের সাথে সাথে একটি নির্ধারিত পথে সূর্যের চারিদিকে ঘুরে আসতে পৃথিবীর একবার সময় লাগে ৩৬৫ দিন ৫ ঘন্টা ৪৮ মিনিট ৪৭ সেকেন্ডে। তাই ৩৬৫ দিনে এক বৎসর ধরা হয়। আর এর নাম বার্ষিক গতি।

বার্সিক গতির ফলে সূর্যের আলোক রশ্মি কোথাও লম্বভাবে এবং কোথাও তির্যকভাবে পতিত হয়। এর ফলে দিন-রাতের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে। দিন-রাতের হ্রাস বৃদ্ধির কারণে পৃথিবীতে ঋতু পরিবর্তন হয়।

৩। সৌর গতি

সৌর জগতের তৃতীয় নিকটতম গ্রহ পৃথিবী। সূর্য তার পরিবারের সকল গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানুপুঞ্জ সহ এক নির্ধারিত মঞ্জিলের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এটাকে বলা হয় সৌর চূড়া। পৃথিবীর সৌরজগতের সাথে এর দিকে যে গতিতে আবর্তিত হয় তার নাম সৌরগতি। সৌর জগত কখন দিয়ে Solar Apex এ পৌছাবে এ পর্যন্ত কোন বিজ্ঞানী তা বলতে সক্ষম হননি।

৪। সূর্যাক্ষের গতি

পৃথিবী নিজ অক্ষের উপর ২৪ ঘন্টায় একবার আবর্তিত হয়। ৩৬৫ দিনে একবার ঘুরে আসে সূর্যের চারিদিকে। সৌরজগতের সাথে Solar Apex এর দিকে ক্রমান্বয়ে ধাবিত হয়ে থাকে এবং তার আর একটি ঘূর্ণন প্রক্রিয়া ধরা পড়েছে। সেটি হচ্ছে সূর্যের কক্ষপথের উপর আবর্তন। সূর্যের কক্ষপথ একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৫ মিলিয়ন আলোক বৎসর।

www.pathagar.com

কোরানের আলোকে পৃথিবীর সৃষ্টি পর্যায় ও গতি সূত্রঃ

"আপনি বলুন, তোমরা কি আল্লাহর অস্তিত্বের প্রতি অবিশ্বাস স্থাপন করছ, যিনি দু'পর্বে পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। এবং তাঁর সমকক্ষ সাব্যস্ত করছ? অথচ তিনি সমগ্র মহাবিশ্বের একমাত্র প্রভু। তিনি ভূ-পৃষ্ঠে সুউচ্চ সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং কল্যাণকর সব জিনিস সৃষ্টি করেছেন চার মহাযুগ ব্যাপী। যাতে করে পৃথিবীর বাসিন্দারা রিজিক সন্ধান করতে পারে।"

(হা'মীম-৯-১০)।

"তিনি আল্লাহ যিনি নভোমণ্ডল, ভূ-মণ্ডল এবং তাদের অন্তবর্তী সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় পর্বে।" (সেজদা-৪)।

আহ্নিক গতির উপ-কোরআনের অসংখ্য সূত্র।।

"তোমরা কি দেখনা মহানুভব প্রভু রাতকে দিনের উপর এবং দিনকে রাতের উপর প্রবাহিত করেন। আর তিনি চাঁদ এবং সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করে রেখেছেন। প্রত্যেকে নিজ কক্ষপথে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত চলতে থাকবে।"

(লোকমান-২৯)

"তিনি রাতকে দিনের উপর দিনকে রাতের উপর প্রবাহিত করেন এবং চাঁদ আর সূর্যকে নিয়ন্ত্রণ করেন। প্রত্যেক নির্দিষ্ট কক্ষপথে নির্ধারিত সময় পর্যন্ত আবর্তিত হবে।" (যুমার-৫)

বার্ষিক গতির উপর আল কোরআনিক সূত্র

"আমরা রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন করেছি। অতপর রাতের নিদর্শন নিস্প্রভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি। যাতে তোমরা তোমাদের প্রভুর অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার এবং যাতে স্থির করতে পার বছর সমূহের গণনা এবং হিসাব। আর সব কিছুর বিশদ বিবরণ সুবিন্যাস্ত করে দিয়েছি।"

(বাণী ইসরাইল-১২)

www.pathagar.com

"নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টির দিবস থেকে আল্লাহর বিধান ও গণনায় মাসের সংখ্যা বারো।" (তওবা-৩৬)

"তিনি-ই সূর্যকে উজ্জ্বল প্রদীপ করেছেন এবং চাঁদকে করেছেন আলোকিত (উপগ্রহ)। আর তার জন্য মঞ্জিল সমূহ নির্ধারণ করেছেন যাতে করে তোমরা বছরসমূহ ঠিক করতে পার এবং সময় গণনা করতে পার।"

(ইউনুছ-৫)

সৌর গতির কোরানিক সূত্র

সূর্য তার নির্ধারিত অবস্থানের দিকে ধাবিত হচ্ছে। এটি সর্বশক্তিমান কর্তৃক আদিষ্ট সীমা, যিনি সর্বজ্ঞানের অধিকারী মহান আল্লাহ। (ইয়াসীন-৩৮)

সূর্যাক্ষের গতির কোরানিক সূত্র

প্রত্যেক আকাশী বস্তু মহাশূন্যে সন্তরণ করে চলেছে। (আম্বিয়া-৩৩) তিনি আল্লাহ যিনি আকাশসমূহ এবং পৃথিবীকে ধারণ করে রেখেছেন যেন তারা গতিপথ থেকে বিচ্যুত না হয়। (ফাতির-৪১)

পৃথিবীর সংখ্যা সাত

আকাশের স্তর সাত, বায়ু মণ্ডলের স্তর সাত, সূর্যের আলোতে আছে সাত রং মহাকাশে দৃশ্যমান জ্যোতিষ্ক সাত প্রকার, তারকাবাজির মধ্যেও সাত রকমের তারকা রয়েছে সৃষ্টি নৈপুন্যতা অধ্যায়ে বর্ণনা করা হয়েছে।

আল-কোরআন ইঙ্গিত দিয়েছে যে 'সপ্ত আকাশের মতো সমসংখ্যক পৃথিবী রয়েছে' পৃথিবী বলতে আমরা বুঝি, যেখানে জীবন সৃষ্টি হয়। যেখানে প্রাণী বসবাসের উপযুক্ত বায়ুমণ্ডল রয়েছে। যেখনে ফসল উৎপন্ন হয় এবং আবিষ্কার করার নির্দেশনাবলি রয়েছে।

কোরআনের এই সূত্রের ভিত্তিতেই পৃথিবীর বিজ্ঞানীরা গ্রহ থেকে গ্রহে অনুসন্ধান চালিয়ে যাচ্ছেন পৃথিবীর মতো উপযুক্ত পরিবেশ সমৃদ্ধ কোন গ্রহ পাওয়া যায় কিনা। অথবা কোনো কোনো গ্রহে প্রাণের সন্ধান মিলে কিনা। আমাদের সৌরজগতের বাইরে এখন অনেক গ্রহ আবিষ্কার হয়েছে। যারা নির্দিষ্ট নক্ষত্রের চার পার্শে ঘুরছে। আবার অন্য গ্যালাক্সিতে অবস্থিত গ্রহে এখনো মানুষের অভিজ্ঞতা পৌছেনি। হয়ত একদিন এমন চমক সৃষ্টি হবে পৃথিবীর মতো আরো ছয়টি গ্রহ আবিষ্কার হবে। সে সব গ্রহে পৃথিবীর মত পরিবেশ পাওয়া যাবে কিংবা প্রাণের সন্ধান মিলবে। আর তখন এটা হবে মহাবিশ্বের মহাবিস্ময়। কোরানের নিম্ন সূত্র–

www.pathagar.com

"তিনি আল্লাহ, যিনি সপ্ত আকাশ ও সম সংখ্যক পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন।" (তালাক-১২)

'পৃথিবীর সংখ্যা সাত' এ মর্মে আরো একটি ব্যাখ্যা দেয়া যায়। যেমন ভূ-তাত্ত্বিক ফলাফল থেকে জানা যায় পৃথিবী সাত স্তরে বিভক্ত।

বায়ুমণ্ডল

এটি পৃথিবীর এক অপরিহার্য বাহ্য স্তর। ভূ-পৃষ্ঠে থেকে ৫০০ কিঃ মিঃ ঊর্ধ্বে এ স্তর বিস্তৃত। পৃথিবী মাধ্যাকর্ষণ শক্তির আকর্ষণে ভূপৃষ্ঠের সঙ্গে লেপ্টে আছে।

ভূ-ত্বক : বা মাটি :

পৃথিবীর উপরিভাগের কঠিন বহিরাবণকে ভূ-ত্বক বলা হয়। পৃথিবীর সামগ্রীক দেহ-অবয়ব গঠনে ভূ-ত্বকের অবদান মাত্র ০.৬%। ভূত্বকের পুরুত্ব মহাদেশের তলদেশে গড়ে ৩৫ কিঃ মিঃ এবং সমুদ্র তলদেশে গড়ে ৫ কিঃ মিঃ। এ স্তরে রয়েছে মাটির উর্বরা শক্তির প্রয়োজনীয় উপাদান সমূহ যথা–

অক্সিজেন
এ্যালোমিনিয়াম
আয়রন
ক্যালসিয়াম
সোডিয়াম
পটাশিয়াম
অন্যান্য

অশ্মমণ্ডল

ভূ-ত্বকের নিম্নভাগ থেকে এর পুরুত্ব ১০০ কিঃ মিঃ মাত্র।

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে পৃথিবী, প্রাণ ও মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে

বাইবেল আদিপুস্তকের জেহোভিস্ট রচনায় শুধু একবারই পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টির বিষয়টা উল্লেখ হয়েছে। পক্ষান্তরে, সেখানে প্রাধান্য দিয়ে আলোচিত হয়েছে মানুষ সৃষ্টির বিষয়টি। কথা হচ্ছে, বাইবেলের এই জেহোভিস্ট রচনায় বিশ্বসৃষ্টি পঞ্চম কাহিনী যেভাবে শুরু করা হয়েছে, তা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত সত্যের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। যেমন, আদিপুস্তকের এই জেহোভিস্ট পাঠে বলা হয়েছে যে,
মানুষ যখন সৃষ্টি হয়েছিল তখন পৃথিবীতে গাছপালার কোন অস্তিত্ব ছিল না।
এবং তখনও 'সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ষাণনি,
আর ভূমিতে কৃষিকর্ম করিতে মনুষ্য ছিল না।'
এই বর্ণনায় আরও দেখা যাচ্ছে, বিধাতা
"ধূলির মানুষকে" মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি করেছেন।
এ বক্তব্যের দ্বারা পৃথিবীর মাটি থেকে মানব-সৃষ্টির উপরে গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে এবং এই প্রতীকী বর্ণনার দ্বারা 'মাটিকে" মানুষের আদি উৎস হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। অথচ, উপরের আলোচনায়, অপেক্ষাকৃত আধুনিক রচনা সেকেরডোটাল পাঠে মানুষের সৃষ্টিতে 'মৃত্তিকার' কোনো উল্লেখ নেই।
জীবজগতের আদি উৎস সম্পর্কে 'রিভাইজডস্ট্যান্ডার্ড ভার্সন অব বাইবেলের' (১৯৫২) জেহোভিস্ট রচনায় বলা হয়েছে :
"সদা প্রভু ঈশ্বর সকল বন্য পশু
ও আকাশের সকল পক্ষী সৃষ্টি করিলেন।" (বাণী ১৯)
এখানে কিন্তু এই সকল বন্য পশু ও পাখির আদি উৎস সম্পর্কে তেমন কিছুই বলা হয়নি। ফরাসী ভাষার বাইবেলের (ইক্যুমোনিক্যাল ট্রান্সরেশন অব দি বাইবেল) একই বাণীতে বলা হয়েছে :
"এভাবে সদাপ্রভু ঈশ্বর পুনরায় মৃত্তিকা হইতে বন্য পশু সকল ও আকাশের পক্ষী সকল সৃষ্টি করিলেন।"
(বাংলা বাইবেলের ১৯৭৩ সংস্করণের বক্তব্যও অনেকটা ফরাসী বাইবেলের অনুরূপ) অর্থাৎ ফরাসী এবং বাংলা বাইবেল থেকে দেখা যাচ্ছে, সকল জীবন্ত

www.pathagar.com

যেমন প্রাণী মানুষ পশু-পাখি ইত্যাদি সৃষ্টি হয়েছিল মাটি থেকে। অন্যদিকে ইংরেজি, ফরাসী কিংবা বাংলা বাইবেল সৃষ্টি নিয়ে বা ইঞ্জিলের বাণী বেশ দীর্ঘ। আদিপুস্তকের দুটি বিবরণের মধ্যে এই রচনার শুরু। এতে একে একে স্থান পেয়েছে আকাশমণ্ডলের সৃষ্টি, পৃথিবীর সৃষ্টি, প্রাণিজগতের সৃষ্টি এবং শেষ পর্বে বা চূড়ান্ত পর্যায়ে স্থানলাভ করেছে মানুষের সৃষ্টি সম্পর্কিত বিবরণ।
তবে, মানবসৃষ্টির এই বর্ণনা খুবই সংক্ষিপ্ত।
সৃষ্টিতত্ত্ব-সম্পর্কিত বাইবেলের দ্বিতীয় বর্ণনাটি হচ্ছে, জেহোভিস্ট আমলের রচনা। এই রচনার সময়কাল হচ্ছে, খ্রিস্টপূর্ব নবম অথবা দশম শতাব্দী। সেকেরডোটাল বিচরণের পরপরেই আদিপুস্তকে স্থান লাভ করেছে এই জেহোভিস্ট রচনা। এবং এই জেহোভিস্ট রচনায় মানবসৃষ্টি-সংক্রান্ত বিবরণ তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ। যাহোক, এখানে 'রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন অব দি বাইবেল' থেকে 'আদিপুস্তকের' এই বিবরণ তুলে ধর হচ্ছে।
বাংলা রূপান্তরের বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি কর্তৃক প্রকাশিত বাংলা 'পবিত্র বাইবেল– পুরাতন ও নতুন নিয়ম'-এর 'আদিপুস্তকের' প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায় থেকে উদ্ধৃত :
'আদিতে ঈশ্বর আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী সৃষ্টি করিলেন।
পৃথিবী ঘোর ও শূন্য ছিল। এবং অন্ধকার জলধির উপরে ছিল,
আর ঈশ্বরের আত্মা জলের উপরে অবস্থা করিতেছিল।"
–অধ্যায় ১, বাণী ১ ও ২ঃ
"পরে ঈশ্বর কহিলেন, দীপ্তি হউক, তাহাতে দীপ্তি হইল।
তখন ঈশর দীপ্তি উত্তম দেখিলেন এবং ঈশ্বর অন্ধকার হইতে দীপ্তি পৃথক করিলেন।
আর ঈশ্বর দীপ্তির নাম দিবস ও অন্ধকারের নাম রাত্রি রাখিলেন।
আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে প্রথম দিবস হইল।"–বাণী ৩ থেকে ৫ ;
"পরে ঈশ্বর কহিলেন, জলের মধ্যে বিতান হউক ও জলকে দুইভাবে পৃথক করুক।
ঈশ্বর এইরূপে বিতান করিয়া বিতানের উর্ধ্বস্থিত জল হইতে বিতানের অধঃস্থিত জল পৃথক করিলেন, তাহাতে সেইরূপ হইল। পরে ঈশ্বর বিতানের নাম আকাশমণ্ডল রাখিলেন। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে দ্বিতীয় দিবস হইল।"–বাণী ৬ থেকে ৮ঃ
"পরে ঈশ্বর করিলেন, আকাশমণ্ডলের নিচস্থ সমস্ত জল একস্থানে সংগৃহীত হউক ও স্থল সপ্রকাশ হউক; তাহাতে সেইরূপ হইল।
তখন, ঈশ্বর স্থলের নাম ভূমি ও জলরাশির নাম সমুদ্র রাখিলেন।
আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, তাহা উত্তম।

www.pathagar.com

পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি, তৃণ, বীজোৎপদক ঔষধি ও সজীব স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী ফলের উৎপাদক ফলবৃক্ষ, ভূমির উপরে উৎপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ভূমি-তৃণ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী বীজোৎপদক ঔষধ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী সজীব ফলের উৎপাদক বৃক্ষ উৎপাদন করিল, আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতৎকাল হইলে তৃতীয় দিবস হইল।"– বাণী ৯ থেকে ১৩ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, রাত্রি হইতে দিবসকে বিভিন্ন করণার্থে আকাশমণ্ডলের বিতানে জ্যোতির্গণ হউক; সে সমস্ত চিহ্নের জন্য, ঋতুর জন্য এবং দিবসের ও বৎসরের জন্য হউক, এবং পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য দীপ বলিয়া আকাশমণ্ডলের বিতানে থাকুক, তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর দিনের উপর কর্তৃত্ব করিতে এক মহাজ্যোতি :

ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করিতে তদপেক্ষা ক্ষুদ্র এক জ্যোতিঃ

এই দুই বৃহৎ জ্যোতিঃ, এবং নক্ষত্রসমূহ নির্মাণ করিলেন।

আর পৃথিবীতে দীপ্তি দিবার জন্য, এবং দিবস ও রাত্রির উপরে কর্তৃত্ব করণার্থে, এবং দীপ্তি হইতে অন্ধকার বিভিন্ন করণার্থে ঈশ্বর ঐ জ্যোতিসমূহকে আকাশমণ্ডলের বিতানে স্থাপন করিলেন এবং ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে চতুর্থ দিবস হইল।"–বাণী ১৪ থেকে ১৯ঃ

www.pathagar.com

বাইবেল ঐশী গ্রন্থের আলোকে প্রাণ সৃষ্টি

"ঈশ্বর কহিলেন, জল নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে প্রাণিমত হউক
এবং ভূমির ঊর্ধ্বে আকাশমণ্ডলের বিতানে পক্ষিগণ উড়ুক।
তখন ঈশ্বর বৃহৎ তিমিগণের যে নানা জাতীয় জঙ্গম প্রাণিবর্গে জল প্রাণিময় আছে, সে সকলের এবং নানা জাতীয় পক্ষীর সৃষ্টি করিলেন। পরে ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম। আর ঈশ্বর সে সকলকে আশীর্বাদ করিয়া কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও, সমুদ্রের জল পরিপূর্ণ কর, এবং পৃথিবীতে পক্ষিগণের বাহুল্য হউক এবং আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে
পঞ্চম দিবস হইল।"– বাণী ২০ থেকে ২৩ঃ

"পরে ঈশ্বর কহিলেন, ভূমি নানা জাতীয় প্রাণিবর্গ অর্থাৎ স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী গ্রাম্যপশু, সরীসৃপ ও বন্যপশু উপন্ন করুক; তাহাতে সেইরূপ হইল। ফলতঃ ঈশ্বর স্ব স্ব জাতি অনুযায়ী যাবতীয় সরীসৃপ নির্মাণ করিলেন; আর ঈশ্বর দেখিলেন যে, সে সকল উত্তম।"–বাণী ২৪ থেকে ৩১ঃ

পূর্বে উল্লেখ হয়েছে যে, আরো বর্ণিত রয়েছে, পরে ঈশ্বর কহিলেন,
আমরা আমাদের প্রতিমূর্তিতে, আমাদের সাদৃশ্যে মনুষ্য নির্মাণ করি;
তাহা সমুদ্রের মৎস্যদের উপরে, আকাশের পক্ষিদের উপরে, পশুদের উপরে কর্তৃত্ব করুক।
পরে ঈশ্বর আপনার প্রতিমূর্তিতেই মনুষ্যকে সৃষ্টি করিলেনঃ

"ঈশ্বরের প্রতিমূর্তিতেই তাহাকে সৃষ্টি করিলেন, পুরুষ ও স্ত্রী করিয়া তাহাদিগকে সৃষ্টি করিলেন।
পরে ঈশ্বর তাহাদিগকে আশীর্বাদ করিলেন,
ঈশ্বর কহিলেন, তোমরা প্রজাবন্ত ও বহুবংশ হও
এবং পৃথিবী পরিপূর্ণ ও বশীভূত কর
আর সমুদ্রের মৎস্যগণের উপরে, আকাশের পক্ষিগণের উপরে,
এবং ভূমিতে গমনশীল যাবতীয় জীবজন্তুর উপরে কর্তৃত্ব কর।
ঈশ্বর আরো কহিলেন,

www.pathagar.com

দেখ, আমি সমস্ত ভূতলে স্থিত যাবতীয় বীজোৎপাদক ঔষধি ও যাবতীয় সজীব ফলদায়ী বৃক্ষ তোমাদিগকে দিলাম, তাহা তোমাদের খাদ্য হইবে। আর ভূচরের যাবতীয় পশু ও আকাশের যাবতীয় পক্ষী ও ভূমিতে গমনশীল জাতীয় কীট এই সকল প্রাণীর আহারার্থ হরিৎ ঔষধি সকল দিলাম।
তাহাতে সেইরূপ হইল।"
"পরে ঈশ্বর আপনার নির্মিত বস্তুসকলের প্রতি দৃষ্টি করিলেন,
আর দেখ, সে সকলই অতি উত্তম।
আর সন্ধ্যা ও প্রাতঃকাল হইলে ষষ্ঠ দিবস হইল।"
সৃষ্টি-সংক্রান্ত বর্ণনা অবশ্য এখানেই শেষ হয় নাই।
দ্বিতীয় অধ্যায়ের প্রথম তিন-চারটি বাণীতেও এ বিষয়ের বর্ণনা স্থানলাভ করেছেন। যেমন–
"এইরূপে আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী এবং এতদুভয়স্থ সমস্ত বস্তুব্যূহ সমাপ্ত হইল।
পরে ঈশ্বর সপ্তম দিনে আপনার কৃতকার্য হইতে নিবৃত্ত হইলেন,
সেই সপ্তম দিনে আপনার কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।
আর ঈশ্বর সেই সপ্তম দিনকে আশীর্বাদ করিয়া পবিত্র করিলেন,
কেননা সেই দিনে ঈশর সৃষ্ট ও কৃত সমস্ত কার্য হইতে বিশ্রাম করিলেন।"
"সৃষ্টিকালে যেদিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল নির্মাণ করিলেন, তখনকার আকাশমণ্ডল ও পৃথিবীর বৃত্তান্ত এই।"...
বাইবেলের আদিপুস্তকে বিশ্বসৃষ্টি সম্পর্কে দ্বিতীয় বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে প্রথম বর্ণনার পরে পরেইঃ
"সৃষ্টিকালে যেদিন সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল নির্মাণ করিলেন,
তখনকার আকাশমণ্ডল ও পথিবীর বৃত্তান্ত নেই।
সে সময়ে পৃথিবীতে ক্ষেত্রের কোন উদ্ভিদ হইত না,
আর ক্ষেত্রের কোন ঔষধি উৎপন্ন হইত না;
কেননা, সদাপ্রভু ঈশ্বর পৃথিবীতে বৃষ্টি বর্ণনা নাই,
আর ভূমিতে কৃষিকর্ম করিতে মনুষ্য ছিল না।
আর পৃথিবী হইতে কুজঝটিকা উঠিয়া সমস্ত ভূতলকে জলসিক্ত করিল।
আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকার ধূলিতে আদমকে (অর্থাৎ মানুষকে) নির্মাণ করিলেন,
এং তাহার নাসিকায় ফুঁ দিয়া প্রাণবায়ু প্রবেশ করাইলেন।
তাহাতে মনুষ্য সজীব হইল।" (সূত্রঃ পবিত্র বাইবেল, আদিপুস্তক, ২:-৭)
[মরিস বুকাইলির পুস্তকে উদ্ধৃত এই স্থানে ইংরেজি বাইবেলের বাণীটি হল : But a flood went up from the earth and watered the whole face of the ground. এখানে Flood অর্থাৎ পাবন যে কিভাবে কুজঝটিকায় পরিণত হল, কেবল বাংলা বাইবেলের রচয়িতাগণই তার ব্যাখ্যা দিতে পারেন।

www.pathagar.com

গড যেভাবে ঈশ্বর হলো

বাইবেলে বিভিন্ন আমলের রচনা সংমিশ্রণ কিভাবে ঘটেছে, তার একটি ছক মরিস বুকাইলি তাঁর "দি বাইবেল দি কোরআন অ্যান্ড সায়েন্স" পুস্তকে প্রচলিত ইংরেজি, বাইবেলের অনুসরণে তুলে ধরেছিলেন। মানুষের হতে ধর্মগ্রন্থ বাইবেলের যে কি পরিমাণ রদবদল সাধিত হয়েছে, মরিস বুকাইলির মূল পুস্তকে প্রদত্ত ওই ছকটি তার প্রকৃত প্রমাণ। আরো উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশে প্রচলিত 'বাংলা বাইবেলে' এই জেহোভিস্ট পাঠ ও সেকেরডোটাল পাঠের তারতম্য খুঁজে পাওয়া মুশকিল। তবুও সন্ধানী পাঠক-পাঠিকাদের জন্য কিছুটা দিশা নির্দেশ করা যেতে পারে

যেমন, ইংরেজি বাইবেল জেহোভিস্ট পাঠের তরজমায়

'গড'-কে যেখানে 'জেহোভা' বলে উল্লেখ রয়েছে,

সেখানে 'বাংলা বাইবেলে' তার অনুবাদ করা হয়েছে 'সদাপ্রভু'

অথবা 'সদাপ্রভু ঈশ্বর' বলে। আর সেকেরডোটাল পাঠের বেলায় 'গড'-এর অনুবাদ করা হয়েছে শুধু "ঈশ্বর" শব্দের দ্বারা। যেমন, প্রচলিত 'বাংলা বাইবেলের' ১ নং অধ্যায়ের ২ নং বাণী থেকে শুরু করে ২ নং অধ্যায়ের ৩ নং বাণী পর্যন্ত "ঈশ্বর" শব্দ রয়েছে এবং ২ ং অধ্যায়ের ১ নয় থেকে ৪ নং বাণী পর্যন্ত রয়েছে 'সদাপ্রভু' অথবা 'সদাপ্রভু ঈশ্বর' শব্দ।

www.pathagar.com

আদম ও নারী সৃষ্টি বাইবেল দৃষ্টিতে

অতঃপর বাইবেলের ৮ থেকে ১৭ নং বাণীতে ভূস্বর্গের বর্ণনা রয়েছে এবং এরপর প্রাণিজগৎ ও নারী-সৃষ্টির বিবরণ দেয়া হয়েছে এভাবেঃ

"আর সদপ্রভু ঈশ্বর কহিলেন, মনুষ্যের একাকী থকা ভালো নয়। আমি তাহার জন্য তাহার অনুরূপ সহকারিণী নির্মাণ করি। আর সদাপ্রভু ঈশ্বর মৃত্তিকা হইতে সকল বন্যপশু ও আকাশের সকল পক্ষী নির্মাণ করিলেন, পরে আদম তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন, তাহা জানিতে সে-সকলকে তাহার নিকট আনিলেন, কি কি নাম রাখিবেন, তাহা জানিতে সে-সকলকে তাহার নিকট আনিলেন, তাহাতে আদম যে সজীব প্রাণীর যে নাম রাখিলেন, তাহার সে নাম হইল। আদম যাবতীয় গ্রাম্যপশুর খেচর পক্ষীর ও যাবতীয় বন্যপশুর নাম রাখিলেন, কিন্তু মনুষ্যের জন্য তাঁহার সহকারিণী পাওয়া গেল না। পরে সদাপ্রভু ঈশ্বর আদমকে ঘোর নিদ্রায় মগ্ন করিলেন তিনি নিদ্রিত হইলেন, আর তিনি তাহার একখানা পঞ্জর লইয়া মাংস দ্বারা সে স্থান পুরাইলেন। সদাপ্রভু ঈশ্বর আদম হইতে গৃহীত সেই পঞ্জরে এক স্ত্রী নির্মাণ করিলেন ও তাহাকে আদমের নিকট আনিলেন। তখন আদম কহিলেন, এবার (হইয়াছে); ইনি আমার অস্থির অস্থি ও মাংসের মাংস, ইহার নাম নারী হইবে, কেননা ইনি নর হইতে গৃহীত হইয়াছেন। এই কারণে মনুষ্য আপন পিতামাতাকে ত্যাগ করিয়া আপন স্ত্রীতে আসক্ত হইবে। তখন আদম ও তাহার স্ত্রী উভয়ে উলঙ্গ থাকিতেন, আর তাহাদের লজ্জাবোধ ছিল না।"– বাইবেল দ্বিতীয় অধ্যায়, বাণী ১৮ থেকে ২৫ঃ

আদিম মানব আদমঃ আদম অর্থ মৃত্তিকা

বাইবেলে মানুষ সৃষ্টির কতকাল আগে অথবা কতকাল পরে জন্তু-জানোয়ার সৃষ্টি হয়েছিল, সে সম্পর্কে নিদিষ্ট করে কিছু বলা হয়নি। [বাইবেলের উভয় পাঠে অবশ্য দেখা যায় "তাহাদের কি কি নাম রাখিবেন তাহা দেখার জন্য (স্রষ্টা) সেই সকলকে তাহার (আদমের) নিকট আনিলেন]" এর দ্বারা অবশ্য বলা হচ্ছে না যে, জন্তু-জানোয়ার মানুষের আগে না পরে সৃষ্টি হয়েছিল। জেহোভিস্ট পাঠের শেষ পর্যায়ে নারীকে পুরুষের দেহাংশ থেকে সৃষ্টি করার

www.pathagar.com

কথা বলা হয়েছে। সেকেরডোল পাঠ অবশ্য এ সম্পর্কে বিস্তারিত কোন বিবরণ নেই।

বলা অনাবশ্যক যে, জেহোভিস্ট পাঠ ও এ ধরনের প্রতীকীর ব্যবহারের জন্য বৈশিষ্ট্যের দাবিদার।

যেমন, মানুষ যে মৃত্তিকা থেকে সৃষ্টি সেই বিষয়টার উপরে এর লেখকদের সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করতে দেখা যাচ্ছে। এই ধরনের প্রতীকী বক্তব্যের শব্দ চয়নেও বৈশিষ্ট্য লক্ষণীয়। যেমন, প্রথম মানুষের নাম হচ্ছে–আদম। এই 'আদম' শব্দটি হিব্রু ভাষায় কালেকটিভ নাউন বা সমষ্টিবাচক বিশেষ্য (আকারে একবচন কিন্তু অর্থে বহুবচন)। এই 'আদম' শব্দটি এসেছে 'আদামা' শব্দ থেকে, যার অর্থ 'মৃত্তিকা'।

এ কথা স্বীকার্য যে, মানুষ তার অস্তিত্বের জন্য মৃত্তিকার উপরে নির্ভরশীল। এভাবে আরো একটি প্রতীকী শব্দ এই জেহোভিস্ট পাঠে বিদ্যমান। শব্দটি হচ্ছে, 'প্রত্যাগমন'। 'মানুষের পতনের' অধ্যায়ে (আদিপুস্তক, ৩১, ১৯-২০ আদম সন্তান ও সমস্ত জীবন্ত বস্তুর ভাগ্যলিপি অভিন্ন বলে বাইবেল-লেখক উল্লেখ করেন।

বলেছেন : "সকলে একস্থানে যাইবে, সকলে ধূলি হইতে এবং সকলে ধূলিতে মিশিয়া যাইবে।"

[বাংলা বাইবেলে আছেঃ "তুমি তো তাহা হইতে গৃহীত হইয়াছে; কেননা তুমি ধূলি, এবং ধূলিভেদ প্রতিগমন করিবে।" এখানে বহুবচন অনুপস্থিত।

মৃত্তিকায় মানুষের এই প্রত্যাগমনের বিষয়টি গীত সংহিসতায় (১০৪, বাণী ২৯) পুনরুল্লিখিত হয়েছে; এবং বুক অব জব বা ইয়োব পুস্তকেও (৩৪, ১৫) এই ধারণার উল্লেখ দেখা যায়।]

এ থেকে বিষয়টি স্পষ্ট, তা হলো, মৃত্যুর পর মানুষের ভাগ্যে কি ঘটবে, বাইবেলের সেই বর্ণনায় একটা গুরত্বপূর্ণ অথচ ধর্মীয় অর্থ আরোপ করা হয়েছে। অন্যকথায়, এভাবেই আদিপুস্তকের জেহোভিস্ট পাঠে মানুষের আদি উৎপত্তিস্থলকে তার শেষ প্রত্যাবর্তনস্থল হিসেবে নির্দিষ্ট করে দেওয়া হচ্ছে। মোদ্দাকথা, এই যে, গোটা বিষয়টাকে এই বর্ণনায় জাগতিক কোনো বিষয় হিসেবে গ্রহণের বিন্দুমাত্র অবকাশ থাকছে না। সুতরাং, তা থেকে ধর্মীয় কোন তাৎপর্য খুঁজবারও কোন প্রয়োজন দেখা দিচ্ছে না। অর্থাৎ বর্ণিত এই বিষয়টা পরিপূর্ণরূপে নিরেট একটি ধর্মীয় ভাবধারার রূপ পরিগ্রহ করেছে।

আমাদের মনে না রাখলে ভুল হবে যে, সেকালে বাইবেল-লেখকবৃন্দ এমনভাবে নিজেদের বক্তব্য পেশ করতে চাইতেন–যাতে সে বক্তব্য মানুষেরা সহজেই বুঝতে পারে। তাই তারা তাদের সময়কালের ভাষাভঙ্গিতেই বাইবেলের বক্তব্য তুলে ধরার প্রয়াস পেয়েছেন এবং প্রচলিত ঐতিহ্য থেকেই

www.pathagar.com

বাইবেল রচনার জন্য প্রয়োজনীয় বরাত বা সূত্র টেনেছেন। আরো স্পষ্টভাবে ধরা পড়ে যখন আমরা বাইবেলের জেহোভিস্ট পাঠ ও সেকেরডোটাল পাঠের তুলনামূলক বিচার করতে বসি। দেখা গেছে, একটা পাঠে সঙ্গে আরেকটা পাঠের রচনাকালের ব্যবধান চারশত বছর না হলেও তিনশত' বছরের কম নয়। বিচার-বিশ্লেষণে আর ধরা পড়ে যে, অপেক্ষাকৃত আধুনিক সেকেরডোটাল রচনায় জেহোভিস্ট পাঠের আমূল পরিবর্তন সাধন করা হয়েছে। আজ আমরা যে বাইবেল পাচ্ছি, তা হু-বহু সেই সময়কার বাইবেল কি-না, সে সম্পর্কে বৈধ কোন প্রমাণ কোথাও নাই। কিন্তু তথাপি এই আধুনিক বাইবেল থেকেও সেই পরিবর্তনের বিষয়টা স্পষ্টভাবেই ধরা পড়ে। অন্তত চেতনা কোন পাঠকের বুঝতে মোটেও বেগ পেতে হয় না যে, সেকেরডোটাল পাঠ রচনার বেলায় নতুন এমন অনেক কিছু জুড়ে দেওয়া হয়েছে যা জেহোভিস্ট পাঠে ছিল না, এবং এমন অনেক কিছু জেহোভিস্ট পাঠে ছিল– যা সেকেরডোটাল পাঠ রচনার কালে সম্পূর্ণ বাদ দিয়ে দেওয়া হয়েছে।

বিস্ময়কর হলেও সত্যি যে, জেহোভিস্ট পাঠে পৃথিবী ও আকাশমণ্ডল সৃষ্টির বিষয়টা অত্যন্ত সাদামাটাভাবে বর্ণিত হয়েছে : কিভাবে সেই সৃষ্টিকর্ম সম্পাদিত হয়েছিল তার কোনো বিবরণ সেখানে স্থান পায় নাই।

সূত্র : মানব সৃষ্টির ইহিাস ড. মরিস বুকাইলি।-বিশ্লেষক মাসুদুল হাসান

www.pathagar.com

মানুষের আদি উৎস নিয়ে নানা মতবাদ

পৃথিবীতে মানুষের উৎপত্তি ও বিকাশ সম্পর্কে বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এগুলোর মধ্যে সবচেয়ে অগ্রহণযোগ্য এবং বিজ্ঞান বহির্ভত মতবাদ হচ্ছে চার্লস ডারউইনের 'মানব বিবর্তনবাদ' তত্ত্বটি। এতে ডারউইনি বলেছে, প্রতিটি জীব বিবর্তনের ফলে সৃষ্ট বলে বর্তমানে আধুনিক মানব প্রজাতি বিবর্তনের আওতাভুক্ত এবং আদি Primate-এর এটি শাখার উন্নত সংস্করণই বর্তমান সুন্দর মানব। বহু কোষী কার্ভাটা (chodrata) পর্বে মেরুদণ্ডী ও স্তন্যপায়ীচার পা (Legs) বিশিষ্ট বানর, গরিলা শিম্পাঞ্জি এবং মানুষ প্রাইমেট-এর অন্তর্ভুক্ত। আদি প্রাইমেট এর বিবর্তনের ভিন্ন শাখায় কেউ হয়েছে বানর, কেউ হয়েছে গরিলা, কেউ শিম্পাঞ্জি এবং সর্বাধিক বিবর্তনের সহায়ক প্রজাতির একটি শাখা মানুষে পরিণত হয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দির বিজ্ঞানীরা ডারউইনের উক্ত মতবাদটি বৈজ্ঞানিক গবেষণার সামনে টিকছে না বিধায় বাতিল করে দিয়েছেন। শুধুমাত্র কিছু নাস্তিক বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী এ তত্ত্বটি একশ ভাগ সত্য মেনে নিয়ে তাদের লিখিত বই পত্রে উদ্ধৃত করে থাকে।

বাস্তববাদী বিজ্ঞানীরা ডারউইনের বিবর্তনবাদ তত্ত্বের অবাস্তবতা প্রমাণ করতে গিয়ে যুক্তি প্রদর্শন করেছে, যদি বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির বিবর্তনের ফলে মানুষ সৃষ্টি হয়ে থাকে তাহলে মানুষের বিচার ক্ষমতা, প্রজ্ঞা, বিবেক, বুদ্ধিমত্তা, আত্মশক্তি, উদ্ভাবনী শক্তি, চিন্তাশক্তি প্রভৃতি বৈশিষ্ট্যও কি বিবর্তনের ফল? যা বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মধ্যে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত। সৃষ্টি কুলের মধ্যে একমাত্র মানুষই কথা বলতে পারে। স্বর যন্ত্রর সাহায্যে শব্দ তৈরি করে কথা বলার জন্য মানুষের মস্তিষ্কে একটা অঞ্চল রয়েছে যার নাম 'ব্রোকার জোন'। শিম্পাঞ্জি, গেরিলা, বানর কিংবা অন্য যে কোন প্রাণীর মস্তিষ্কে ব্রোকার জোনের সন্ধান মেলেনি। তাই অন্যান্য প্রাণীরা কথা বলতে পারে না। এসব বৈশিষ্ট্য ছাড়াও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য মানুষের আছে যা বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির মধ্যে নেই। যেমন–

(১) চলনঃ শুধু মাত্রই পুরাপুরি দু'পায়ে হাঁটতে সক্ষম।

(২) মুষ্টিবদ্ধতাঃ মুষ্টিবদ্ধ করার ক্ষমতা কেবল মানুষের রয়েছে। হাতের পাঁচটি আঙ্গুল।

www.pathagar.com

প্রত্যেক বস্তুই তার মৌলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয়-আরবী প্রবাদ

প্রাণ পানির তৈরি তার প্রমাণ

১। প্রাণী পানি ছাড়া বাঁচে না।
২। মানুষের শরীর বিশেষ করে রক্তের মধ্যেই ভাগ পানি দ্বারা গঠিত।
৩। জলভরা সমুদ্র দেখলে মন প্রশান্তিতে ভরে যায়।
৪। বৃষ্টি ও জলাশয় মনে খুব টানে।

আধুনিক বিজ্ঞান তথা বিগব্যাং অনুযায়ে পানির বির্বতিত জমাট রূপ হচ্ছে মাটি মানুষ মাটির তৈরি তার প্রমাণ।

১। কবর মানুষের শরীর মাটিতে মিশে একাকার হয়ে যায়।
২। মাটির তৈরি নির্যাস থেকে তৈরি শাকসবজি না খেলে মানুষ সুস্থ থাকে না।
৩। শারীরিক অসুস্থতায় মাটি থেকে আবিস্কৃত কেমিক্যাল দ্বারা তৈরি ঔষধ খেলে মানুষ ভাল হয়। ঔষধ হচ্ছে শরীরে মাটির নির্যাসের যে উপাদানে ঘাটতি হয় তা মাটির সে উপাদান দ্বারাই ঔষধ বানিয়ে পূরণ করা হয়।
৪। মানুষের মন কাঁদামাটি গ্রামীণ মাটির পরিবেশকে দারুণ আকর্ষণ করে।

মাটির নির্যাস

১। সোডিয়াম ২। ক্যালসিয়াম ৩। ম্যাগনেসিয়াম ৪। পটাশিয়াম ৫। হাইড্রোজেন ৬। অক্সিজেন ৭। নাইট্রোজেন।

শরীরের রোগ ও মাটির নির্যাস

মানুষের দেহ বর্ণিত মাটির নির্যাস থেকে তৈরি এবং মানুষের দেহ উপরোক্ত মাটির নির্যাস থেকে তৈরি বলেই উপরোক্ত নির্যাসের কোন একটির ঘাটতি হলে মানুষ শারীরিক ঘাটতির কারণে অসুস্থ হয়ে পড়ে। যাকে আমরা অসুখ বলি। ফলে উপরোক্ত মাটির নির্যাস থেকে ঔষধ দিয়েই অসুখ বা রোগ নিরাময় হয়। রোগ হচ্ছে যে সব মাটির উপাদানে মানুষ সৃষ্টি সে সব উপাদানের কোন একটি বা একাধিকটি উপাদান শরীর থেকে অনুপস্থিত হয়ে যাওয়া।

উপরোক্ত মাটির উপাদান আমাদের শরীরে খাবার হিসাবে ঢুকে। প্রত্যেকটি খাবারেও উক্ত মাটির উপাদানগুলো বিদ্যমান। ফল,মূল শাক সবজিতে মাটির উপাদানগুলো সরাসরি শিকড়ের মাধ্যমে আহরণ হয়। যার কারণে শাক সবজি খেলে মানুষের শরীর সবচে সুস্থ থাকে।

www.pathagar.com

ডিএনএ ও ফিঙ্গার প্রিন্ট

ফিঙ্গার প্রিন্টিং সম্পর্কে আল-কোরআনের সূত্র

"পরন্তু, আমরা মানুষের আঙ্গুলের অগ্রভাগ সঠিকভাবে সন্নিবেশিত করতে সক্ষম। (কিয়ামাহ-৪)

তাহলে বলা যেতে পারে একটি প্রাণী যেসব কোষ দিয়ে তৈরি সেই কোষের মধ্যকার DNA হচ্ছে তার গোটা শরীরের ব্লু-প্রিন্ট। বংশগতি বৈশিষ্ট্যের ধারক আর বাহক DNA (Deoxyribonucleic Acid) যার মধ্যে ধর থাকে শারীরিক ও মানসিক গঠন, চেহারার প্রতিচ্ছবি এবং আচার-আরণগত বৈশিষ্ট্য। বানর কিংবা শিম্পাঞ্জির বিবর্তন থেকে মানুষ সৃষ্টি হয়ে থাকলে মানুষের সারা শরীর লোম দ্বারা আবৃত থাকত। মানুষের লেজ গজত এবং বানরের অন্যসব বৈশিষ্ট্য মানুষের DNA এর মধ্যে ধরা থাকত।

DNA এর গঠন আলাদা আলাদা। এরই বাস্তব প্রয়োগ দেখা যায় DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং এ। যেহেতু দুটি মানুষের DNA এক রকম হতে পারে না। তাই DNA ফিঙ্গার প্রিন্টিং হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকে সনাক্তকরণের অব্যর্থ হাতিয়ার।

DNA বা ডিঅক্সিরাইবোনউক্লিক এসিড

DNA জীবকোষের নিউক্লিয়াসে বিদ্যমান কোমোজোমের একমাত্র স্থায়ী প্রাণরাসায়নিক যৌগ হলো Deoxyribounceic Acid বা DNA এটি ক্রোমোজোম তথা জিনের সাংগঠনিক উপাদানরূপে জীবনের প্রজাতি সত্তা ও বংশগতির নিয়ন্ত্রণ করে। কোষের অধিকাংশ DNA ক্রোমোজোমের উপাদান হিসেবে নিউক্লিয়াস বিরাজ করে। অল্প পরিমাণের DNA মাইটোকেন্ড্রিয়া পাসটিড ও অন্যান্য সাইটোপাজমীয় অঙ্গানুতেও থাকে। DNA গঠিত হয় ৫ কার্বন বিশিষ্ট ডি অক্সিরাইবোজ শর্করা, অজৈব ফসফেট, অ্যাডেনিন (adenine), ওয়ানিন (guanin) সাইটোসিন (cytosin) এবং থাইমিন (thymine) নামক নাইট্রোজেন বেস দিয়ে।

পর্যবেক্ষণ থেকে জানা যায়, DNA জীবকোষে বিদ্যমান বৃহৎ অণুর অন্তর্ভুক্ত। DNA অণুগুলোর আণবিক ওজন দুই বিলিয়ন পর্যন্ত হতে পারে। এ অণুগুলো দীর্ঘ পলিমার যা বহুংখ্যক নিউক্লিউটাইড মনোমার দিয়ে গঠিত। প্রতিটি নিউক্লিউটাইড একটি নাইট্রোজেন ক্ষারক, শর্করা ও ফসফরিক এসিড দিয়ে গঠিত। DNA অণুতে বিদ্যমান নাইট্রোজেন ক্ষারকগুলো হলো পিউরিন।

www.pathagar.com

(অ্যাডেনিন ওগুয়ানিন) এবং পাইরিমিডিন (সাইটোসিস ও থাইমিন)।
পৃথিবীর নিখিল অর্ধ বিশারদগণ বলেছেন, আসলে দুর্মতি ডারউইন মানুষকে নাস্তিকতায় (Atheisim) দিকে ধাবিত করার উদ্দেশ্যে বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি দাঁড় করিয়েছে। কাণ সমস্ত ধর্মগ্রন্থে বলা হয়েছে, মানুষের একজন আদি পুরুষ আছেন।
মানুষ যে স্বয়ম্ভু কিছু নয়, বরং আল্লাহর সৃষ্ট জীব। বিজ্ঞানীরা এ বক্তব্য বিশ্বাস করেন। কিন্তু এ বক্তব্যের সমর্থনে এ যাবত আনুষ্ঠানিক কোন ত্য প্রমাণ হাজির করতে পারেননি। পক্ষান্তরে মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্টি নয়। অর্থাৎ কোরআন ও অন্যান্য ধর্ম গ্রন্থে মানব সৃষ্টি সংক্রান্ত বক্তব্য যে সত্য নয় সে সম্পর্কে ও বিজ্ঞান কোন দলিল প্রমাণ দিতে ব্যর্থ হয়েছে। অধিকন্তু নাস্তিক্যবাদের স্বপক্ষে স্বতঃসিদ্ধ কোন শক্তিশালী প্রমাণ এ যাবত বিজ্ঞানীরা পাননি।
তবে এটা পজিটিভলি স্বীকার করা হয় যে, মানুষ সৃষ্টির সূচনায় যেসব উপাদান (মৃত্তিকা ও পানি) কোরআন ব্যাপকভাবে উল্লেখ করেছে। তা বৈজ্ঞানিক প্রমাণ দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সত্য। মৃত্তিকা অর্থাৎ মৃত্তিকার উপাদান মলিকুউল অথবা মৃত্তিকার সারনির্যান (সুলালাত) হলো মানুষের দেহ গঠনের রাসায়নিক উপাদান। মানবদেহ পরিগঠনের প্রয়োজনীয় রাসায়নিক উপাদান যেগুলি মলিকুউল তৈরি করে সেসব উপাদান ও উপকরণ মৃত্তিকায় বিদ্যমান। এটা সত্য যে সৃষ্টির গোড়াতে সৃষ্টিশীল বিবর্তনের একটি ধারা প্রাণী জগতে চালু ছিল। এ সৃষ্টিশীল বিবর্তন' দুর্মতি ডারউইনের তথাকথিত 'বিবর্তনবাদ'-এর ধারণা থেকে সম্পূর্ণ আলাদা। তাছাড়া সৃষ্টিশীল বিবর্তন তথা রূপান্তর প্রক্রিয়া বিজ্ঞানের একটি প্রতিষ্ঠিত সত্য– একথা বিজ্ঞানের ছাত্রদের মধ্যে কেনা জানে।
সুতরাং সৃষ্টিশীল বিবর্তনের এক পর্যায়ে মহাশক্তিধর ও সর্বময় সৃষ্টিকর্তা এ মর্মে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন যে, তিনি পৃথিবীতে নতুন এক জোড়া 'জীবন্ত প্রাণী' সৃষ্টি করবেন এবং এ জীবন্ত প্রাণী জোড়ার গঠন উপাদানগুলি নিয়ে মানুষ চিন্তা গবেষণা করে সৃষ্টির কৌশলগত প্রক্রিয়া উপলব্ধি করতে সক্ষম হবেন।
অপরপক্ষে, এই 'জীবন্ত প্রাণীদ্বয়' সৃষ্টির পূর্বে পৃথিবীতে আরও অনেক 'জীবন্ত প্রাণী' বিদ্যমান ছিল। ঐসব জীবন্ত প্রাণী "সৃষ্টি শীল বিবর্তনবাদ প্রকিয়ায় পরিব্যাপ্ত ছিল। তাদের গঠনাকৃতি, দেহাবয়ব, শারীরিক শক্তি, ও সক্রিয়া ক্ষমতা ছিল। কিন্তু তাদের ছিল না বাক শক্তি, প্রজ্ঞা, বুদ্ধিসত্তা, উদ্ভাবনী ক্ষমতা বিবেকবোধ ও চিন্তাশক্তি।"
সুতরাং এটা খুবই স্পষ্ট যে, মহান আল্লাহর মহতী ইচ্ছায় সৃষ্টিশীল বিবর্তনের ধারায় এক জোড়া 'জীবন্ত প্রাণী' সৃষ্টি হলো। যারা আজকের গোটা মানব জাতির আদি পিতা-মাতা (The origin parents of men)। আল কোরআনে আদি পিতার নাম উল্লেখ করা হয়েছে আদম (আঃ)। আদম শব্দের আভিধানিক অর্থ Earth বা গোধুম বর্ণ মাটি। জীবনের শুরু যেহেতু DNA থেকে। গোধুম বর্ণ মাটি কিংবা কাদামাটি DNA ও প্রোটিন উপাদানে অণুঘটক (Castalyst) হিসেবে কাজ করে। ক্যাটালিস্ট নিজের পরিবর্তন না ঘটিয়ে অন্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে। এই পরিবর্তন বিবর্তনের ধারায় প্রবাহিত হয়ে

www.pathagar.com

জীবন্ত জীবন জোড়ার (আদম ও হাওয়া-আ) বংশধরদের ও শারীরিক গঠন কাঠামোর পদ্ধতি-প্রক্রিয়ার বিবর্তন ও রূপান্তর ঘটে চলে ভ্রূণ (embryo) সৃষ্টির পর থেকে। এটাই হলো আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের দীর্ঘদিনের আবিষ্কার, গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার ফলাফলজাত সিদ্ধান্ত।

মানুষ যে আল্লাহর সৃষ্ট জীবন, উপরের আলোচনা হলো তারই যৌক্তিক ব্যাখ্যা। কোরআন বলছে, আল্লাহতাআলা মানুষ সৃষ্টি করেছেন। সে রকম আকার আকৃতি দিয়ে, যে রকম আকার-আকৃতি তিনি ইচ্ছা করেছেন। মহামহিম আল্লাহর এ ইচ্ছা প্রকাশ ঘটেছে একটা সংগঠনিক পরিকল্পনার মাধ্যম। এ পরিল্পনার ধারায় প্রয়োজনীয় উপাদানগুলির পরিবর্তন-বিবর্তন রূপান্তরের মধ্য দিয়ে মানুষ গড়ে উঠেছে সুঠামদেহী, বুদ্ধিবৃত্তিক, সামঞ্জস্যপূর্ণ ও গৌরবমণ্ডিত একক সৃষ্ট জীব হিসেবে। যা শুরুতে একটি ফর্মূলার মাধ্যমে দেখানো হয়েছে।

আল্লাহতাআলা আদম (আঃ) কে সৃষ্টি করার পর তাকে জ্ঞান বিজ্ঞান শিক্ষা দিয়ে সমস্ত সৃষ্টির উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন এবং তাঁর নাফ থেকে একজন সঙ্গিন (Spouse) সৃষ্টি করেন। যর নাম 'হাওয়া' (আঃ)। তিনি সমগ্র মানবজাতির আদি জননী (Origin mother) হাওয়া আলইহিমুস সালাম।

আদম এবং হাওয়ার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হওয়ার পর উভয়ের মিলনের ফলে মাতৃগর্ভে সন্তান সৃষ্টি হওয়া ২৮০ দিন পর সুন্দর মানব রূপে ভূমিষ্ট হয়। এভাবে বিশ্বময় গোটা মানব জাতি সম্প্রসারিত হয়েছে এবং মানুষ সৃষ্টির এ প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে। সরাসরি মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টির আর প্রয়োজন নেই।

হে মানব জাতি! তোমাদের প্রভুর অনুগত হও যিনি তোমাদেরকে এক ব্যক্তি থেকে সৃষ্টি করেছেন এবং যিনি তার থেকে তার স্ত্রীকে সৃষ্টি করেছেন। আর তাদের দুজন থেকে বিস্তার করেছেন অগণিত নারী পুরুষ। (নিসা-১)

আল্লাহ তোমাদের নাফস থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং উভয়ের মধ্য থেকে অপত্য আর পৌত্রাদী সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবনাপকরণ সরবরাহ করেছেন। অতএব, তারা কি অযৌক্তিক বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার কর? (নহল ৭২)

উক্ত আয়াত দু'টি থেকে স্পষ্ট প্রতীয়মান হচ্ছে যে, ডারউইনের মানব বিবর্তনবাদ তত্ত্বটি সম্পূর্ণ বিভ্রান্তিমূলক এবং অযৌক্তিক যার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

মানুষ বানরে রূপান্তরিত হওয়ার একটি ঘটনা আল-কোরআনে উল্লেখ আছে। সম্ভবতঃ মিঃ ডারউইন উক্ত ঘটনাটি উল্টো করে মানব বিবর্তনবাদ তত্তটি সাজিয়েছে।

ঘটনাটি হচ্ছে, মাইয়ান ও তুর পাহাড়ের মধ্যবর্ত মুদ্রের তীরে একটি জনপদ ছিল যার নাম 'আইলা'। ইহুদীরা সেখানে বসবাস করত। আল্লাহতাআলা হযরত দাউদ (আঃ) কে তাদের নবী করে পাঠিয়েছিলেন। প্রতি শনিবার নদীর ধারে প্রচুর মাছ এসে খেলা করত। তাই আল্লাহ শনিবারে মাছ শিকার করা ইহুদীদের জন্য নিষিদ্ধ করছিলেন।

www.pathagar.com

প্রত্যেক বস্তু তার মৌলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হয় খণ্ডিতভাবে বর্ণনা দিয়েছেন। আবার সূরা মু'মিনুনের ১২-১৫ নং আয়াতে এ পর্যায়গুলো ক্রমান্বয়ে সাজিয়ে উপস্থাপন করেছেন যা বিজ্ঞান সম্মতভাবে ধারাবাহিক সামঞ্জস্যতা বিধান করে। নিম্নে আল-কোরআন এবং বিজ্ঞানে বর্ণিত ভ্রূণ সৃষ্টির পর্যায়গুলো পাশাপাশি সাজিয়ে দেখানো হলো,

মানুষ সৃষ্টির উপাদান

আল-কোরআন বিজ্ঞান

আল-কোরআন	বিজ্ঞান
১। সুলালাহ (সার নির্যাস)	1। Sperm (n)+ Ovum (n) (প্রজনন অণু)
২। নুৎফা (অনুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট প্রজনন কোষ)	2। Zygote (নিষিক্ত কোষ)
৩। আলাক (জমাট রক্তপিণ্ড)	3। Blastocyst (রক্তপিণ্ড)
৪। মুদগাহ (মাংসপিণ্ড)	4। Somites (বহুকোষী মাংসপিণ্ড)
৫। ইযাম (অস্থি)	5। Skeleton (কংকাল বা অস্থি তন্ত্র)
৬। লাহম (মাংসপেশী)	6। Muscles (মাংস পেশী)
৭। রূহ (প্রা)	7। Foetus (মানব শিশু)

মানুষ তৈরির মৌলিক উপাদান

আল কোরআনে মানুষ তৈরির প্রথম পর্যায়কে বলা হয়েছে মাটির সার বা নির্যাস

"মাটির সার নির্যাস থেকে মানুষ সৃষ্টির সূচনা হয়।"

তাহলে মাটির সার নির্যাস কী? মাটির সার বা নির্যাস হচ্ছে

১.সোডিয়াম ২ .ক্যালসিয়াম ৩ .ম্যাগনেসিয়াম ৪ .পটাশিয়াম
৫.হাইডোজেন ৬. অক্সিজেন ৭ .নাইট্রোজেন -ইত্যাদি।

মাটিতে উৎপন্ন সবুজ বৃক্ষরাজি এবং ক্ষেতের ফসল তাদের শিকড়ের সাহায্যে এ নির্যাসগুলো চুষে নেয়। তারপর ভিটামিনে ভরা বৃক্ষফল আম, কাঁঠাল, আপেল, আঙ্গুর, কলা দেয়। ক্ষেতে ফসল ধান, গম, ভট্টা, যব উৎপন্ন হয়। ফল এবং ফসলগুলো মানুষ খাদ্য রূপে গ্রহণ করার পর পাকস্থলিতে ডাইজেস্ট হয়। ডাইজেস্টিভ খাদ্যের সার নির্যাস থেকে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় পুরুষের শুক্রাশয় উৎপন্ন হয় এবং নারীর ডিম্বাশয়ে ovary উৎপন্ন হয় Ovum. অতঃপর Spermatozoon এবং Ovum এর নিষেক থেকে সৃষ্টি হয় Zygote.। জাইগোট জরায়ুতে Uterus স্থানান্তরিত হয়ে ভ্রূণ embryo গঠন করে। আর এ ভ্রূণ ক্রমান্বয়ে রূপান্তরের মাধ্যমে একটি পরিপূর্ণ মানুষ সৃষ্টি হয়।

১। কবরে মানুষের শরীর মিশে যায়।
২। মাটির নির্যাস থেকে উৎপন্ন শাকসবজি না খেলে মানুষ সুস্থ থাকে না।
৩। শারীরিক অসুস্থতায় মাটির নির্যাস থেকে উৎপন্ন কেমিকেলের মাধ্যমে সুস্থ করার ঔষধ দেয়া হয়।

www.pathagar.com

কোরআনের আলোকে মানব দেহ গঠনের সাতটি বৈজ্ঞানিক পর্যায়

মানব দেহের কোরানিক সূত্র–

"প্রকৃতপক্ষে আমরা মানুষ সৃষ্টি করেছি মাটির সার নির্যাস থেকে। পরে তা নুৎফা (জাইগোট) রূপে একটি সুরক্ষিত আধারে (জরায়ু) স্থাপন করেছি। অতপর তা জমাট রক্তপিণ্ডে (জোঁক সদৃশ বস্তু) রূপান্তর করে লটকে দিয়েছি। তারপর লটকে যাওয়া রক্তপিণ্ডকে মাংসপিণ্ডে পরিণত করেছি। এরপর তাকে অস্থি বানিয়েছি। তারপর অস্থির উপর মাংসপেশী জড়িয়ে দিয়েছি। অবশেষে তাকে একটি ভিন্নরূপ (পূর্ণশিশু) দান করেছি। সুতরাং তিনি মহামহিম আল্লাহতাআলা যিনি সর্বময় মহান স্রষ্টা।"(মু'মিনুন-১২-১৫)

অন্যান্য আয়াতে

"অবশ্যই আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি মাটি থেকে। তারপর প্রজনন কোষ থেকে। তারপর রক্তপিণ্ড থেকে, তারপর মাংসপিণ্ড থেকে, যা কিছুটা অকৃতি প্রাপ্ত হয় কিছুটা আকৃতি বিহীন। যেন আমাদের ক্ষমতা তোমাদের কাছে প্রকাশ হয়ে পড়ে।" (হজ্জ-৫)

তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে, তারপর নুৎফা থেকে তারপর আলাক থেকে, অতঃপর তোমাদের বের করেন একটি পরিপূর্ণ মানব শিশুরূপে।: (মু'মিন-৬৭)

১. কোরানে বর্ণিত 'সুলালাহ' হচ্ছে মানুষ তৈরির বেসিক উপাদান যা থেকে মানুষ সৃষ্টির মলিকুউল আহরিত হয়। অর্থাৎ পিতা মাতার পুষ্টির প্রয়োজনে মাটির সার নির্যাস থেকে যেসব উপাদান সংগৃহীত হয় সেসব উপাদান থেকে নুৎফা তৈরি হয়।

২.নুৎফা বা জাইগোট

আরবী 'নুৎফা' শব্দের আভিধানিক অর্থ হচ্ছে অণুবীক্ষণ যন্ত্রে দৃষ্ট অতি সূক্ষ্ম জনন কোষ। Sperm এবং Ovum উভয় অর্থে নুৎফা শব্দটি ব্যবহৃত হয়।

www.pathagar.com

আবার Sperm এবং Ovum এর মিলনের ফলে গঠিত কোষ, জাইগোটকেও কোরআনে নুৎফা বলা হয়েছে এবং এক্ষেত্রে নুৎফা শব্দের পরে 'আমসাজ' শব্দটি এসেছে। জাইগোট গঠনের ২৪ ঘন্টার পর তা বাচ্চা থলির দেয়ালে ঘেষা প্রকোষ্ঠে স্থান লাভ করে এবং ২টি, ৪টি, ৮টি এভাবে ক্রমান্বয়ে বিভাজন হতে থাকে। এটাকে বলা হয় Morula.

৩। আলাক বা ব্লাস্টোসিস্ট

আলাক অর্থ জমাটবাঁধা রক্তপিণ্ড। বিজ্ঞানে বলা হয় Blastocyst। এটি দেখতে জোঁকের মতো একটি জোঁক রক্ত চুষে নিয়ে যে রূপ ধারণ করে আলাক সে রকম একটি বস্তু। থেকে ৪ সপ্তাহের মধ্যে আলাক জোঁক এর মত রূপ লাভ করে। এর মধ্যে থাকে মাথার সম্মুখভাগের উন্নত অংশ। এ পর্যায়ে হৃদপিণ্ড এর উন্নয়ন ঘটে এবং ভ্রূণটি পুষ্টির জন্য তার মাতৃ রক্তের উপর নির্ভরশীল হয়ে পড়ে। এরই মধ্যে ১৫-১৬ দিনের মাথায় আলাক বাচ্চাদানির দেয়ালে ঝুলন্ত দেহ বস্তুর মত ঝুলে থাকে। তাই আরবী আলাক শব্দের তিনটি অর্থ বিজ্ঞানসম্মতভাবে গ্রহণ করা হয়েছে। এক–জমাট রক্তপিণ্ড, দুই-জোঁক সদৃশ বস্তু এবং তিন-ঝুলন্ত দেহবস্তু।

৪। মুদগাহ বা সুমিটেস

আরবী শব্দ 'মুদগাহ' এর অর্থ মাংসপিণ্ড। এটাকে বিজ্ঞানে বলা হয় Somites., বাস্টোসিস্ট এর বাইরের স্তর ট্রফাবাস্ট নিঃসৃত এনজাইমের প্রভাবে প্রাচীর কলা (Tissue) বিগলিত লে বাস্টোসিস্ট নিমজ্জিত হয়। যার ফল Blastocyst সুমিটেস এ পরিণত হয়। কোরআনে যার নাম উল্লেখ করা হয়েছে মুদগাহ। এ প্রক্রিয়া অন্তত ২৩-৪২ দিন পর্যন্ত চলে। মুদগাহ অবস্থায় ভ্রূণকে প্রকৃতপক্ষে চর্বন বস্তুর মত (chewedlike substance) দেখায়। তখন ১৩টি খাঁজকাটা মাংসপিণ্ডের বক ভ্রূণের শিরদাঁড়ায় সাজানো থাকে যেগুলোকে বলা হয় 'মেসোডার্মাল সেগম্যান্ট (mesodermal segments)G

৫। ইযাম বা স্কেলেটন

ইজাম অর্থ অস্থি বা কঙ্কাল। বিজ্ঞানে এটাকে keleton বলা হয়েছে। এ পর্যায়ে প্রথমে যে অস্থিগুলো দেখা দেয় সেগুলো হচ্ছে উপরিভাগের কচি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ। প্রাথমিক ৬ সপ্তাহে কচি অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মেসেনচিম্যাল টিস্যুগুলো (mesenchymal tissue) কোমল অস্থিতে পরিণত হয়ে ভবিষ্যৎ অস্থিতা স্বচ্ছ মডেল গঠন করে। ৬ সপ্তাহের শেষের দিকে উপরের দিকের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ কঙ্কালের পূর্ণাঙ্গ কোমল মডেল প্রদর্শন করে। ১২ সপ্তাহের মধ্যে ভ্রূণের একটি

www.pathagar.com

ক্ষুদ্র পূর্ণাঙ্গ কঙ্কাল গঠিত হয়। মানব কঙ্কালে মোট ৩৬০টি জোড়া থাকে। এ স্তরে ৩৬০টি জোড়া সমৃদ্ধ কঙ্কাল তন্ত্র সম্পূর্ণ হতে ১২ সপ্তাহ সময় লাগে। মানব কঙ্কাল মোট ২০৬টি হাড়দ্বারা গঠিত।

৬। লাহম বা মাসলস

আরবী শব্দ -লাহম -অর্থ মাংসপেশী। এটাকে বিজ্ঞানে বালা হয় Muscles sage. ৭ম সপ্তাহ থেকে কঙ্কালতন্ত্র বিস্তার লাভ করে এবং অস্থিগুলো যথাযথ আকার ধারণ করে। ৮ম সপ্তাহ থেকে অস্থির চারপাশে পেশীগুলো আবৃত হতে থাকে। ৮ম সপ্তাহ শেষ হলে নির্দিষ্ট পেশীতন্ত্র, অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং মাথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এ সময় ভ্রূণটি নড়াচড়া করতে সক্ষম হয়।

৭। রূহ বা ফিটাস

রুহ এটা সর্বশেষ স্তর। এ স্তরে মানব শিশু পরিপূর্ণতা লাভ করে। আরবী 'খালকান আখরা' অর্থ অন্য আকার। গর্ভে থাকার পূর্ণ সময় পরে শিশু ভূমিষ্ট হয়

www.pathagar.com

আধুনিক বিজ্ঞান ও বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থে মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গ

ডারউইনের 'অন দি অরিজিন অব স্পেসিস' পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৮৫৯ সালে। শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে এসে এই পুস্তকে সন্নিবেশিত যুক্তিসমূহের পরীক্ষা-নিরীক্ষা শুরু হয়। দেখা যায় ডারউইন যে আমলে এই পুস্তকের মালমসলা সংগ্রহে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই আমলের গবেষকবৃন্দ প্রায় সবাই 'মানুষের আদি উৎসের' ব্যাপারে যতটা না গুরুত্ব দিতেন, তার চেয়ে অনেক বেশি গুরুত্ব আরোপ করতেন অন্যান্য জীব-জানোয়ারের আদি উৎসের উপর। বিশ্লেষণে আরো দেখা যায় ডারউইন নিজেও মানুষের বিবর্তনের বিষয়টা হালকাভাবেই গ্রহণ করেছিলেন। এমনকি তিনি তাঁর বিবর্তনবাদ-এর তত্ত্বকেও উপস্থাপিত করে গেছেন অনেকটা প্রস্তাবনা কিংবা সুপারিশের আকারে।

এদিকে, ডারউইনের এই মতবাদের সমর্থক ও অনুসারী গবেষকরা 'বিবর্তনবাদকে' উপস্থাপন করতে গিয়ে 'আংশিক সাদৃশ্যের ধারণাকে' তাঁদের কথিত 'বৈজ্ঞানিক তথ্যের' সবচেয়ে বড় 'যুক্তি' হিসেবে পেশ করতে শুরু করেন। অথচ, যে কোনো বিষয়ে অরোহনমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষেত্রে ততদিনে যুক্তিবিদ্যার সুশৃঙ্খল একটি ধারা গড়ে উঠেছিল। ডারউইনবাদীরা তাঁদের মতবাদ প্রতিষ্ঠায় 'যুক্তিবিদ্যার সেই বিজ্ঞানকে' গুরুত্ব প্রদানের তেমন কোনো গরজ অনুভব করেননি। ফলে, ডারউইনের তত্ত্বের ব্যাপারে তখন চারদিকে বিতর্কের এক ঝড় উঠেছিল। কিন্তু ডারউইনবাদীরা যুক্তিবিজ্ঞানের সেই বিতর্ক এড়িয়ে আবেগপ্রবণ ধারণাকে প্রাধান্য দিয়ে চলছিলেন।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানের উন্নতি, নব নব গবেষণা ও আবিষ্কার–প্রায় প্রতিদিনই নিত্যনতুন তথ্য ওদলিলের দ্বারা মানুষের জ্ঞান ভাণ্ডার সমৃদ্ধ করে চলছিল এবং ওইসব তথ্য ও দলিল ছিল বিজ্ঞানের গবেষণার ধারায় সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত। কিন্তু তারপর ডারউইনবাদীরা বোধগম্য কারণেই ওইসব সুপ্রতিষ্ঠিত তথ্য-প্রমাণ ও দলিল এড়িয়ে চলতেন। এড়িয়ে না গিয়ে তাঁদের উপায়ও ছিল না। কেননা, ওইসব তথ্য প্রমাণ স্বীকার করে নিলে তাদের 'মতবাদ' যে মাঠে মারা পড়ে। তবে, এইসব ডারউনবাদী বিজ্ঞানের নামে শুধু যে বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত তথ্য ও প্রমাণকেই এড়িয়ে গেছেন– তাই নয়, যুক্তি

www.pathagar.com

বিজ্ঞানের ধারা ও গবেষণালব্ধ তথ্য ও প্রমাণ এড়িয়ে তথাকথিত 'নেচারাল সিলেকশন' বা 'প্রকৃতির নির্বাচন' এর নিছক একটি ধারণাকে ডারউইনের মতবাদের নামে প্রায়শ বড় করে তুলে ধরে সেটাকেই বিজ্ঞানের সত্য বলে প্রচার করার জন্য কোমর বেঁধে তারা মাঠে নেমে পড়েছিলেন।

মূলত, মানুষের দ্বারা পরিচালিত 'ক্রস-ব্রিডিং' বা 'কৃত্রিম প্রজননের' বাইরে এই 'নেচারারাল সিলেকশন' এর তেমন কোন বিজ্ঞানভিত্তিক বা ঐতিহাসিক প্রমাণ থাকার প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু তবুও নিজেদের 'মতবাদ' কে সত্য হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার স্বার্থে– বিজ্ঞানের নাম বিজ্ঞানকেই তারা বর্জন করতে দ্বিধা করেননি ফলে, তারা বুঝতে পারেননি বা বুঝেও বুঝতে চাননি যে, মানুষের দ্বারা পরিচালিত 'কৃত্রিম প্রজনন' তথা 'নির্বাচনের' ধারাটি একটি সম্পূর্ণআলাদা ব্যাপার। কেননা, কৃত্রিম প্রজননের ব্যাপারটা হচ্ছে কোন একটা প্রাণি-প্রজাতির মাত্র কিছু সংখ্যক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের উন্নয়নের ব্যাপার এবং তা কোনক্রমেই সংশিষ্ট সেই প্রাণীর গঠন-কাঠামোর আমূল পরিবর্তন কিংবা সংশ্লিষ্ট প্রজাতির ভিন্ন কোন প্রজাতিতে রূপান্তরিত হওয়ার ব্যাপার নয়।

প্রকৃতপক্ষে, ডারউইনবাদীরা 'কৃত্রিম প্রজনন'-এর সুবাদে 'ন্যাচারাল সিলেকশনের' নামে সম্পূর্ণ ভুলভাবে আরোপিত ডারউইনের পূর্বোক্ত ধারণাভিত্তিক মতবাদকে বাড়াতে বাড়াতে আকাশে উঠিয়েছিলেন। এদিকে সেই মতবাদকে আকাশে তুলবার কজে তাদের সম্বল ছিল কিছু বাগাড়ম্বর কিছু ইচ্ছা প্রণোদিত ভাবনা-চিন্তা। সেক্ষেত্রে বিজ্ঞান তো নয়ই, এমনকি কোন যুক্তি বিজ্ঞানের ধারও তাঁরা ধারতে চাননি। এভাবেই তাঁরা কাল্পনিক একটি মতবাদের প্রতিষ্ঠার সপক্ষে কোমর বেঁধে মাঠে নেমেছিলেন : এবারও ভেবে দেখেননি, তাঁদের সেই মতবাদের ভিত্তি হলো এমন সব কল্পনাপ্রসূত ক্ষীণ-সূত্র ও এমন সব তথ্য-উপাত্ত– যাদের আদৌ কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই।

বিষয়টা আধুনিক যুগে এসে আরো বেশি স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হচ্ছে। কারণ, আধুনিক যুগে এসে মানুষের বিজ্ঞান-গবেষণার তহবিল হয়েছে অনেক বেশি সমৃদ্ধ। তাই এ বিষয়ে যে কোন আলোচনা ও পর্যালোচনার এখন অনায়াসেই দুটিই পর্যায়ে চালানো যায়।

১। এতদসংক্রান্ত যাবতীয় বক্তব্য এমন সব তথ্য-প্রমাণের আলোকে বিচার বিশে-ষণ করে দেখা যায়–যে সব তথ্য প্রমাণ প্রয়োগ প্রযুক্তির ধারায় সুপ্রতিষ্ঠিত।

২। ডারউইনের নামে কথিত গোটা মতবাদটা আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে নতুনভাবে বিশেষণ করে দেখা যেতে পারে।

এই দ্বিবিধ বিচার পর্যালোচনার প্রয়োজন এ কারণে বেশি যে, প্রচারসর্বস্ব এই মতবাদটির (ডারউইনবাদ) মধ্যে আদৌ কোন সত্য যদি থেকে থাকে, তা বের করে নিয়ে আসা।

www.pathagar.com

যে কোন মতবাদকে কিংবা যে কোনো মতবাদের কোন কিছুকে সত্য হিসেবে টিকে থাকতে হলে তাকে অবশ্যই আধুনিক যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নাগালের মধ্যে প্রাপ্ত দলিল ও প্রয়োগ-প্রমাণের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠা পেতে হবে; টেকসই হতে হবে। এই বিচারে, যে মতবাদ বাস্তব প্রয়োগের ধারায় টিকতে পারবে না– তা সঠিক হওয়া তো দূরের কথা, আদৌ কোন 'মতবাদ' হিসেবেও গণ্য করা যাবে না। এ ক্ষেত্রে সে মতবাদ প্রচারে জোরে কতটা কাল টিকে ছিল– তা যেমন ধর্তব্যের বিষয় হতে পারে না; তেমনি সে মতবাদ সম্পর্কে কার কি অভিমত– তাও কোন গুরুত্ব বহন করে না।

ইতিপূর্বে বিচার-পর্যালোচনায় দেখা গেছে ডারউইন-তত্ত্বের যারা প্রবক্তা তাঁদের মধ্যে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞান ও গবেষণার ধারায় প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সত্যকে এড়িয়ে চলার প্রবণতা যথেষ্ট। এক্ষেত্রে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দ্বারা প্রমাণিত ও বিজ্ঞান-গবেষণায় সুপ্রতিষ্ঠিত সত্য বলতে আধুনিক জীবাশ্ম-বিজ্ঞানের সেই সব সত্যকেই বুঝানো হচ্ছে– যে সব সত্য বিভিন্ন ফসিল (ভূস্তরের মধ্যে প্রস্তরীভূত কংকাল), জৈবশিলা ও জীবাশ্ম-পরীক্ষার দ্বারা সুপ্রমাণিত ও সুপ্রতিষ্ঠিত।

নিছক অনুমানের ভিত্তিতে গড়ে তোলা কোন ধারণাকে অতীতে কিভাবে বিজ্ঞানের নামে চালিয়ে দেয়া হয়েছে, তা নিয়ে আলোচনা করা যাক : দেখা গেছে, অতীতে কোন এক স্থানে প্রাপ্ত কোন একটা মাথার খুলি কিংবা কংকালের বিচ্ছিন্নভাবে প্রাপ্ত এখানকার কিছু অঙ্গ আর ওখানকার কিছু প্রত্যঙ্গ নিয়ে প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষের মডেল বা নমুনা তৈরি করা হতো এবং তাকেই 'বিজ্ঞানের যুগান্তকারী আবিষ্কার' বলে ঢাক পেটানো হতো। সেকালে এ যুগের মতো জীবাশ্ম-বিজ্ঞান এতোটা উন্নত ছিল না। তাছাড়া, এ যুগেও যাঁরা এই বিজ্ঞান সম্পর্কে সম্যক অবহিত নন, অতীত যুগের 'মডেলের' ভেলকি দেখিয়ে এখনো তাঁদের বিভ্রান্ত করা তেমন কঠিন কাজ নয়।

ডারউইন-তত্ত্ব নিয়ে আগাগোড়া প্রচারণার এই ভেলকিই দেখা গেছে। এমনকি একান্ত আধুনিক যুগে এসেও দেখা যাচ্ছে, ডারউইনবাদীরা কথার ফুলঝুরি ছড়িয়ে বাজিমাত করতে যতটা ওস্তাদ, বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত ও গবেষণার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্ত তুলে ধরে নিজেদের মতবাদের প্রয়োগ-প্রমাণ পেশ করতে ঠিক ততোটাই অপারগ। মূলত, এই ডারউইনতত্ত্ব প্রস্তাবে প্রয়োগ করে হাতে-কলমে তার প্রমাণ পেশ করাটা আদৌ যে অসম্ভব, এখন নিরেট সত্য হয়ে তা দেখা দিয়েছে। এ বিষয়ে আর একটি কথা এই যে, ডারউইনতত্ত্বের গবেষকবৃন্দ প্রায়শ আদি যুগের অতীত জগতে সংঘটিত ঘটনার রেশ ধরে ঘটনার পরম্পরা সাজাতে ভালবাসেন। অথচ, বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে দেখলে দেখা যাবে, গোটা বিশ্বের অতীত ইতিহাসের গোটা সময়কে যদি চব্বিশ ঘণ্টার

www.pathagar.com

প্রতীক হিসেবে ধরা হয়, তাহলে পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময়কাল দাঁড়াবে ওই চব্বিশ ঘন্টার শেষ মিনিটের সর্বশেষ মুহূর্ত।

এখন জীবজগতের ক্ষেত্রে এ 'বিবর্তনবাদের' যে কথা বলা হচ্ছে, বাস্তবে সেই 'বিবর্তনের' মূল ঘটনাটির সমাপ্তি ঘটেছিল আরো কয়েক কোটি বছর আগে। পক্ষান্তরে, মাত্র কয়েক লাখ বছর হল, মানব প্রজাতির মধ্যে সর্বশেষ গুরুত্বপূর্ণ রূপান্তরের কাজটি সম্পূর্ণ হয়েছে। এই লাখ ও কোটি বছরের হিসেব যদিও তা সময়ের হিসেবমাত্র। কিন্তু আলোচ্য গবেষণা-বিশ্লেষণে সময়ের এই হিসেবটির গুরুত্ব সর্বাধিক।

প্রকৃতপক্ষে জীবজগতের বিবর্তনের ক্ষেত্রে ঘটনার পর ঘটনা ঘটে গেছে; জীবজগতের বিভিন্ন প্রজাতির গঠন-কাঠামো ক্রমান্বয়ে জটিল থেকে জটিলতর হয়েছে; এবং সেই বিবর্তন, পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধারাটি একসময় পূর্ণ পরিণতি লাভ করেছে স্থবির হয়ে পড়েছে। এই যে বক্তব্য, এ বক্তব্যে মোটেও ধারণাপ্রসূত কোন বক্তব্য নয়, বরং জীবাশ্ম-বিজ্ঞান, জীববিজ্ঞান ও ভ্রূণতত্ত্বের সর্বাধুনিক গবেষণা, আবিষ্কার, উদ্ভাবন ও বিশ্লেষণের ফলাফল এবং সিদ্ধান্ত। বলাই বাহুল্য যে, বিজ্ঞানের এই ফলাফলজনিত সিদ্ধান্তের সঙ্গে উপরোলিখিত সময়ের হিসেবের সম্পর্ক ও গুরুত্ব সমধিক।

এদিকে, এতদসংক্রান্ত গবেষণা, আবিষ্কার, পরীক্ষা-নিরীক্ষা ও বিশেষণ এতো বেশি ব্যাপক, বিস্তৃত ও পাণ্ডিত্যপূর্ণ যে, সে-সব সম্পূর্ণভাবে সংগ্রহ করা, অধ্যয়ন ও চর্চা করা এবং সেই অনুশীলন থেকে সুনির্ধারিত সিদ্ধান্তে পৌছানো খুবই দুরূহ। তাছাড়া ওইসব বিজ্ঞানের সমূহ জ্ঞান আত্মস্থ করেছেন, এমন নিবেদিতপ্রাণ ব্যক্তির সংখ্যাও খুব বেশি নয়। অথচ ডারউইনের বিবর্তনবাদকে যাঁরা প্রতিষ্ঠিত করতে চান, তাঁদের প্রায় সকল গবেষককেই একান্ত চালাকির সাথে উপরোলিখিত বিভিন্ন বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও গবেষণার ফলাফল ও সিদ্ধান্ত কে সযত্নে এড়িয়ে চলতে দেখা যায়।

যাহোক, ইতিপূর্বে আমরা মলিক্যুলার বায়োলজি ও জেনেটিকস গবেষণার প্রাপ্ত-সিদ্ধান্ত নিয়ে বিশদ আলোচনা করেছি। বিশেষত, 'সেলুলার লাইফের অর্গানাইজেশন' সম্পর্কে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা-নিরীক্ষায় যে তথ্য-উপাত্ত বেরিয়ে এসেছে, তার উপরেও আমরা সাধ্যমতো আলোকপাত করেছি। বিজ্ঞান গবেষণার সেই নবতর আলোকে স্পষ্টভাবে ফুটে উঠেছে যে, কিভাবে এক কোষী জীবকোষ থেকে একটি পরিপূর্ণ মানুষ পরিগঠিত হয়েছে।

মানব-পরিগঠনের ধারাবাহিকতায় দেখা যায়, ডারউইনের তথাতথি 'বিবর্তনবাদ' থেকে সম্পূর্ণ আলাদা, সম্পূর্ণ ভিন্ন একটা 'বিবর্তন, পরিবর্তন ও রূপান্তরের ধারা' অব্যাহত রয়েছে। এটাকেই বলা হচ্ছে, 'সৃষ্টিশীল বিবর্তন' বা 'ক্রিয়েটিভ ইভ্যুলিউশন'। বলা অত্যাবশ্যক যে, শুধু 'সৃষ্টিশীল এই বিবর্তনের'

www.pathagar.com

ধারাতেই মানুষের এই পরিগঠন তথা তার বিবর্তন, পরিবর্তন ও রূপান্তরের এমন একটা সুষ্ঠু ও বাস্তবসম্মত ব্যাখ্যা পাওয়া যাবে, যা জীবাশ্ম-বিজ্ঞানসম্মত এবং মানব-সৃষ্টির ধারা ও প্রক্রিয়া পদ্ধতির সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পক্ষান্তরে, ডারউইনের তথাকথিত বিবর্তনবাদের ক্ষেত্রে দেখা যায়, এই বিবর্তনবাদের নামে বিজ্ঞানের দোহাই দিয়ে যা কিছু বলা হয়েছে, তথ্য-উপাত্তের নামে যা কিছু তুলে ধরার প্রয়াস চলেছে, তাতে আগাগোড়া ফাঁক, ফাঁকি ও গোঁজামিল বিদ্যমান। সবচেয়ে বড় কথা হলো, ডারউইনের বিবর্তনবাদের মধ্যকার ওইসব ফাঁক ও ফাঁকি পূরণ করার মতো প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণর অভাব যেমন প্রকট; তেমনি সেই গোঁজামিলেও সঙ্গত কোন ব্যাখ্যা পাওয়া কঠিন। ফলে, বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতেও ডারউইনতত্ত্ব বিজ্ঞানের বিচারে 'থিওরি' হিসেবে দাঁড়াতে পারা তো দূরের কথা, টিকতেও পারছে না। এর জাজ্বল্যমান প্রমাণ হচ্ছে, 'থিওরি অব চান্স' এর মতো ভিত্তিহীন মতবাদ' এবং 'থিওরি অব নেসেসিটি'র মতো অসার তত্ত্ব।

একইভাবে ডারউইন থিওরির সমর্থনে একের পর এক যে-সব তথ্য দাঁড় করার চেষ্টা চলছে, তাতে এক ধরনের 'গবেষণা-ভঙ্গির' যতটা প্রতিফলন লক্ষণীয়, বাস্তব গবেষণাজাত কোন সিদ্ধান্তের প্রয়োগসম্মত কোন ধারা তাতে ততোটাই অনুপস্থিত! সবচেয়ে বড় কথা, ডারউইনতত্ত্বের ধারার কোন কোন গবেষক ও যাবত তাঁদের তথাকথিত 'বিবর্তনবাদের' একটা সংজ্ঞা বা ধারণা গড়ে তোলার প্রয়াস পেয়েছেন বটে, কিন্তু তা মূল বিষয়ের সঙ্গে আদৌ সঙ্গতিপূর্ণ নয়। অন্য কথায়, 'মানুষের আদি উৎস' সম্পর্কে ওইসব গবেষকের গবেষণা ডারইউনতত্ত্বের সারবত্তা প্রমাণে সম্পূর্ণরূপে ব্যর্থ হয়েছে।

আর একটা কথা, কোন কোন ডারউইনবাদী গবেষক-বিজ্ঞানী প্রায়শ এই মর্মে দাবি উত্থাপন করেন যে, সাইকোলজি বা মনোবিজ্ঞান প্রদত্ত তথ্য-উপাত্তের সহায়তায় তাঁরা মানুষ ও জীবজগতের মধ্যে অভিন্ন উপাদান খুঁজে পেয়েছেন। কিন্তু, তাঁদের এই দাবি ধোঁপে টিকতে পারে না। কারণ, মনোবিজ্ঞান আদৌ বস্তুগত বা প্রয়োগসম্মত কোন বিজ্ঞান নয়। তাছাড়া, মনোবিজ্ঞানের তথ্য স্বততই পরিবর্তনশীল। সুতরাং, যে বিজ্ঞান সত্যিকার বিচারে আদৌ কোন বিজ্ঞান নয়, সেই মনোবিজ্ঞানের সততা পরিবর্তনশীল তথ্য-উপাত্তের ভিত্তিতে ডারউইনবিদরা যে কিভাবে ঘটনা পরম্পরা টেনে 'শারীরিক গঠন-কাঠামোর-সম্পর্ক' বিশেষত 'বায়োলজিক্যাল কিনস শীপ' (অর্থাৎ বানরের সঙ্গে মানুষের দৈহিক আত্মীয়তার সম্পর্ক) সূত্র পেয়েছেন বলে গলাবাজি করতে পারেন, তা বোধগম্য নয়। শুধু সাধারণ মানুষকে নয়, বিজ্ঞানী মহলকেও বিভ্রান্ত বা কনফিউজড করার জন্য এ ধরনের গলাবাজিপূর্ণ বক্তব্য, সংজ্ঞা বা ধারণা যথেষ্ট।

www.pathagar.com

এ ব্যাপারে আরেকটা সমস্যা হলো, বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ এবং সে-সব ধর্মগ্রন্থের বাণী ও বচন। অনেক সময়ই নানামহল থেকে ধর্মগ্রন্থের নামে নানাবাণী ও বচন প্রচার করা হয়। কখনো বলা হয়, এসব বাণী বাইবেলের, কখনো বলা হয় কোরআন কিংবা হাদীসে এই বক্তব্য রয়েছে। অথচ, ভালভাবে খোঁজখবর করলে দেখা যাবে, ওইসব বাণী ও বক্তব্য আদৌ কোন ধর্মগ্রন্থের বাণী ও বক্তব্য নয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ 'নারীর সৃষ্টি হয়েছে পুরুষের পাঁজরার হাড় থেকে'– এই বাণীকে কোরআন/হাদীসের বাণী বলে প্রচার করা হয়ে থাকে। অথচ, এই বাণী আদৌ কোরআনের বাণী নয়; এমনকি হাদীসের বাণীও নয়!

আবার কখনো কখনো কোন কোন মহল থেকে দাবি করা হয় যে, ধর্মগ্রন্থের সব বাণীই ইতিমধ্যে বিজ্ঞানের গবেষণা ও পরীক্ষা-নিরীক্ষায় সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে। কিংবা, ধর্মগ্রন্থের সব বাণীই বিজ্ঞানের বিচারে সত্য। এ ধরনের দাবি উত্থাপনের দ্বারা ধর্মগ্রন্থের অলৌকিকত্বকেই যে অস্বীকার করা হয়, তা কিন্তু ওইসব দাবি উত্থাপনকারী ঘুণাক্ষরেও বুঝতে চান না! এভাবে ধর্মগ্রন্থের সব কিছুই বিজ্ঞানের পরীক্ষা-নিরীক্ষায় প্রমাণ করা সম্ভব হলে কোন ধর্মগ্রন্থ যে আর আসমানী কিতাব বা ঐশীগ্রন্থ থাকে না– সে কথা কে তাঁদের বুঝাবে? অন্যদিকে ধর্মগ্রন্থ সম্পর্কে আর একটি অসুবিধা প্রায়শ সমস্যার আকারে দেখা দেয়– তা হলো, সংশিষ্ট ধর্মগ্রন্থের অনুবাদ।

সৌভাগ্যই বলতে হবে, বাইবেলের ব্যাপারে সর্বজনগ্রহণযোগ্য এবং সকলের আস্থা স্থাপনের মতো অনুবাদ আমাদের নাগালের মধ্যে রয়েছে। ফরাসী ভাষায় 'ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন' এবং ইংরেজিতে 'রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন' ছাড়াও জেরুজালেম বাইবেল স্কুল প্রকাশিত বাইবেলের কতিপয় অনুবাদ গ্রন্থের কথা এখানে উল্লেখ করা যায়।

বাংলা ভাষায় 'বাংলাদেশ বাইবেল সোসাইটি' প্রকাশিত 'পবিত্র বাইবেল নতুন ও পুরাতন নিয়ম' এবং 'বিবিএস'প্রকাশিত 'বাংলা ইঞ্জিল শরীফ' এর কথাও এ প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে।

কোরআনের বাপারে কিন্তু এ কথা বলা চলে না। অথচ কোরআন বুঝতে হলে ভিন্ন ভাষাভাষী মাত্রকেই অনুবাদের উপর নির্ভর করতেই হয়। বিশ্বব্যাপী শতাধিক কোটি মুসলমানের ছ'ভাগের মধ্যে পাঁচ ভাগেরই ভাষা আরবী নয়। অথচ অন্য কোন ভাষায়ই কোরআনের এরকম সর্বজনগ্রহণযোগ্য বা ধর্মীয় দিক থেকে 'প্রামাণিক' অনুবাদ অনুপস্থিত।

এদিকে কোরআনের যে-সব বাণী ও বক্তব্যের ক্ষেত্রে এই সত্য বড় হয়ে ধরা পড়ে। তাছাড়া, ঐতিহ্যগতভাবে আধুনিক অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারবৃন্দ এখনও প্রাচীনকালের অনুবাদক ও ব্যাখ্যাকারীদের বক্তব্যের আলোকেই কোরআনের অনুবাদ ও তফসীর করে থাকেন। প্রাচীনকালের অনুবাদ ও তফসীরকারগণের

www.pathagar.com

জ্ঞান, মনীষা ও বুদ্ধিমত্তার প্রতি পরিপূর্ণ শ্রদ্ধা রেখেই বলতে হয়, সে যুগে বসে তাঁদের পক্ষে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত, গবেষণা ও নিরীক্ষার ফলাফল সম্পর্কে অবগত হওয়া ও অবহিত থাকা আদৌ সম্ভব ছিল না। আর এই ধরনের প্রাচীনধারার অনুবাদও ব্যাখ্যার কারণে কোরআনের বক্তব্য সম্পর্কে ভুল বুঝাবুঝির অবকাশ সবচেয়ে বেশি।

এই প্রসঙ্গে পাঠক-পাঠিকাদের সদয় দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলতে হচ্ছে, এই একই কারণে এই পুস্তকে ব্যবহৃত কোরআনের বিভিন্ন বাণী ও বক্তব্যের অনুবাদ প্রচলিত অনুবাদ থেকে কিছুটা অন্যরকম মনে হতে পারে। কোরআনের প্রচলিত অনুবাদ ও তফসীরগ্রন্থগুলোতে বিজ্ঞান-বিষয়ক বাণী ও বক্তব্যের ভুল ও বিভ্রান্তিকর অনুবাদ ও ব্যাখ্যা সযত্নে এড়িয়ে চলার প্রয়াস চালানো হয়েছে। এই কারণে সে-সব অনুবাদের সঙ্গে বর্তমান পুস্তকে উদ্ধৃত কোরআনের বিভিন্ন আয়াতের অনুবাদ কোন ক্ষেত্রে কিছুটা আলাদা মনে হওয়া বিচিত্র কিছু নয়।

তথ্য সূত্র : ডঃ মসি বুকাইলী

www.pathagar.com

মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে : ধর্মগ্রন্থ বাইবেল

বাইবেলের পুরাতন নিয়মে বিশ্বসৃষ্টি সংক্রান্ত বর্ণনা করা রয়েছে। এই বাইবেল (পুরাতন ও নতুন নিয়ম : তাওরাত, জবুর ও ইঞ্জিল একত্রে) হচ্ছে, একত্ববাদী ধর্মের কোন প্রচলিত ধর্মগ্রন্থ এবং এই ধর্মগ্রন্থেই প্রথম মানব সৃষ্টি সম্পর্কে বর্ণনা দেখা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য সম্পর্কে বর্ণনা দেখা যায়। আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগ শুরু হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত পাশ্চাত্য জগৎ মানুষের আদি উৎস সম্পর্কিত যাবতীয় প্রশ্নের জবাব খুঁজেছে এই বাইবেলেই। পক্ষান্তরে, আধুনিক বৈজ্ঞানিক যুগের সূচনা থেকে বাস্তব তথ্য ও সত্যের ব্যাপারটাই মানুষের নিকট বড় হয়ে ধরা দিয়েছে। তাছাড়াও আধুনিক বিশ্বে ছড়িয়ে রয়েছে এতদসংক্রান্ত দার্শনিক ও অন্যবিধ আলোচনা– যা বাইবেলের শিক্ষা থেকে ভিন্ন। বহু শতাব্দী যাবত এই ধারণা পোষণ করে আসা হচ্ছে যে, বাইবেলে যা কিছু রয়েছে সেগুলো বিধাতার বাণী: এসব বাণী স্বয়ং বিধাতার নিকট থেকেই অবতীর্ণ। সুতরাং, বাইবেলের বাণী সম্পর্কে কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না এবং বাইবেলের কোন বক্তব্য সম্পর্কে বিতর্কের কোন অবকাশও থাকতে পারে না।

কিন্তু আজকের এই যুগেও আমরা যদি অতীতের ওই ধারণাই পোষণ করি, তবে অবস্থাটা কি দাঁড়ায়? দেখা যাবে, মানব সৃষ্টি সম্পর্কে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের তথ্য-উপাত্ত ও সিদ্ধান্তের সঙ্গে বাইবেলের বক্তব্যের বিরোধ অনিবার্য হয়ে দেখা দিচ্ছে। বিশেষত, বাইবেলের পুরাতন নিয়মের (তাওরাত) 'আদিপুস্তকে' মানব সৃষ্টি সম্পর্কে যে বক্তব্য রয়েছে তার সঙ্গে আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রতিষ্ঠিত ও প্রমাণিত সত্যের বিরোধ হয়ে পড়েছে অনতিক্রম্য।

বস্তুত, এখনো যাঁরা সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বাইবেলের সেই ধ্রুপদী বক্তব্যকে সত্য হিসেবে মানতে চান, তাঁদের পক্ষে বিবর্তনবাদকে (ডারউইনের বিবর্তনবাদ নয়, বরং যে বিবর্তনবাদ আধুনিক বিজ্ঞানের দ্বারা প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত) স্বীকার করা অসম্ভব। পরন্তু, মানব সৃষ্টি সম্পর্কিত বিবর্তনবাদের যে কোন ধারা তাঁদের যে রুষ্ট ও ক্ষুব্ধ করবে, এটাই স্বাভাবিক। তাছাড়াও, যেহেতু তাঁরা বাইবেলে পাচ্ছেন যে, অপরাপর জন্তু-জানোয়ার একটি নির্ধারিত গঠন-

www.pathagar.com

কাঠামোসহ সৃষ্টি হয়েছে, সেহেতু বিবর্তনবাদের মাধ্যমে ওইসব জীবজন্তুর উদ্ভব ঘটার বিষয়টাও তাঁদের পক্ষে স্বীকার করা অসম্ভব।

অবশ্য, বাইবেলের বক্তব্যের সঙ্গে সেক্যুলার জ্ঞান-বিজ্ঞানের প্রমাণিত ও প্রতিষ্ঠিত তথ্যের তুলনামূলক বিচার-বিশেষণ শুরু হয়েছে মাত্র কিছুদিন আগে। আর সেই বিচার-বিশ্লেষণের দরুন আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আবিষ্কৃত ও প্রতিষ্ঠিত সত্য বাইবেলভিত্তিক ধর্মীয়-বিশ্বাসের পরিপন্থী, সেই বিষয়টাস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে খুব বেশিদিন আগে নয়। কারণ, অবশ্যই একটিই। অতীতে এই ধরনের তুলনামূলক বিচার-বিশ্লেষণের সাহস বড়-একটা কেউ পেতেন না। কেননা, এ ধরনের বিচার বিশ্লেষণে বাইবেলের বক্তব্য প্রায়শই অসত্য বলে সাব্যস্ত হয়ে পড়তো। ফলে, দেখা দিতো নানা ধরনের কেলেঙ্কারি। এমনকি ইদানীংকালেও অনেক আধুনিক শিক্ষিত খ্রিস্টানকে হামেশা এ ধরনের কেলেঙ্কারির সম্মুখীন হতে এবং তার ফলে বিব্রতকর অবস্থায় পড়তে হয়। একটা উদাহরণ দিলে ব্যাপারটা পরিষ্কারভাবে ধরা পড়বে এবং মাত্র একটা বিষয়ের উল্লেখ থেকেই প্রমাণিত হবে যে, আধুনিক শিক্ষিত মানুষের এতদসংক্রান্ত অস্বস্তিকর অবস্থাটা কি রকম করুণ।

মানুষের এক-একটা প্রজন্ম-পুরুষের গড় আয়ুর হিসেব পঁচিশ বছর। এই হিসেবে একটা শতাব্দী গত হতে প্রয়োজন পড়ে কম বেশি চার পুরুষের। বংশ পরম্পরায় মানুষের এক পুরুষের এই যে গড় আয়ুর হিসাব, এটা সাবস্ত হয়েছে শত শত বছর যাবত মানুষের পুরুষানুক্রমিক বংশধারার হিসেবের ছক থেকেই। ধরে নেয়া যাক, অস্ট্রালোপিথেকাস মানুষই মানবজাতির আদি পুরুষের প্রতিনিধি। এই অস্টালোপিথেকাস মানুষের আবির্ভাব ঘটেছিল মোটামুটিভাবে ৫০ লাখ বছর পূর্বে। এবং কম করে হলেও এখন থেকে ২০ লাখ বছর আগে এই জাতীয় মানুষের বিলুপ্তি ঘটেছিল।

এই হিসেবের থেকে অবশ্যই এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, সেই আদিতম পুরুষ থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত পৌঁছতে মানব জাতির ৮০,০০০ থেকে ২,০০,০০০ পুরুষ লেগেছে যদিও বাস্তবে এই সংখ্যাটি বেশিও হতে পারে। এই অবস্থায় কেউ যখন বাইবেলের নতুন নিয়মের (ইঞ্জিল শরীফ) লুক লিখিত সুসমাচারে (৩,২৩-২৮) উল্লেখিত বংশলতিকার দিকে দৃষ্টিপাত করবেন, তখন সেখানে দেখতে পাবেন, আদম থেকে শুরু করে যীশু খ্রিস্টের ব্যবধান মত্র ছিয়াত্তর পুরুষের! এটা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসযোগ্য।

এই যে একটা বিরাট প্রশ্ন, এর জবাবে অবশ্য একেকজনের নিকট একেকরকম হতে পারে। যদিও এক জবাবের সঙ্গে আরেক জবাবের মিল থাকবে, এখন জবাবগুলো খুঁজে দেখা যাক। সাধারণ অবস্থায় অনেকেই লুক-লিখিত সুসমাচারের এই বক্তব্য এড়িয়ে যেতে চাইবেন। আবার অনেকেই এর জবাবে

www.pathagar.com

বলতে চাইবেন যে, মূল বাইবেল থেকে অনুবাদের সময় খুব সম্ভব কোন বিভ্রান্তি ঘটে থাকবে। যেমন, যেখানে 'অমুকের ছেলে অমুক' বলা আছে, সেখানে একজন অপরজনের সরাসরি পুত্র নাও হতে পারেন। শুধু বংশধারার সঙ্গতি রক্ষার জন্যই বিষয়টা এভাবে এই বংশলতিকায় উপস্থাপন করা হয়েছে। ...এদিকে, এমন কিছু ভাষ্যকার আছেন, যাঁদের অভিমত, যে অবস্থায় এসব সুসমাচার লিখিত হয়েছিল এবং এ সম্পর্কে লুক-এর হাতে যে সব অসম্পূর্ণ সূত্র ছিল, তাতে বাইবেলের নতুন নিয়মের (ইঞ্জিল শরীফ) এই অধ্যায়ের বক্তব্যকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ না করলেও চলে। অবশ্য, সুসমাচারসমূহের অপরাপর অধ্যায়ের বক্তব্যসমূহ ঠিক রয়েছে।...

বাইবেল রচনার যে ইতিহাস এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা গেছে, তার আলোকে এই ব্যাখ্যাটাকে বাস্তবতার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষার একটি প্রয়াস বলে মেনে নেয়া যেতে পারে। এছাড়া, যিনি যাই বলুন তাতে এ সমস্যার কোন সমাধান মিলবে না বরং তা অযৌক্তিক বলেই গণ্য হবে। শুধু তাই নয়, যাঁরা ভিন্ন সেই ব্যাখ্যাকে অযৌক্তিক বলে মানতে চাইবেন না, তাঁদের বক্তব্য শেষ পর্যন্ত গোটা বাইবেলের সমগ্র ধারা সম্পর্কে সন্দেহ জাগাবেই।

বাইবেলের এমন সব বক্তব্য ও অধ্যায় যে-সব বক্তব্য ও অধ্যায় বিশ শতকের এই পর্যায়ে এসে কোনক্রমেই মেনে নেয়া অসম্ভব। কারণ, ওইসব বক্তব্য ভুল প্রমাণিত হয়েছে বহু আগেই। ওইসব অধ্যায় এবং বক্তব্য চিহ্নিত করার অর্থ এই যে, বাইবেলের সুসমাচারসমূহের সারবত্তা অস্বীকারযোগ্য। বরং, সেই বাস্তব অবস্থার দিকেই অঙ্গুলি নির্দেশ করা হচ্ছে, যে-অবস্থার ফেরে পড়ে তখন বাইবেল-লেখকদের এ ধরনের ভুল তথ্য তাঁদের রচনায় সন্নিবেশিত করতে হয়েছিল। এই চিহ্নিতকরণের দ্বারা বরং 'বাইবেল' নামে পরিচিত ধর্মগ্রন্থটির কল্যাণ সাধনই করতে চেষ্টা চালানো হচ্ছে। বাইবেলের ওইসব ত্রুটিপূর্ণ ধারণার দ্বারাই প্রমাণিত হয়, যীশুখ্রিস্ট বা নবী ঈসা (আঃ) ছিলেন বরহক এবং তাঁর অস্তিত্ব ও মিশন ছিল সত্য ও সঠিক। যেমন, যাঁরা হযরত ঈসা (আঃ) বা যীশু থেকে হযরত আদম (আঃ) পর্যন্ত বংশাবলিপত্র রচনা করেছিলেন, মাধ্যম হিসেবে তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন যীশুখ্রিস্টের পিতা যোসেফকে। অথচ, এটি ছিল সম্পূর্ণত ভুল। কেননা, হযরত ঈসার (আঃ) দুনিয়ায় আগমনের ব্যাপারে যোসেফের কোনই ভূমিকা ছিল না। কেননা, হযরত ঈসা (আঃ) জন্মগ্রহণ করেছিলেন পিতা-ব্যতিরেকেই। এই অবস্থায় লুকের সুসমাচারে যোসেফের একট কল্পিত বংশলতিকা পাওয়া যায়, যীশুর নয়। পক্ষান্তরে, যীশুর সঠিক বংশাবলিপত্রের জন্য আমাদের যা প্রয়োজন, তা যোসেফের নয়, বরং যীশুর মাতা মেরী বা বিবি মরিয়মের বংশলতিকা।

পূর্বোলিখিত উদাহরণ প্রমাণ করে, বাইবেলের বিভিন্ন বক্তব্যের সঠিক ব্যাখ্যার

www.pathagar.com

নাম করে বা পাঠকদের সামনে তুলে ধরা হয় তা কতটা অযৌক্তিক। এর দ্বারা এও প্রমাণিত হয়, বাইবেলকে বুঝতে হলে আদিযুগে বাইবেল কিভাবে রচিত হয়েছিল সে সম্পর্কে বিশদ-জ্ঞান অত্যাবশক। সেই জ্ঞান এবং সেই ইতিহাসের সম্যক ধারণা আরো একটি বিষয় বুঝবার জন্য প্রয়োজনীয়। তাহল, এতদিন পর্যন্ত এমন কি একান্ত হাল আমলে এসেও যে ভাবে, যে নিয়মে এবং যে ধারণা নিয়ে বাইরে পাঠ করে আসা হচ্ছিল, তা থেকে আমাদের এই বাইবেল-চর্চা ও বিশ্লেষণ কেন ভিন্নতর, কেন অন্যরকম– তা উপলব্ধি করা। মূলত, বাইবেল রচনার আদি ইতিহাস সম্পর্কে সঠিক তথ্য না-জানা থাকলে বাইবেলের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের সঠিক ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আদৌ সম্ভব নয়। একইসঙ্গে ওইসব ব্যাখ্যা ও বিশেষণ থেকে যে সিদ্ধান্ত বেরিয়ে আসতে পারে, সেই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা এবং তা থেকে সঠিক শিক্ষা লাভ করাও অসম্ভব হয়ে দাঁড়ায়।

www.pathagar.com

মানব সৃষ্টি প্রসঙ্গে : ঐশী গ্রন্থ তাওরাত ও জবুরের বর্ণনা

বাইবেলের পুরাতন নিয়মের লেখকের সংখ্যা অনেক। যেহেতু বাইবেল রচনার ইতিহাস অজানা, সেহেতু এই ইতিহাসকে ঘিরে রয়েছে বহু বিভ্রান্তি। আমার ইতিপূর্বেকার 'দি বাইবেল দি কোআন এ্যান্ড সায়েন্স" (বর্তমান অনুবাদক কর্তৃক বাংলায় রূপান্তরিত : 'বাইবেল কোরআন ও বিজ্ঞান : ষষ্ঠ সংস্করণ) পুস্তকে বহু খ্যাতিমান বাইবেল বিশারদের মন্তব্য উদ্ধৃত করে এ বিষয়ে বিশদ বিবরণ লিপিবদ্ধ করেছি। বিশেষত, এ বিষয়ে জেরুজালেম বাইবেল স্কুলের তত্ত্বাবধানে ফরাসী ভাষায় বাইবেলে যে সর্বাধুনিক সংস্করণ প্রকাশিত হয়েছে (প্রকাশক, এডিশন্স, দ্য সার্ফ, প্যারিস, ১৯৭২) তার ভূমিকা তুলে ধরে এ বিষয়ে আলাদাভাবেও আলোচনা করেছি।

আদিতে বাইবেল পুরাতন নিয়মের (তাওরাত ও জবুর) নামে শুধু একটা নয় বরং বেশ কয়েকটা ধর্মগ্রন্থ চালু ছিল। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকে এর সব কয়টা ধর্মগ্রন্থ অবলম্বনে শুধু ধর্মগ্রন্থ রচনার প্রয়াস চলে। কিন্তু তা প্রয়াস সফল হয় অনেক পরে : যীশুখ্রিস্টের জন্মের শত বছর পর 'বাইবেল পুরাতন নিয়ম' একটি নির্দিষ্ট ধর্মগ্রন্থের রূপ ধারণ করে। তবুও সর্বাধিক প্রাচীন যে হিব্রু বাইবেলটি পাওয়া গেছে তা রচিত হয়েছিল খ্রিস্টীয় নবম শতাব্দীতে। পক্ষান্তরে, গ্রীক ভাষায় 'সেপ্টোজিন্ট' নামে যে বাইবেলটি প্রাচীনকালে চালু ছিল তা খুব সম্ভব অনূদিত হয়েছিল আলেকজান্দ্রিয়ার ইহুদীদের দ্বারা। বাইবেলের নিউ টেস্টামেন্ট বা নতুন নিয়ম (ইঞ্জিল শরীফ) প্রথম রচিত হয়েছিল এই ইহুদী বাইবেলের ভিত্তিতেই। খ্রিস্টীয় সপ্তম শতাব্দী পর্যন্ত এই বাইবেলটিইপ্রামাণ্য হিসেবে স্বীকৃত ছিল। এর যে মূল গ্রীক রচনা যা তদানীন্তন খ্রিস্টানজগতে চালু ছিল–তা গৃহীত হয়েছিল দুটি পাণ্ডুলিপি থেকে: একটির নাম 'কোডেক্স ভ্যাটিক্যানাস'এটি রক্ষিত হয়েছে ভাটিকান সিটিতে। অপরটিরনাম 'কোডেক্স সিনাইটিকাস' এটি সংরক্ষিত রয়েছে লন্ডনের ব্রিটিশ মিউজিয়ামে। এই উভয় পান্ডুলিপির রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্থ শতাব্দী।

এসব বাইবেল অবলম্বনে বিশেষজ্ঞরা পরবর্তীকালে তথাকথিত 'মাঝামাঝি পর্যায়ের' একটি বাইবেল রচনা করে নেন : উদ্দেশ্য, ভিন্ন ভিন্ন বাইবেলের

www.pathagar.com

বিভিন্ন ধরনের বক্তব্যের মধ্যে এক ধরনের আপসমূলক সমন্বয় সাধন এবং ধর্মগ্রন্থ হিসেবে শুধু একটি বাইবেল চালু করা। বাইবেল রচনার সেই একই ধারা এখন পর্যন্ত চালু রয়েছে। এই মাত্র সেদিন-১৯৭৫ সালে শতাধিক ক্যাথলিক ও প্রোটেস্ট্যান্ট বিশেষজ্ঞ সম্মিলিতভাবে আপস-রফার মাধ্যমে একটি সমন্বয়মূলক বাইবেল সংকলন, সম্পাদনা ও প্রকাশ করেন। নাম, 'ইক্যুমেনিক্যাল ট্রান্সলেশন অব দি ওল্ড টেস্টামেন্ট'। প্রচলিত বাইবেলসমূহের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের অর্থ ও ব্যাখ্যা সম্পর্কে খ্রিস্টীয় জগতের বিভিন্ন গীর্জা কোন সময় একমত ছিল না। সে কারণেই আপস-রফার মাধ্যমে সকল গীর্জার নিকট সমভাবে গ্রহণযোগ্য একটি সমন্বয়মূলক বাইবেল প্রকাশের এই সম্মিলিত উদ্যোগ গৃহীত হয়েছিল।

বাইবেলের পুরাতন নিয়ম মূলতঃ বহুপুরুষ ধরে বহু জনের দ্বারা রচিত বহু ধরনের ছোট বড় রচনার একটি বিচিত্র সমাহার। এসব রচার মূলে ছিল লোকমুখে প্রচলিত নানা কাহিনী। সেইসব লোককাহিনী সুদীর্ঘ নয় শ' বছর যাবত বিভিন্নভাবে জনসমাজে চালু ছিল। সেইসব লোকশ্রুত কাহিনী পরিমার্জিত করে নিয়ে সংকলন আকারে প্রকাশ করা হতো। প্রয়োজনে সংকলনের সময় রচনা ও কাহিনীকে ঢেলে সাজানো হতো। কখনো বা তার মধ্যে জুড়ে দেয়া হতো নানা প্রয়োজনীয় তথ্য ও সমকালে সংঘটিত নানা কাহিনী। কোনো কোনো কাহিনী আবার গ্রহণ করা হতো লোকমুখে প্রচলিত অতীতকালের ঘটনা থেকে। এভাবে সংকলিত একটি বাইবেল সম্ভবত প্রথম প্রকাশিত হয় ইসরাইলী রাজত্বের সূচনাপর্বে– খ্রিস্টপূর্ব একাদশ শতাব্দীর দিকে। এই সময়কালে রাজপরিবারের সদস্যদের মধ্যে একটি লিপিকার গোষ্ঠী গড়ে ওঠে। পরবর্তীতে এসব লিপিকারের দ্বারা ইতস্তত ছড়ানো-ছিটানো নানা রচনা ও কাহিনী সংগ্রহ ও লিপিবদ্ধ হয়ে বাইবেল পুরাতন নিয়মের নামে একটি প্রাথমিক সংকলন প্রস্তুত হয়।

এরও বেশ কিছুকাল পরে, কারো কারো মতে, খ্রিস্টপূর্ব দশম শতাব্দীর শেষদিকে; আবার কারো মতে, নবম শতাব্দীতে (খ্রিঃ পূঃ) প্রকাশিত হয় বাইবেল পুরাতন নিয়মের জেহোভিস্ট পাঠ বা টেক্সট। এই রচনা এখনও পর্যন্ত বাইবেলের প্রথম পাঁচটি পুস্তকে বিদ্যমান। এটি বাইবেলের পেন্টাটেক বা পঞ্চপুস্তক (তাওরাত) নামে পরিচিত। বাইবেলের এই রচনার এই জেহেভিস্ট নামকরণের কারণে,এসব রচনায় গডকে অভিহিত করা হয়েছিল 'জেহোভা' নামে। উল্লেখ্য, ইংলিশ 'রিভাইজড স্ট্যান্ডার্ড ভার্সন অব বাইবেলে' এই জেহোভিস্ট রচনার অনুবাদে কিন্তু 'গড' কে 'জেহোভা' বলা হয়নি, বলা হয়েছে 'দি লর্ড গড'।

এরপরে এই রচনার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় বাইবেলের এলোহিস্ট রচনা। এই রচনা পাঠের 'এলোহিস্ট' নামকরণের কারণ, এতে 'গড'কে আখ্যায়িত করা

www.pathagar.com

হয়েছে 'এলোহিম' নামে। এভাবে খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে এসে বাইবেলের এই রচনার সঙ্গে সংযুক্ত করা হয় সেকেরডোটাল পাঠ। এসব পাঠ জেরুজালেম উপাসনালয়ের যাজক-পুরোহিতদের দ্বারা রচিত হয় বলেই বাইবেলের সঙ্গে সংযুক্ত এই সর্বাধুনিক পাঠ বা রচনার নামকরণ হয় 'সেকেরডোটাল টেক্সট'।

আলোচ্য গবেষণা-বিশেষণে এই 'পেন্টাটেক' বা বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রথম 'পঞ্চপুস্তকের' গুরুত্ব অনেক। কারণ, এই পেন্টাটেকের (অর্থাৎ তাওরাতের) প্রথমেই রয়েছে 'বুক অব জেনেসিস' বা (বাংলা বাইবেলের) 'আদিপুস্তক'। এখানেই মানুষ ও বিশ্ব সৃষ্টির একটি নয় বরং দুটি বিবরণ দেখা যায়। এর একটি হলো, বাইবেলের সর্বাধুনিক রচনা অর্থাৎ সেকেরডোটাল পাঠ। অধুনা বাজারে যে বাইবেল চালু রয়েছে তার সূচনাতেই রয়েছে এই সেকেরডাটাল রচনা। পক্ষান্তরে, পূর্ববর্তী রচনার জেহোভিস্ট-পাঠকে স্থান দেয়া হয়েছে সেকেরডোটাল রচনার পরে। অবশ্য, জেহোভিস্ট রচনায় মানুষ ও বিশ্বসৃষ্টি-সংক্রান্ত বিবরণ খুবই সংক্ষিপ্ত।

বেশির ভাগ মানুষই এই ধারণা পোষণ করেন যে, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে বাইবেলের পুরাতন নিয়মে একটি মাত্র বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু এই ধারণা সঠিক নয়। আধুনিক খ্রিস্টান ধর্মবেত্তারাও স্বীকার করেছেন যে, সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে দুটি ভিন্ন ধারার রচনা বাইবেলে স্থান পেয়েছে। এই ধর্মতত্ত্ববিদদের মধ্যে সর্বাধিক খ্যাতিমান হলেন– ফাদার ডি ভক্স। তিনি জেরুজালেম বাইবেল স্কুলের প্রধান। তাঁর রচিত ও প্রকাশিত 'আদি পুস্তকের ভাষ্য' নামক পুস্তকে কোন রচনা কোন সময়ের তা স্পষ্টভাবে চিহ্নিত করা হয়েছে।

প্রাচীনকাল থেকে এই ধারণা পোষণ করে আসা হচ্ছিল যে, বাইবেলের এই 'আদিপুস্তকের' রচয়িতা হচ্ছেন হযরত মুসা (আঃ) স্বয়ং। কিন্তু সেই ধারণাও সঠিক নয়। কেউ জানে না, বাইবেলের এই জেহোভিস্ট রচনা ও এলোহিস্ট রচনার মূল লেখক কারা। ভবিষ্যদ্বাণী-সংক্রান্ত বেশ কিছু পুস্তকও বাইবেলের অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। এসব পুস্তকে খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতাব্দী থেকে খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর কাহিনী বর্ণিত আছে। এর প্রথম দুটি পুস্তক হচ্ছে 'বুক অব ইলিয়াস' এবং 'বুক অব এলিশা'। বাইবেলের ইতিহাস-পুস্তকসমূহে যে সব বিবরণ লিপিবদ্ধ রয়েছে তার মূলকথা হচ্ছে, খ্রিস্টপূর্ব ত্রয়োদশ শতাব্দী থেকে খ্রিঃ পূর্ব দ্বিতীয় শতক পর্যন্ত। ইহুদীরা যখন তাদের প্রতিশ্রুত আবাসস্থলে প্রবেশ করে, তখন থেকেই এই ইতিহাসের সূচনা। খ্রিঃ পূঃ দ্বিতীয় শতকের ঘটনাবলি এসব ইতিহাস-পুস্তকে বিশ্বস্তভাবে বর্ণিত হয়েছে বলে মনে হয়। পক্ষান্তরে, অপরাপর শতাব্দীর ইতিহাস বর্ণনায় সঠিকত্বের কোন বালাই নেই। এসব বর্ণনায় ধর্মীয় ও নৈতিকতার দিক থেকে ইতিহাসের যে বিকৃতি সাধন করা হয়েছে, ইদানীংকালের গবেষণায় তা স্পষ্টভাবে ধরা পড়েছে।

www.pathagar.com

পুরাতন নিয়মের সর্বশেষ অধ্যায়গুলো যেন কবিতা ও নীতিকথার জন্যই বরাদ্দ করা হয়েছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে– সাম বা 'গীত-সংহিতা' পুস্তক। এটাও বেশ কয়েকজন লেখকের রচনা। এঁদের মধ্যে প্রধান হচ্ছেন ডেভিড বা হযত দাউদ (আঃ) মুসলমানরা বিশ্বাস করেন যে, হযরত দাউদের (আঃ) নামে যে পুস্তকটি বাইবেলে সংযোজিত রয়েছে, সেটি হচ্ছে তাঁর উপর নাজিলকৃত 'জবুর' কিতাবের রূপ। এছাড়াও বাইবেলের পুরাতন নিয়মে আরো বহু পুস্তক সংযোজিত রয়েছে, যেগুলোর লেখক অজ্ঞাত। এর থেকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় যে, বাইবেল (পুরাতন নিয়ম) হচ্ছে, বহু পুস্তকের সমাহার এবং সে সব পুস্তকের বিষয়বস্তুর মধ্যে কোন ধারাবাহিকতা বা সঙ্গতি নেই। বিভিন্ন সময় এসব রচনা বিভিন্নজনের দ্বারা সংশোধিত হয়েছে এবং হাতর কাছে যখন যা পাওয়া গেছে তা-ই এতে কায়দা মতো জুড়ে দেয়া হয়েছে। ইহুদীদের এই বাইবেলই খ্রিস্টানরা উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করেছিল এবং নতুন নিয়মের (ইঞ্জিল শরীফ) সুসমাচারের লেখকবৃন্দ এই বাইবেলকেই অনুসরণ করেছেন বিশ্বস্তভাবে।

এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, খ্রিস্টীয় প্রথম কয়েক শতাব্দী ধরে বাইবেলের নতুন নিয়মের রচনাবলি সংকলনের ক্ষেত্রে খ্রিস্টান ধর্মীয় নেতৃবর্গ খুবই কঠোরতা অবলম্বন করেছিলেন। সেকালে নিজেদের মর্জিমাফিক প্রচলিত বহু ধারণাই তাঁরা বাদ দিয়ে গেছেন। বাইবেলের পুরাতন নিয়মে কিন্তু এমনটি হয়নি। সেখানে প্রচলিত সব রচনাকেই স্থান দেয়া হয়েছে। বাইবেলের পুরাতন নিয়মের প্রথম পঞ্চপুস্তক ইহুদীদের নিকট 'তোরাহ' নামে পরিচিত। এ পুস্তকগুলো হচ্ছে যৌথভাবে হযরত মুসা ও হযরত হারুনের (আঃ) ওপর অবতীর্ণ আসমানী কিতাব তাওরাতের বিকৃত রূপ। দ্রঃ কোরআন ৩৭নং সূরা সাফফাত, আয়াত ১১৭।

'তোরাহ' বা 'তাওরাত' শব্দের অর্থ 'আইন' বা 'বিধানপুস্তক'। এসব পুস্তকে বর্ণিত হয়েছে বিশ্বসৃষ্টি থেকে শুরু করে হযরত মুসার (আঃ) মৃত্যু পর্যন্ত বিস্তীর্ণ সময়কালের বিস্তারিত বিবরণ।

এসব পুস্তকে বর্ণিত বিষয়বস্তু সম্পর্কে অধুনা নানা প্রশ্ন উত্থাপিত হচ্ছে এবং তার ফলে সৃষ্টি হচ্ছে বিব্রতকর পরিস্থিতি। কারণ, শতাব্দীর পর শতাব্দী চলে গেছে, বাইবেলের পুরাতন নিয়মে রচনা, তার বিষয়বস্তু, ভাবধারা নিয়ে এ পর্যন্ত কার্যত কোন পর্যালোচনা ও বিশেষণ কখনো হয়নি। এসব পুস্তকের পর্যালোচনা হওয়ার অবকাশই বা ছিল কোথায়? কারণ, এই পুরাতন নিয়মের প্রথম পাঁচটি পুস্তকের অধ্যায় জুড়ে এমন সব বক্তব্য রয়েছে, হযরত মুসা (আঃ) স্বয়ং এসব বক্তব্য বা বিধান লিপিবদ্ধ করে গেছেন। তদুপরি, এই পুস্তকেই দেখা যাচ্ছে যে, স্বয়ং বিধাতাই হযরত মুসাকে (আঃ) নির্দেশ দিচ্ছেন, তিনি

www.pathagar.com

(মূসা) যেন 'যাত্রাপুস্তকের' (বুকস অব এক্সজোডাস) বিভিন্ন ঘটনা লিপিবদ্ধ করে রাখেন। যীশুখ্রিস্টের সমসাময়িক জনৈক ধর্মনিরপেক্ষ বুদ্ধিজীবী লেখক আলেকজান্দ্রিয়ার ফিলো (ফিলো অব আলেকজান্দ্রিয়া) বাইবেলের এই বক্তব্যকে সঠিক বলে রায়ও প্রদান করে গেছেন। খ্রিস্টপূর্ব প্রথম শতকের অপর বুদ্ধিজীবী ফ্লাভিয়াস জোসেফাসের অভিমতও ছিল অনুরূপ। সর্বোপরি, সুসমাচারের (বাইবেল নতুন নিয়ম : ইঞ্জিল) লেখকবৃন্দ আশ্বস্ত করেছেন যে, বাইবেলের এই পঞ্চপুস্তকের রচয়িতা যে স্বয়ং হযরত মুসা (আঃ) সে সম্পর্কে যীশুখ্রিস্ট নিজেই সাক্ষ্য প্রদান করে গেছেন।

ফাদার ডি ভক্স তাঁর 'জেনারেল ইন্ট্রোডাকশন টু দি পেন্টাটেক" পুস্তকে বাইবেল পুরাতন নিয়মের ইতিহাসগত বিচারে বাইবেলের এই বিভ্রান্তির তীব্র সমালোচনা করেছেন। দেখা গেছে, দ্বাদশ শতকে এ্যাবনেজরা কর্তৃক পেন্টাটেকের আদি উৎস সম্পর্কিত প্রতিবাদ উত্থাপনের পর কেউ আর কোন রকম টু শব্দটি করেননি। ষোড়শ শতকে এসে জনৈক প্রোটেস্ট্যান্ট লেখক কার্লস্ট্যান্ড এই মর্মে অভিমত প্রকাশ করেন যে, হযরত মুসা (আঃ) কর্তৃক নিজের মৃত্যুর বিবরণ লিপিবদ্ধকরণের ব্যাপারটা অবান্তর। অথচ, বাইবেল পুরাতন নিয়মের 'যাত্রা পুস্তকে' (৩৪, ৫-১২) তাই লেখা রয়েছে। শুধু তাই নয়, কার্লস্ট্যান্ড আরো লিখেছেন, একইভাবে 'যাত্রাপুস্তকের শেষ পর্যন্ত হযরত মুসার (আঃ) রচনা বলে চালিয়ে দেয়া হয়েছে। ফাদার ডি ভক্স প্রমাণপঞ্জি তুলে ধরে দেখিয়েছেন, বাইবেল পুরাতন নিয়মের এই পঞ্চপুস্তকে এমনসব ঘটনা ও বর্ণনা লিপিবদ্ধ রয়েছে যা কখনো হযরত মুসা (আঃ) রচনা হতে পারে না।

এভাবে বাইবেল পুরাতন নিয়মের বিচার-বিশ্লেষণ তুলে ধরে অতীতে যাঁরা এর সমালোচনা করে গেছেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছেন রিচার্ড সাইমন। তিনি ছিলেন গীর্জার একজন যাজক। তিনি তাঁর 'ক্রিটিক্যাল হিস্টরি অব দি ওল্ড টেস্টামেন্ট" (প্রকাশ, ১৬৭৮) পুস্তকে দেখিয়েছেন, পুরাতন নিয়মের এই পঞ্চপুস্তকে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনা ও কাহিনীর ধারাবাহিকতায় অসঙ্গতি, পুনরুক্তি, অসংলগ্নতা এবং রচনা-রীতির ভিন্নতা কতটা প্রকট। রিচার্ড সাইমনের এই পুস্তক প্রকাশের পর চারদিকে হৈচৈ পড়ে যায় এবং সাইমনকে যাজক পদ থেকে বরখাস্ত করা হয়।

এই কারণেই সাইমনের এই সমালোচনার ধারা অতঃপর আর অব্যাহত থাকেনি। ফলে, হযরত মুসা (আঃ) গোটা 'পঞ্চপুস্তকে'র লেখক হিসেবে টিকে যান। এমনকি অষ্টাদশ শতকে রচিত বিভিন্ন পুস্তকেও দেখা যায়, "হযরত মুসা (আঃ) লিখেছেন" বলে এন্তার উদ্ধৃতি তুলে ধরা হচ্ছে। ফাদার ডি ভক্স অবশ্য স্বীকার করেছেন, যে-ক্ষেত্রে হযরত মুসা (আঃ) কর্তৃক পুস্তক রচনার ব্যাপারটা

www.pathagar.com

সম্পর্কে স্বয়ং যীশুখ্রিস্ট সাক্ষ্য দিয়েছেন বলে সুসমাচার-লেখকবৃন্দ বর্ণনা করে গেছেন (যোহন, মথি ও লুক) এবং নতুন নিয়মের অন্যত্র (ইঞ্জিল শরীফ, প্রেরিতদের কার্যাবলি, পৌলের পত্র দ্রঃ) যা সমর্থিত হয়েছে– তাতে কার ঘাড়ে কয়টা মাথা রয়েছে যে, সে সম্পর্কে প্রশ্ন উত্থাপন হতে পারে!

এর অনেক পরে এ সম্পর্কে পুনরায় বিতর্কের সূত্রপাত ঘটান রাজা পঞ্চদশ লুইয়ের চিকিৎসক জন অস্ট্রুক। ১৭৫৩ সালে জিন অস্ট্রুক একখানি পুস্তক রচনা করেন, নাম : 'কনজেকচার্স অন দি অরিজিন্যাল রাইটিংস হুইচ ইট এগিয়ার্স মোজেস ইউজড টু কম্পোজ দি কস অব জেনেসিস। এই পুস্তকে অস্ট্রুক দেখান যে, বাইবেলের পঞ্চপুস্তকের দুটি রচনা সম্পূর্ণ আলাদা ধাঁচের। একটিতে 'গড' কে বলা হয়েছে 'জেহোভা; অন্যটিতে 'এলোহিম' : জেনেসিস বা আদিপুস্তকে এই দুই ধরনের রচনাই পাশাপাশি স্থান পেয়েছে। এর দ্বারা এটাই প্রমাণিত হয় যে, দুই ধরনের রচনাকে একত্রিত করেই এই 'জেনেসিস' বা 'আদিপুস্তক' সংকলিত হয়েছে।

ফাদার ডি ভক্স তাঁর পুস্তকে এ বিষয়ে অতিসাম্প্রতিক ভাষ্যকারদেরও অভিমত তুলে ধরেছেন। ওইসব ভাষ্যকারের অভিমত, বাইবেলের পেন্টাটেক বা প্রথম পঞ্চপুস্তকের (তাওরাতের) রচনাবলিকে চার ভাগে ভাগ করা যেতে পারে।

যথা : জেহোভিস্ট রচনা : এই রচনার সময়কাল খ্রিস্টপূর্ব নবম শতাব্দী থেকে। এলোহিস্ট রচনা : কিছুটা পরবর্তীকালে এটি রচিত।

গণনাপুস্তক : কারো কারো মতে, এটি রচিত হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব অষ্টম শতকে; কারো কারো অভিমত, এই পুস্তকের রচনাকাল খ্রিস্টপূর্ব সপ্তম শতক; এবং

সেকেরডোটাল রচনা : এর রচনাকাল ইহুদীদের ব্যাবিলনে নির্বাসনকালে কিংবা তৎপরবর্তী সময়ে (খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দী)।

ভাষ্যকারেরা এভাবেই বাইবেলের প্রত্যেকটি রচনা/পাঠের সূত্র তথা লেখককে আলাদা আলাদাভাবে শনাক্ত করতে সমর্থ হয়েছেন। এর মধ্যে সেকেরডোটাল আমলের বাইবেল-রচয়িতা হচ্ছেন নয়জন। এই সেকেরডোটাল আমলের রচনায় রয়েছে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কিত একটি বিবরণ; এর রচয়িতা একজনই : বাকি আটজন লেখকের রচনা এতে অনুপস্থিত। এভাবেই দেখা যায়, এসব লেখক ও সম্পাদক সে আমলে সাধারণ্যে প্রচলিত বিভিন্ন কাহিনী একত্রিত করে এই বাইবেল সঙ্কলিত করেছেন, সমন্বয়ের স্বার্থে একটা কাহিনীর সঙ্গে আরেকটা কাহিনী জুড়ে দিয়েছেন।

সাধারণভাবে প্রচলিত একটা ধারণা এই যে, বাইবেলের রচনাসমূহ "ঐশ্বরিক প্রেরণাসঞ্জাত"। পক্ষান্তরে, আধুনিক ভাষ্যকারদের সুস্পষ্ট অভিমত, বাইবেল হচ্ছে, বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত ও সংগৃহীত রচনার একটা সঙ্কলন মাত্র। মজার ব্যাপার এই যে, এত কিছুর পরেও আধুনিক খ্রিস্টীয় তত্ত্ববিদেরা কিন্তু প্রচলিত

www.pathagar.com

উপরোক্ত ধারণা ও আধুনিক গবেষকদের সুস্পষ্ট সিদ্ধান্তের মধ্যে কোনো অসঙ্গতি খুঁজে পান না। যেমন, জিন গেটন তাঁর রচিত "মাই লিটল ক্যাটেশিজম" গ্রন্থের (প্রকাশ, প্যারিস, ১৯৭২) "দি রেভিলেশন অব দি ট্রুথ, দি বাইবেল এ্যান্ড দি গসপেলস অধ্যায়ে লিখেছেন : "বিধাতা স্বয়ং এসব পুস্তকের রচয়িতা নন। তবে তিনি প্রেরিত ও নবীদের মধ্যে নিঃশ্বাস সঞ্চারিত করে দিয়ে তাঁদের দ্বারা সেইসব রচনা লিখিয়ে নিয়েছেন, যে সব রচনা তিনি (বিধাতা) আমাদের জন্য জ্ঞাতব্য মনে করেছেন। বিাতার এ নিঃশ্বাসকেই বলা হয় 'প্রেরণা'। নবীদের দ্বারা রচিত কোন পুস্তককে এই জন্যই অলৌকিক প্রেরণাসঞ্জাত পুস্তক হিসেবে আখ্যায়িত করা হয়।"

কিন্তু খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিকেরা যাই বলুন, বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি, বাইবেল রচয়িতারা তাঁদের রচনাসমূহে নিজ নিজ আমলের ধ্যান-ধারণাই লিপিবদ্ধ করে গেছেন। এই জন্যই বাইবেলের বিভিন্ন অধ্যায়ে বিভিন্ন আমলের সাহিত্যিক প্রকাশভঙ্গির পরিচয় মেলে। কিন্তুন্ত বাস্তব অবস্থা যাই হোক, জনসমাজে উপরোক্ত তাত্ত্বিকদের বক্তব্য ও অভিমতই গৃহীত হয়েছিল; গবেষকদের গবেষণার সিদ্ধান্ত তেমন আমল পায় নাই। ফলে, আজো যখন কেউ বাইবেলের পুরাতন নিয়মও নতুন নিয়মের সুসমাচারসমূহ পড়েন, তখন কোথাও কোথাও 'ঐশ্বরিক প্রেরণার পরিচয়' পেয়ে যেমন বিস্মিত হন না; তেমনি যখন তাঁরা তার পাশাপাশি ভিন্ন ধরনের রচনা দেখতে পান, তখনও কিছু মনে করেন না! অথচ এসব রচনাকে আধুনিক জ্ঞানী-গুণী গবেষকগণ প্রচলিত লোক কাহিনী এমন সব সূত্র থেকে গৃহীত যা কখনো অখ্যাত, আবার কখনো অজ্ঞাত।

আধুনিক তথ্য-উপাত্তের আলোকে বাইবেলে সন্নিবেশিত বিভিন্ন রচনার এই যে সমালোচনা, তা অবশ্যই আধুনিক খ্রিস্টীয় ধর্মতাত্ত্বিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে আলাদা। তবে, সময় যতই এগিয়ে চলেছে ততই বাইবেলের এসব রচনা কি ধরনের প্রচলিত কাহিনী থেকে গৃহীত হয়েছে এবং সেই গ্রহণ বা বর্জনে মানুষর হস্তক্ষেপ কতটা, তা ক্রমশ সুস্পষ্ট হয়ে ধরা পড়েছে।

বস্তুত, অধুনা বাইবেলের বিভিন্ন রচনায় বাণী ও বক্তব্যের অসঠিকত্ব, অসম্ভবতা কিংবা তাদের বৈপরিত্য সম্পর্কে সহজেই অঙ্গুলি নির্দেশ করা সম্ভব। কিন্তু তবুও বাইবেলের এসব রচনা নিয় কাউকে তেমন গা করতে দেখা যায় না। অথচ আমরা আজ পরিষ্কারভাবেই জানি যে, ওল্ড টেস্টামেন্টে এমন সব বাণী ও বক্তব্য বিদ্যমান যা আধুনিক তথা-প্রমাণ ও জ্ঞান-বিজ্ঞানের নিরিখে সম্পূর্ণ সঙ্গতিবিহীন।

দ্বিতীয় ভাটিক্যান কাউন্সিল (১৯৬২-১৯৬৫) অবশ্য স্বীকার না করে পারে নাই যে, বাইবেলের কোন কোন রচনা 'ত্রুটিপূর্ণ ও সেকেলে'। এ কথাটাই তুলে

www.pathagar.com

ধরা হয়েছে, ১৯৬৬ সালে প্যারিসের 'লে সেঞ্চুরিয়ান' প্রকাশিত 'কনসিলিয়ার ডকুমেন্ট' নং ৪ এর "অন দি রেভিউলেশন' অধ্যায়ে। নিচের উদ্ধৃতি থেকেই বুঝা যাবে, বাইবেলের রচনা সম্পর্কে সামগ্রিকভাবে ক্যাথলিক চার্চের দৃষ্টিভঙ্গি কী এবং বাইবেলের কোন কোন রচনাকে আক্ষরিক অর্থে গ্রহণ করতে করতে গেলে কেন আজ আমাদের এতসব অসম্ভবতার মুখোমুখি হতে হয়।

উদ্ধৃতিটি এই :

"যীশুখ্রিস্টের দ্বারা মানুষের পরিত্রাণের ভিত্তি সংস্থাপিত হওয়ার আগে মানব সমাজে যে অবস্থা বিরাজ করছিল, তার প্রেক্ষিতে এ কথা নিঃসন্দেহে বলা চলে যে, সেইকালে বাইবেলের পুরাতন নিয়মের এই পুস্তকগুলিই স্রষ্টা এবং সৃষ্টিজীব মানুষ সম্পর্কে সবাইকে অবহিত করেছে। তাছাড়াও বিধাতা কিভাবে মানুষের প্রতি ন্যায়বিচার, করুণা ও সদাচার করে থাকেন, সে-সম্পর্কিত বাইবেলের এই রচনাগুলিই সবাইকে করেছে জ্ঞানদান। বাইবেলের এসব রচনায় যদিও এমন সব বক্তব্য রয়েছে– যা "অসম্পূর্ণ" ও 'সেকেলে' তবুও এসব রচনায় সত্যিকারের আসমানী শিক্ষাই হচ্ছে প্রতিফলিত।

তথ্য সূত্র : ডঃ মরিস বুকাইলী

www.pathagar.com

প্রাণী তত্ত্ব-বৈজ্ঞানিকউপকরণ ও সভ্যতার অগ্রগতিসাধক কোরআনে বর্ণিত প্রাণী গুলো Zoology

কীটপতঙ্গ থেকে শুরু করে বর্তমানে জীব-জন্তুর বিশাল জগত নিয়ে গবেষণার শেষ নেই। এদের ভাষা, খাদ্য, বাসস্থান, সামাজিক বন্ধন, চাল-চলন, প্রজনন পদ্ধতি প্রভৃতি বিষয়ে চর্চা করতে করতেই গড়ে ওঠেছে বিজ্ঞানের অন্য একটি শাখা প্রাণী বিজ্ঞান। প্রাণী বিজ্ঞানের ইংরেজী নাম Zoology। এটি তৈরি হয়েছে দু'টি শব্দ Zoon আর Logos মিল বিজ্ঞান।

আল কোরআনে মানুষ ব্যতীত অন্যান্য বিশেষ কিছু কীটপতঙ্গ ও জীবজন্তুর নাম উলেখ করা হয়েছে তা খুবই গুরুত্ব বহন করে। যেমন মৌমাছির চাল-চলন, মাকড়সার জাল বুনন, মরুভুমির উট, ভারবাহী পশু, শূকর, মৃত পশু-পাখি এসবের উপস্থাপনা অত্যন্ত তাৎপর্যমণ্ডিত।

"পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই, এমন কোন উড়ন্ত জীব নেই যারা তোমাদের মতো গোত্র (Community) রচনা করেনি। আমরা এ গ্রন্থে কোন কিছু অবহেলা করিনি। অবশেষে তারাই সকলেই একত্রিত হবে তাদের প্রভুর সমীপে।" (আনআম-৩৮)।

কমিনিটি বা গোত্রের অর্থ হলো পৃথক পৃথক জীবিত সত্তার সম্মিলিত সংস্থা যাদের মধ্যে কিছু কিছু সমজাতীয় বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। বহুকাল ধরে প্রাণীদের জীবন ধারণ, বৃদ্ধি, প্রজনন এবং আচার আচরণ জীবনের একটি গোত্র বা (Community) রচনা করে। এ গোত্রগুলো গঠিত হয় বহু জাতীয় প্রজাতির প্রাণীদের মাধ্যমে। এ প্রাণীগুলো জলে কিংবা স্থলে অথবা একটি বিশেষ পরিবেশে বসবাস করে।

কোরআনের উপরোলেখিত আয়াতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে যে, প্রাণী জগতের প্রত্যেক গোত্র গঠিত হয় তাদের নিজস্ব প্রজাতির আলোকে। এ প্রজাতিভুক্ত প্রাণীরা পৃথিবীর বুকে কেউ হামাগুঁড়ি দিয়ে চলে, কেউ পায়ে হেঁটে ভ্রমণ করে, কেউবা বাতাসে উড়ে বেড়ায়। আবার গোত্রভুক্ত প্রত্যেক প্রাণী জৈব মিরনের দুই অংশীদার নিয়ে গঠিত। বৃহত্তর গোত্রের একক হলো জনগোষ্ঠী। এ গোষ্ঠী ক্রমান্বয়ে জটিল আকারে সংঘবদ্ধ হয়ে সমাজ গঠন করে। এ সমাজ গঠনের ধারায় নারী, পুরুষ, শিশু ও কিশোরদের অংশীদারিত্ব থাকে এবং নেতৃত্বদানকারী একজন অভিভাবক থাকে। এরূপ প্রত্যেক গোত্রে অভিভাবক

www.pathagar.com

বা সর্দার কিংবা নেতা প্রতিষ্ঠিত আছে। প্রাণী জগতের সবচেয়ে আকর্ষণীয় দিক হলো কীট-পতঙ্গের সামাজিক সংঘবদ্ধতা।

ঔষধ প্রস্তুত কারক কীট-মৌমাছি

মৌমাছির গোত্রীয় আচরণ উল্লেখ করা যায়। মানুষের সমাজে যেমন কর্ম বিভাগ আছে তেমনি কর্ম বিভাগ ব্যবস্থা প্রত্যক্ষ করা যায় মৌমাছিদের সমাজে। মৌমাছিদের গোত্রীয় জীবনের কর্মবিভাগগুলো রানী মৌমাছি, পুরুষ মৌমাছি ও কর্মী মৌমাছি দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। এটা খুবই আশ্চর্যের বিষয় যে, এরা একে অপরের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে নৃত্য-ভঙ্গির মাধ্যমে। এ নৃত্য ভঙ্গি দুইটি তথ্য সরবরাহ করে।

(১) খাদ্যের ঠিকানা

(২) খাদ্যের মজুদ।

পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে, যদি মৌমাছি সোজাপথে উড়ে এগিয়ে যায়, তারপর ডানদিকে ঘুরে, তারপর আবার সোজাপথে চলে, এরপর আবার বামদিকে ঘুরে, তাহলে এ নৃত্য-ভঙ্গির দ্বারা বুঝা যায় যে, এখানে অর্থাৎ তার চলন-ভঙ্গির বলয়ের মধ্যে খাদ্যের (ফুলের মধু) সন্ধান মিলেছে। অধিকন্তু মৌমাছির খাদ্যের গতি সন্ধানের ইঙ্গিত পাওয়া যায় সূর্যকিরণের গতিপথের সঙ্গে খাদ্যের গতিপথের সম্পর্কের মধ্যে মিল প্রতিষ্ঠা করে। সূর্য কিরণের গতিপথ দেখানো হয় মৌচাকের উপরে অংশ থেকে উপরদিকে তির্যকভাবে রেখা টেনে। যদি মৌমাছি লম্বভাবে উপরদিকে ওঠে তাহলে বুঝতে হবে যে, এভাবে উপরের দিকে ওঠলেই খাদ্যের সন্ধান মিলবে যদি খাদ্যের ঠিকানা সূর্য-কিরণ থেকে ৩০ ডিগ্রি বামে থাকে তাহলে নৃত্যের গতি সূর্য রশ্মির লম্ব রেখা থেকে ৩০ ডিগ্রি বামে ঝুঁকে পড়বে। অন্যান্য মৌমাছিরা নৃত্যরত মৌমাছিদের লক্ষ্য করে দেখে এবং তাদের অবস্থানের সঙ্গে লম্বরেখার সম্পর্ক কি ধরনের তা অবলোকন করে। যখন নৃত্যশীল মৌমাছিরা চলে যায় তখন অন্যরা সূর্যরশ্মির প্রতি লক্ষ্য স্থির করে একটি নির্দিষ্ট কৌণিক দূরত্ব বজায় রেখে খাদ্যের সন্ধানে বেরিয়ে পড়ে।। যে পথে ভ্রমণ করার জন্য তিনি তাদের আদেশ দিয়েছেন। মৌমাছিদের উপর বিভিন্ন গবেষকদের গবেষণা কর্মে নৃত্য ভঙ্গির আলোকে নির্দিষ্ট পথের বিষয়টি অসাধারণভাবে ফুটে ওঠেছে।

"অতঃপর সব ধরনের ফল থেকে ভক্ষণ কর যা পৃথিবীতে উৎপন্ন হয় এবং আপন প্রভুর পথ অনুসরণ কর যা তিনি তোমাদের জন্য সহজ করে তৈরি করেছেন। মৌমাছিদের পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় (মধু) নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। অবশ্যই এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য রয়েছে নির্দেশনা।" সূরা নাহলের ৬৯ নং আয়াত।

www.pathagar.com

প্রকৌশলী প্রাণী–মাকড়সা

আল কোরআনে মাকড়সার (spider) উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে যুক্তি প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে। সর্বোত্তম আল্লাহপাকের অস্তিত্ব উপলব্ধি করা যায় এ যুক্তির মমার্থ থেকে। কেননা সপ্তম শতাব্দীতে মাকড়সার বাসা নির্মাণ কৌশল মানুষের জ্ঞানের আওতায় ছিল না। মাকড়সা বাসার দুর্বলতা এবং ভঙ্গুরতা সকলেই উপলব্ধি করতে পারেন। অথচ তারা এ অনিশ্চিত বাসস্থানকে আশ্রয়স্থল হিসাবে গ্রহণ করে থাকে। কোরআনের বক্তব্য হলো, যারা আল্লাহ ব্যতিরেকে অন্য কাউকে প্রভু হিসেবে গ্রহণ করে কিংবা আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে অংশী স্থাপন করে তাদের অবস্থানও মাকড়সার বাসস্থানের মতো দুর্বল ও ভঙ্গুর।

"যারা আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে তাদের রক্ষক হিসেবে গ্রহণ করে তাদের অবস্থা সেই মাকড়সার মতো, যে নিজের জন্য একটি ঘর নির্মাণ করে। সত্যি বলতে কি মাকড়সার ঘর হলো খুবই ভঙ্গুর আবাসস্থল। কিন্তু তারা যদি তা জানত।" (আনকাবুত-৪১)।

আল্লাহপাকের সৃষ্টি জগতে মাকড়সার বাসস্থান অতি বিস্ময়কর নিদর্শন। এ ছোট্ট প্রাণীর শরীরে আছে সিল্ক গ্রন্থি,এ গ্রন্থি থেকে এক ধরনের চটচটে আটালো রস বের হয়। যা শরীরের পেছনে অবস্থিত অতি সূক্ষ্ম নল দিয়ে বেরিয়ে আসে। বাতাস লাগার সাথে সাথে তা শুকিয়ে সুতার মতো সরু হয়ে যায়। এ সুতা দিয়েই মাকড়সা জাল তৈরি করে। জাল তৈরির পদ্ধতি অতিশয় অভিনব, যার বৈশিষ্ট্যপূর্ণ প্যাটার্ন ও জ্যামিতিক গঠন-কাঠামো দর্শনে সকলেই মুগ্ধ হয়ে যান। জাল তৈরির জন্য মাকড়সা প্রথমে একটি ভাল জায়গা পছন্দ করে নিয়ে বৃত্তের কেন্দ্রের মতো একটি নির্দিষ্ট বিন্দু থেকে সাইকেলের স্পোকের মতো সরলরেখা ছড়িয়ে দেয়। তারপর সুতাগুলি দিয়ে চক্রাকারে চাকা তৈরি করে। এভাবে জাল বোনা শেষ হয় এবং সে জালের ভেতর থেকে একটা সুতা নিয়ে কিছুটা দূরে গিয়ে সূতাটা ধরে বসে থাকে শিকারের অপেক্ষায়। জালে কোন পোকা পড়লে তখন মাকড়সার হাতে ধরা সুতায় টান পড়ে। এ টান পড়ার সাথে সাথে সে জালের দিকে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসে

www.pathagar.com

এবং আরো জাল তৈরি করে চতুর্দিক থেকে পোকাটাকে জড়িয়ে ফেলে এবং হুল ফুটিয়ে পোকাটাকে মেরে খেয়ে ফেলে। আবার, প্রাকৃতিক দুর্যোগ কিংবা প্রতিকূল অবস্থায় অথবা বিশ্রাম গ্রহণের জন্য মাকড়সা জালের নীচে আশ্রয় গ্রহণ করে যদিও এটা ক্ষণস্থায়ী ও দুর্বল বাসস্থান।

[একটি বিষয় জেনে রাখতে হবে শুধু মেয়ে মাকড়সাই জাল বুনতে পারে। সেজন্য পবিত্র কোরআনে 'আনকাবুত' শব্দটি Feminine gender হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে।]

পর্যটনের শিক্ষা দিয়েছে পাখি

"পৃথিবীতে এমন কোন প্রাণী নেই এমন কোন পাখি নেই, যারা তোমাদের মতো গোত্র রচনা করেনি।" (আনআম-৩৮)।

পাখি পৃথিবীর সর্বত্র ব্যাপকভাবে বিস্তৃত। উষ্ণ রক্ত বিশিষ্ট মেরুদণ্ডী প্রাণীদের এক শ্রেণি এ বর্তমানে জীবিত প্রায় ৯০২২টি প্রজাতি বিশ্বজুড়ে ছড়িয়ে রয়েছে। উড়বার ক্ষমতাহীন একদল বড় আকারের পাখিকে সামগ্রিকভাবে র‍্যাটাইটিস বলা হয়। উটপাখি, এমু, রিয়া, কিউই এবং টিনামোয়াস সহ এসব পাখি একই গোত্র থেকে উদ্ভুত বলে মনে করা হয়। এরা প্রজনন ক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে। ডিম দেয়। বাচ্চা দেয় এবং এদের একটা সমাজ বা গোষ্ঠীবদ্ধ জীবন (Community) সৃষ্টি করে। আন্তর্জাতিক নেটওয়ার্ক গড়ে তোলেছে যেসব পাখি তাদেরকে পরিযায়ী পাখি Migratory bird বলা হয়। পাতারি হাঁস), পীং-হাঁস ছোট লালশিল গিরিয়া হাঁস, পান্তামুখী .রাঙামুড়ি, ভুতি হাস, বামুনিয়া হাঁস, চকা-চকি, কোয়েল, ইন্ডিগো বান্টিংস এবং বিভিন্ন প্রজাতির কবুতর মাইগ্রেটরী পাখি হিসেবে পরিচিত। এরা পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে পরিযান করে এবং এদের দীর্ঘ উড়ন যাত্রায় একটি সামাজিক বন্ধন কাজ করে। এটা প্রতিষ্ঠিত সত্য যে, পরিযায়ী পাখিরা দলবদ্ধ হয়ে আকাশ পথে ভ্রমণ করে এবং একে অপরের সাথে ভাষা ও ভাব বিনিময় করে। ভাষা বলতে আমরা যে ভাষায় কথা বলি পাখিরা সেভাবে কথা বলতে পারে না। এরা নিজেদের মধ্যে ভাব আদান প্রদান করে আকার ইঙ্গিতে এবং পরস্পরকে বোঝার ক্ষমতা এদের আছে। এরা কতগুলি শব্দ, কিছু হাবভাব দিয়ে নিজেদের মনের ভাব প্রকাশ করে।

www.pathagar.com

অক্সিজেন সংরক্ষণকারী বিজ্ঞানী প্রাণী মরু জাহাজ উট

দুটি স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রাণীর সাধারণ নাম হলো উট। এ দুটি প্রজাতির একটি ব্যাকট্রিয়ান উট এবং অপরটি আরবীয় বা ড্রোমেডারি উট উভয়েই গৃহপালিত। ব্যাকট্রিয়ান উট ড্রোমেডারি উটের তুলনায় বেশি শক্তিশালী এবং দেহের গঠন ও অপেক্ষাকৃত ভারী ও মজবুত। ভারবাহী পশু হিসাবে এরা বেশি উপযুক্ত। তাই এদের বলা হয় Ship of the desert, এদের পিঠে থাকে চর্বিযুক্ত কলায় tissue তৈরি দুটি কুঁজ। একটি ঘাড়ের উপর অপরটি পিঠের কিছুটা পশ্চাদভাগে।

আরবীয় উট ব্যাকটিয়ান উটের চেয়ে লম্বা এবং পিঠে একটি মাত্র কুঁজ থাকে। মরুভূমিতে এ প্রজাতির দু'টি পৃথক জাত লক্ষ্য করা যায়। একটি প্রধানতঃ ভারবাহী, পণ্য দ্রব্যাদি পরিবহনের কাজে ব্যবহৃত হয়। অপরটি সামান্য হালকা গড়নের দ্রুত দৌড়াতে অভ্যস্ত। আরবকীয় উট মরু জীবনের জন্য চমৎকারভাবে অভিযোজিত। এদের প্রশস্ত পদ বালির উপর চলাচলের জন্য যেমন উপযুক্ত, তেমনি নাসারন্ধ্র সম্পূর্ণভাবে বন্ধ করার ক্ষমতা এবং সংবদ্ধ করার উপযোগী।

উটের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ শরীরবৃত্তিয় অভিযোজন হলো এদের দেহে পানি সংরক্ষণ ক্ষমতা। এটা মনে রাখতে হবে উট পানি মজুদ করে না বরং সংরক্ষণ করে। এ সংরক্ষণ প্রক্রিয়া খুবই বিস্ময়কর।

Duke Universityর প্রফেসার Kunt S. Nielson উটের উপর এক গবেষণা কর্ম পরিচালনা করে জানিয়েছেন, উটের নাসারন্ধ্রে পানির অণু গ্রহণকারী এক ধরনের ঝিলি (membrane) আছে। এ ঝিলি পানির অণু চুষে নিয়ে ধরে রাখে। উট যখন নিঃশ্বাস ছাড়ে এ ঝিলি পানির অণু বের হতে দেয় না। অন্য কোন প্রাণীর মধ্যে এ ধরনের কৌশলী ঝিলির ব্যবস্থা নেয়। উটের নাসারন্ধ্রের মধ্যে এ মেমব্রেন থাকার কারণে তা ৬৮% জলকণা সংরক্ষণ রাখতে পারে। তাই পানি পান না করেও উট অনেক দিন বেঁচে থাকতে পারে এবং একসঙ্গে ১৫ গ্যালন বা ৫৭ লিটার পর্যন্ত পানি পান করতে সক্ষম। উটের আর একটি দর্শনীয় কৌশল সম্প্রতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মরু ভূমিতে যখন ধূলিময় মরুঝড়

www.pathagar.com

উত্থিত হয় আর এ মরুঝড়ে কোন প্রাণী পড়লে তখন তার মৃত্যু ছাড়া কোন উপায় থাকে না। কারণ চতুর্দিক থেকে প্রচণ্ড বেগে বালির কণা এসে নাক, কান, চোখ আর মুখে প্রবেশ করে তাকে অবরুদ্ধ করে ফেলে। তখন শ্বাস রুদ্ধ অবস্থায় মৃত্যু অবধারিত হয়ে পড়ে। দীর্ঘযাত্রা পথে মরুভূমির উট যখন মরুঝড়ে পড়ে তখন সে হঠাৎ বালির মধ্যে একটা গর্ত করে বসে পড়ে এবং চোখ দুটি বন্ধ করে নাকসহ সমস্ত মুখমণ্ডল বালির গর্তে গুঁজে রাখে। এভাবে সে ১৫ দিন পর্যন্ত থাকতে পারে। এ ঘটনা লক্ষ্য করে গবেষকরা তার ফুসফুস ব্যবচ্ছেদ করে দেখেছেন যে, ফুসফুসের তলে একটি পাতলা আবরণী যুক্ত থলে আছে। ঐ থলের মধ্যে অক্সিজেন সংরক্ষিত থাকে। এ সংরক্ষিত অক্সিজেনের বদৌলতে অন্তত ১৫ দিন অক্সিজেন গ্রহণ না করে সে বাঁচতে পারে। তাই মরুঝড়ের সময় বালির গর্তে মুখ গুঁজে রেখে সে বেঁচে থাকে। সর্বোত্তম আল্লাহ তায়ালা উটকে মরুঝড়ের মধ্যে বেঁচে থাকার যে কৌশল শিক্ষা দিয়েছেন এবং দেহের মধ্যে অক্সিজেন সংরক্ষণের যে ব্যবস্থা করে দিয়েছে তা কি আশ্চর্যজনক!

"তারা কি উটগুলোর প্রতি লক্ষ্য করে দেখে না, কিভাবে তাদের সৃষ্টি করা হয়েছে? (সূরা আল-গাশিয়া-১৭)

উটের পশমে তৈরি হয় বস্ত্র, বিশেষ করে ওভারকোট অতি আরামদায়ক, হালকা এবং উষ্ণ। তাছাড়া এ পশম অবশ্য যথেষ্ট দামী। তাই অন্য প্রাণী থেকে সংগৃহিত পশমের মান বাড়াতে উটের পশম অনেক সময় মেশানো হয়।

www.pathagar.com

গৃহ পালিত পশু বা ক্যাটল ও গরম কাপড় তৈরি স্বাস্থ্য উপকরণ

"আর তিনি গবাদি পশু সৃষ্টি করেছেন, তোমরা তাদের থেকে পশমী কাপড় ও অনেক উপকার পেয়ে থাকো এবং তাদের মাংস তোমরা খাও। (নাহল-৫)।

আরবী আনআম শব্দের বহুবচন শব্দের অর্থ Cattle বা গবাদি পশু। এ শব্দ দ্বারা সকল চতুষ্পদ গৃহপালিত পশুকে বুঝায়। উট, গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগল সবই আনআম এর অন্তর্ভুক্ত। আবার উক্ত আয়াতে ব্যবহৃত দিফয়ু শব্দের অর্থ হলো উটের পশম থেকে নির্মিত গরম কাপড় যা পূর্বে আলোচনা করা হয়েছে। এছাড়া ভেড়ার পশম থেকেও গরম কাপড় এবং কম্বল তৈরি হয় যা অত্যন্ত আরামদায়ক, মসৃণ ও হালকা। আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক স্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন, গবাদি পশু থেকে আমরা যে উপকার পেয়ে থাকি তা তিন ভাগে বিভক্ত।

১। গবাদি পশুর মাংস ও দুধ
২। গবাদি পশুর চামড়া ও শিং
৩। গবাদি পশু ভারবাহী যান বাহন

১। গবাদি পশুর মাংস ও দুধ : মাংস ও দুধ আমরা গবাদি পশু থেকে লাভ করে থাকি। এ দুটি খাদ্য অত্যধিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ। উট, গরু, মহিষ, ভেড়া ও ছাগলের মাংসে উচ্চমানসম্পন্ন প্রোটিন, কার্বোহাইড্রেট carbohydrate, চর্বি fat ভিটামিন এবং অতি প্রয়োজনীয় এ্যামিনো এসিড বিদ্যমান। শারীরিক সুস্থতার জন্য এসব উপাদান অপরিহার্য। আর উল্লেখিত পশুদের দুধ সুষম খাদ্য হিসেবে সমাদৃত। কারণ দুধে ছয় প্রকার উপাদান তাকে। যথা, শর্করা, স্নেহ পদার্থ, ফেট, খাদ্যপ্রাণ, খনিজ লবণ ও পানি।

২। গবাদি পশুর চামড়া, ও শিং : গবাদি পশুর চামড়া থেকে তৈরি হয় গরম পোশাক, কম্বল, বই-পুস্তকের কভার, জুতা এবং এদের পশম পাকানো সুতা নির্মাণ করার কাজে ব্যবহৃত হয়। এ পাকানো সুতাকে বলা হয় উল -wool। উল দিয়ে বহুবিধ পশমী পোশাক তৈরি করা হয়। এ পোশাকগুলোর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হলো ওভারকোট, জাম্পার, মোজা মাফলার গোবস

www.pathagar.com

ও অন্যান্য পশমী সামগ্রী। আর গবাদি পশুর শিং থেকে চিরুনী বাঁট ও ঘর সাজাবার নানা রকম দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে।

৩। গবাদি পশু ভারবাহী : প্রাচীনকালে গবাদি পশু একস্থান থেকে অন্য স্থানে মাল বহনের কাজে ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হয়। আজকের দিনেও মরুভূমিতে উট ভারবাহী পশু হিসেবে সেখানকার জনমানুষের প্রয়োজন মেটায়। মধ্য এশিয়ার ব্যাকট্রিয়ান উট এবং মধ্যপ্রাচ্যের আরবীয় উট এখনো মরু ভূমিতে যাতায়াতের নির্ভরযোগ্য বাহন। কারণ তারা মরুঅঞ্চলের আবহাওয়ার সাথে সমন্বয় সাধন করে চলতে পারে। এদেরকে তাই মরুভূমির জাহাজ বলা হয়। পাহাড়ী এলাকায় ও পাহাড়ী অঞ্চলে ঘোড়া, গাধা, খচ্চর ও হাতি মালপত্র বহনের কাজে ব্যবহার হয়ে থাকে। শীতল মরু অঞ্চলের রুস্ট পরিবেশে বলগা হরিণ এবং ল্যাপ-ডগ ভারবাহী পশু হিসাবে কাজ করে। এ ছাড়া স্মরণাতীত কাল থেকে গরু মহিষকে জমি চাষের কাজের ব্যবহার করা হচ্ছে। এমনকি বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগেও পৃথিবীর বহু দেশে গরু, ষাড় উট ও ঘোড়াকে কৃষি কাজে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। অতএব, গবাদি পশু থেকে মানুষ যেসব সুবিধা ভোগ করে তা পরম হিতৈষী আল্লাহতাআলারই অশেষ অনুগ্রহ। এসব প্রাণী সৃষ্টি করা না হলে মানব জাতির সমৃদ্ধি কখনো ঘটতো না।

"আর এরা (আনআম) তোমাদের ভারী বোঝা একস্থান থেকে অন্য স্থানে বহন করে দিয়ে যায় যেখানে তোমরা প্রাণান্তকর ভ্রমণ ব্যতীত পৌছতে পার না। নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভু পরম দয়ালু ও পরম করুণাময়। (নাহল-৭)।

"তোমাদের আরোহনের জন্য এবং শোভার জন্য তিনি ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন। আর তিনি এমন বস্তু সৃষ্টি করেছেন যেগুলি সম্পর্কে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। (নাহল-৮)।

এ আয়াতে আরো তিনটি প্রাণীর নাম উল্লেখ করা হয়েছে যাদের বিশেষ গুরুত্ব এখনো বিদ্যমান। এরা হলো ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা। এসব প্রাণীকে আল্লাহপাক সৃষ্টি করেছেন আমাদের চড়ার জন্য।

ঘোড়া বা দ্রুত যান

ঘোড়া স্তন্যপায়ী প্রজাতির প্রাণীর নাম। সহজে পোষ মানে এবং বিভিন্ন কাজে ব্যবহারের জন্য ঘোড়াকে এখন তিনটি দলে শ্রেণি ভাগ করা হয়। যেমন– স্যাডল ও ঘোড় দৌড়ের জাত। ড্রাফট ব্রিড এবং হারনেস হর্স। কিছু কিছু ঘোড়া আছে যাদের সৌন্দর্য, সৌম্যতা ও দ্রুত গতির বিচারে উচ্চমানের। এসব ঘোড়া বিশেষভাবে সৌন্দর্য প্রদর্শনীতে দেখানো হয়ে থাকে। মাদি ঘোড়া ১-২ বছর বয়সে প্রজনন ক্ষমতা অর্জন করলেও সাধারণত তিন বছরের আগে এমনটি ঘটে না। প্রায় ১১ মাস গর্ভ ধারণের পর প্রতি বছর একটি বা দু'টি

www.pathagar.com

শাবক এরা প্রসব করে। ঘোড়ার সর্বোচ্চ আয়ু ৬০ বছর লিপিবদ্ধ করা হলেও গড় আয়ু ৩৫ বছর।

খচ্চর বা ভ্রমণ যান প্রাণী

বেজোড় ক্ষুরবিশিষ্ট খচ্চর Perissodactyla বর্গের সদস্য। খচ্চরের উপর চড়ে আরামদায়ক ভ্রমণ মধ্যপ্রাচ্যে একটি প্রচলিত প্রথা। আল্লাহপাকের সৃষ্টির মধ্যে এটা খুবই আশ্চর্যজনক বিষয় যে, পুরষ গাধা এবং স্ত্রী ঘোড়ার যৌন মিলনের মাধ্যমে সৃষ্ট সংকর সাধারণত বলা হয় হিনি (Hinny)। স্বাভাবিক নিয়মে কখনো সংকর সৃষ্টি হয় না। আর খচ্চর ও হিনি সাধারণত বন্ধ্যা হয়ে থাকে।

গাধা বা ভারবাহী যান The Donkey

গাধা স্বাভাবিকভাবে Perissodactyla বর্গের সদস্য। এরা এখন সমগ্র এশিয়া ও ইউরোপে গৃহপালিত এবং এদেরকে প্রধানত ভারবাহী প্রাণী হিসেবে পালন করা হয়। এরা কঠোর পরিশ্রমী। তবে ঠাণ্ডা পরিবেশের প্রতি সংবেদনশীল হওয়ার দরুন উষ্ণ আবহাওয়ায় এরা ভাল থাকে। এশিয়ার বন্য গাধা (Equas hemionus) অনেকগুলো সাধারণ নামে পরিচিত। ব্যাপক বিস্তৃতির কারণে এ প্রজাতিকে এখন কয়েকটি জাত অথবা উপজাতে ভাগ করা হয়েছে। মঙ্গোলিয়ার মধ্য এলাকায় এটি কুলান, ইরান ও ভারতে ওনাগার আর সবচেয়ে বড় আকারের যে জাতটি তিব্বত ও সিকিমে পরিব্যাপ্ত তা কিয়াং নামে পরিচিত।

অতএব, যখন থেকে মানুষ গাধাকে প্রাণীদেরকে যানবাহনের কাজে নিয়োজিত করেছে তখন থেকেই এদেরকে মডেল করে মানুষ যাতায়াতের ক্ষেত্রে কিছু যান্ত্রিক যান বিশেষ চিন্তার মাধ্যমে তৈরি করেছে। যেমন স্থলযান, জলযান ও আকাশযান। এগুলো এখন আধুনিক যুগের যানবাহন। বর্তমানে মহাকাশ ভ্রমণের যুগে শুধুমাত্র পৃথিবীতে কেন মহাশূন্যেও আরামদায়ক ও দ্রুত ভ্রমণের সুযোগ সৃষ্টি হয়েছে। ভবিষ্যতে মানুষ প্রযুক্তি জ্ঞানের বদৌলতে আরো অধিকতর উন্নতি সাধন করবে। অবশ্য এসব উন্নতির কথা এখন আমরা জানি না। যিনি জানেন তিনি সর্বময় মহাজ্ঞানী সর্বোত্তম আল্লাহপাক।

www.pathagar.com

রাসায়ন বিদ্যা ধর্ম ও মানব দেহ

আমাদের চার পার্শ্বের জগতে যত পদার্থ তা সংখ্যাহীন বা অসংখ্য। এক এক পদার্থের এক এক রকম বৈচিত্র্য। কোনো পদার্থ গঠন তরল, কেউ কঠিন, কেউ বা আবার গ্যাসীয়। উপাদান বা ধর্মের দিক থেকে তাদের স্বাতন্ত্রও লক্ষ্য করার মত। সুদূর প্রাচীন কাল থেকেই মানুষ খুঁজে চলেছে পদার্থের ধর্ম, গঠন আর উপাদান। পরীক্ষা-নিরীক্ষা চালানো হয়েছে তার বিভিন্ন বৈশিষ্ট্যের উপর। আদিকালে যে শাস্ত্র ছিল অনেকটা অন্ধকার, অচেনা, অজানা। আজ সেটাই হয়ে ওঠেছে অনেক বেশি আলোকিত। ফলে রসায়ন বিজ্ঞান নিয়ে আজ প্রশ্ন এবং কৌতুহলের শেষ নেই।

আরবী "কিমিয়া" শব্দের অর্থ বিজ্ঞান। কিমিয়া শব্দ থেকে chemistry শব্দের উৎপত্তি, যার প্রচলিত অর্থ রসায়ন বিজ্ঞান। অষ্টম শতাব্দির একদল মুসলিম বিজ্ঞানী যাঁরা Al-chemies নামে খ্যাত ছিলেন। মূলতঃ তাঁরাই সর্বপ্রথম রসায়ন বিজ্ঞানের দ্বার উন্মুক্ত করেছেন যা বিজ্ঞান আবিষ্কারের ইতিহাসে উল্লেখ আছে। সে সময়ে তাঁরা আবিষ্কার করেন যে, ভিন্ন দুটি ইলিমেন্ট রাসায়নিক বিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ করে এমন একটি কমপাউন্ড উৎপন্ন করে যার বৈশিষ্ট্য সম্পূর্ণ ভিন্ন। সমগ্র বিশ্বে এ যাবত ১০৬টি মৌলের সন্ধান মিলেছে। রসায়ন বিজ্ঞানে এসব মৌলিকে প্রকাশ করার জন্য প্রতীক (Symbol) ব্যবহার করা হয়। যেমন অক্সিজেনের প্রতীক O হাইড্রোজেনের H, হিলিয়ামের He সোডিয়ামের Na, কপারের Cu, ইত্যাদি। প্রতীকের সমষ্টিকে সংকেত (Formula) বলা হয় এবং যৌগকে প্রকাশ করার জন্য সংকেত ব্যবহৃত হয়। পানির সংকেত H_2O কার্বন ডাই অক্সাইডের সংকেত Co_2 সোডিয়াম ক্লোরাইডের সংকেত Nacl হাইড্রোক্লোরিক এসিডের সংকেত HCl ইত্যাদি। রাসায়নিক বিক্রিয়া নির্দেশের জন্য রসায়নবিদরা সংক্ষিপ্ত আকারে প্রতীক ও সংকেত ব্যবহার করেন। যেমন পানি বিয়োজিত হয়ে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন তৈরি করে। এর শব্দসমীকরণ, পানি=হাইড্রোজেন+অক্সিজেন। প্রতীক সমীকরণ : $2H_2O=2H_2+O_2$

সুতরাং আল কোরআন Chemistry বা রসায়ন বিজ্ঞানের উপর যে ব্যাপক তথ্য পেশ করেছে তা এ অধ্যায়ে সংক্ষেপে বিবৃত হয়েছে।

www.pathagar.com

মানব দেহের উপকরণ ও পানি ও প্রাণ

And Allah has created every animal from water. "আর আল্লাহ প্রত্যেক প্রাণী সৃষ্টি করছেন পানি থেকে। (নূর-৪৫) "আমরা প্রত্যেক জীবকে গঠন করেছি পানি দ্বারা। তারপরেও কি তারা বিশ্বাস স্থাপন করবে না? (আম্বিয়া-৩০)।

পানি হচ্ছে রসায়ন বিজ্ঞানের প্রাণ। শুধু রসায়ন বিজ্ঞান কেন আধুনিক জীব বিজ্ঞানীরাও এ সত্য মেনে নিয়েছেন যে, আদিতে প্রাণের উৎপত্তি ও বিকাশ ঘটেছে পানি থেকে। প্রাণের স্পন্দন জাগ্রত হয়েছে পানি থেকে।

যেমন প্রত্যেক প্রাণীর শরীর তৈরি হয়েছে–কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং নানা প্রকার খনিজ লবণ দিয়ে।

এসব মৌলিক উপাদানের রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে সৃষ্টি হয় প্রাণরস বা Protoplasm। প্রাণরসে ৯০% পানি থাকে এবং বাকী অংশে থাকে জৈব ও অজৈব পদার্থ। যেমন শর্করা, প্রোটিন ও স্নেহ পদার্থ। বিজ্ঞানীরা পানির সন্ধানে গ্রহ থেকে গ্রহে অভিযান চালিয়ে যাচ্ছেন। কারণ পানি পাওয়া গেলে প্রাণের সন্ধান মিলবেই। আজ পর্যন্ত কোন গ্রহে পানির অস্তিত্ব আবিষ্কৃত হয়নি। যদিও কোন কোন বিজ্ঞানী মঙ্গল গ্রহে পানি আছে মর্মে ধারণা প্রকাশ করেছেন। কারণ পানির স্রোত ধারায় মাটিও পাথর থাকলে তা কাত হয়ে যে দৃশ্য সৃষ্টি করে মঙ্গল পৃষ্ঠে সেরূপ চিহ্ন বিদ্যমান। সেজন্য মঙ্গলগ্রহে ব্যাপক অনুসন্ধান চালানো হচ্ছে।

And He created man from gushing water.

আর তিনি আল্লাহ যিনি লম্ফমান পানি থেকে মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (ফোরকান-৫৪)।

আরবী 'মাআ' শব্দ দ্বারা যেমন আকাশের পানিকে বুঝায় তেমনি নদী-সমুদ্রের পানিকেও বুঝায়। আবার এ মাআ শব্দ দ্বারা যে কোন তরল পদার্থকেও বুঝানো হয়।

মানুষের শরীরের বিভিন্ন অংশে অনেক রকম তরল পদার্থ আছে। যেমন, রক্ত, হরমোন,এনজাইম, বিভিন্ন প্রকার এসিড, প্রোটিন, ভিটামিন Seminal fluid, Follicular fluid, Genminal fluid ইত্যাদি।

www.pathagar.com

মানব শরীরের প্রত্যেকটি অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যেমন পেশী তন্ত্র, পাকস্থলী গ্রন্থি এবং কোষ সমূহ পানি দ্বারা সমৃদ্ধ। মানুষের শারীরিক ওজনের শতকরা ৭০ ভাগ পানি। রক্তের মধ্যেও ৯০% জল থাকে। রক্তে পানির হ্রাস বৃদ্ধি ঘটলে মানুষের মৃত্যু ঘটে। তাই পানির নাম জীবন।

আমাদের শরীরে পানির পরিমাণ হ্রাস পেলে মস্তিষ্কের হাইপোথ্যালামাসে অবস্থিত তৃষ্ণা কেন্দ্র (Thirst centre) সাথে সাথে গলায় সংকেত পাঠায়। ফলে কণ্ঠ সংকোচিত হয় এবং আমরা পানির তৃষ্ণা অনুভব করি। পৃথিবীর সৃষ্টির পর পরই আকাশ থেকে বৃষ্টি ধারা নেমে এসেছিল। এ বৃষ্টিধারা থেকে পানির উৎস নদী, সাগর, মহাসাগর সৃষ্টি হয়। বর্তমান পৃথিবীর সমস্ত সমুদ্রে মোট পানির আয়তন ১৩৭ কোটি ঘন কিঃ মিঃ।। পানির এ বিশাল ভাণ্ডার নদী-সমুদ্র, মেঘমালায় এবং বায়ুমণ্ডলে চক্রাকারে আবর্তিত হচ্ছে।

"তিনি আল্লাহ যিনি আকাশ বৃষ্টি বর্ষণ করেন, যা থেকে তোমরা পান কর এবং তা দিয়ে উদ্ভিদসমূহ উৎপন্ন হয়। যা তোমরা পশুদের খেতে দাও। (নহল-১০)

হাইড্রোজেন এবং অক্সিজেনের সমন্বয়ে সৃষ্ট পানি সকল প্রাণীর জীবন ধারণের জন্য মহামহিম আল্লাহ তায়ার বিশেষ রহমত। কোন রসায়ন বিজ্ঞানী কিংবা প্রাণী বিজ্ঞানী কি পৃথিবীর পানি ভাণ্ডার তৈরি করেছে? যদি তারা পারতো তাহলে মঙ্গল গ্রহে, চাঁদের দেশে পানির বন্যা প্রবাহিত করে না কেন?

"আচ্ছা, দেখতো, তোমরা যে পানি পান কর তা কি তোমরা মেঘ থেকে বর্ষণ কর, না কি আমিই বর্ষণকারী? (ওয়াকিয়া-৬৮-৬৯)।

www.pathagar.com

মানব দেহের আকার ও ধর্মীয় ব্যখ্যা

একজন সাধারণ মানুষ কখনো কি নিজের দিকে তাকায়? তার আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে সে কি চিন্তা ভাবনা করে? একটি মাত্র কোষ (Cell) থেকে কিভাবে এ বিশাল দেহ গড়ে ওঠেছে। বাহ্যিক অঙ্গসমূহের স্বয়ংক্রিয় সঞ্চালন এবং আভ্যন্তরীণ উদ্দীপনায় কেন দ্রুত সাড়া জাগে, কোন প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে শরীরের যে কোন অবস্থার বা পরিস্থিতির পরিবর্তন উপলব্ধি করা যায়!

জ্ঞানহীন এবং উদাসীন লোকেরা এসব বিষয়ে চিন্তা করে না বললেই চলে। কারণ তারা মনে করে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করেছি। শৈশব আর কৈশোর অতিক্রম করে যৌবনে পদার্পণ করব। তারপর সংসার জীবনে প্রবেশ করে আত্মীয়-স্বজন পরিবেষ্টিত পরিসরে কিছু দিন মুখরিত থাকব। সবশেষে মৃত্যু এসে টেনে নিয়ে যাবে। আল-কোরআন এ প্রকৃতির লোকদের পশুর সাথে তুলনা করেছে। কেননা যে জীবন চিত্র তারা ধারণ করে পৃথিবীতে বিচরণ করে তা পশুর জীবনের সাথে সম্পূর্ণ সামঞ্জস্যপূর্ণ।

পক্ষান্তরে, জ্ঞান সমৃদ্ধ পূর্ণ ঈমান দীপ্ত মানুষ অবশ্যই নিজের শারীরিক গঠন এর বিকাশ এবং এর কার্য নৈপুণ্যতা নিয়ে গভীর গবেষণা করে থাকে। যার পরিপ্রেক্ষিতে তাঁরা এ শরীরের স্রষ্টা মহান আল্লাহ তায়ালার সৃষ্টি কৌশল উপলব্ধি করতে সক্ষম হন। তাই আল-কোরআন একনিষ্ঠ বিশ্বাসী, জ্ঞানী এবং চিন্তাশীল লোকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছে,

"একনিষ্ঠ বিশ্বাসীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে যেমন অসংখ্য প্রমাণ তেমনি তোমাদের নিজেদের মধ্যেও রয়েছে অনেক নির্দেশনা। তারপরেও কি তোমরা তা দেখবে না? (যারিয়াত-২০/২১)

মানব দেহের কি কি নিদর্শন সমগ্র দেহকে সুগঠিত করেছে তা সংক্ষেপে উপস্থাপন করা হচ্ছে।

মানব শরীর নির্মাণ সূত্রঃ

মানব শরীর তৈরি হয়েছে, কার্বন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, নাইট্রোজেন এবং অনেক ধরনের খনিজ লবণ দিয়ে। এ মৌলিক পদার্থগুলোর নানা রকম ক্রিয়া

www.pathagar.com

বিক্রিয়ায় তৈরি হয়েছে প্রাণরস (Protoplasm)। প্রাণ রসের শতকরা ৯০% ভাগ পানি এবং বাকী অংশগুলি জৈব ও অজৈব পদার্থ। যেমন, প্রোটিন, স্নেহপদার্থ এবং নিউক্লিক এসিড।

প্রাণের সাড়া এসেছে যখন প্রাণরস দিয়ে, তখন তা দিয়ে তৈরি হয়েছে কোষ (Cell)। আর লক্ষ লক্ষ কোষ দ্বারা মানব দেহ গঠিত। শুধু গঠনগত নয় কোষ শরীরের কার্যগত একক। অর্থাৎ সমস্ত শরীরবৃত্তিয় কর্ম সম্পাদনের আসল প্রভাবক এ কোষ বা Cell. কিছু সংখ্যক কোষ যখন একই প্রজাতি থেকে উৎপন্ন হয়, একই গঠনের হয় এবং একই কাজ সম্পন্ন করে তখন তাদেরকে একসঙ্গে বলা হয় কলা (tissue)। কলা আবার বিভিন্ন রকমের আছে। যেমন,

দেহত্বক হচ্ছে আবরণী কলা (Epitheiial tissue)।

রক্ত, অস্থি হচ্ছে সংযোজক কলা (Connective tissue)।

মস্তিষ্ক, সুষুম্না কাজ হচ্ছে স্নায়ু কলা (Nervous tissue)।

আবার একটি কলা মিলে গড়ে ওঠেছে একাধিক অঙ্গ। যেমন মস্তিষ্ক, যকৃত, হৃদপিণ্ড, ফুসফুস, পাকস্থলী, বৃক্ষ ইত্যাদি। কয়েকটি অঙ্গ মিলে তৈরি হয়েছে তন্ত্র। প্রত্যেকটি তন্ত্রের সুনির্দিষ্ট কাজ আছে। যেমন–রক্ত সংবহন তন্ত্র রক্তের সাহায্যে বিভিন্ন উপাদান শরীরের বিভিন্ন অংশে পরিবহন করে।

শ্বসনতন্ত্র, অক্সিজেন ও কার্বন ডাই অক্সাইড আদান-প্রদানে, পৌষ্টিকতন্ত্র খাদ্য গ্রহণ ও হজমে সাহায্য করে।

আর পেশী, কংকাল তন্ত্রের সাহায্যে আমরা চলাফেরা করি এবং অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নাড়াচাড়া করি।

স্নায়ুতন্ত্র শরীরের সকল তন্ত্রের কর্মকাণ্ড নিয়ন্ত্রণ করে।

বিস্ময়ের বিষয় হচ্ছে, তন্ত্রগুলির কাজ আলাদা আলাদা ও সুনির্দিষ্ট। কিন্তু এরা একে অপরের উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল। একটি বিকল কিংবা অসুস্থ হয়ে পড়লে সমগ্র তন্ত্র প্রভাবিত হয়।

সুতরাং বিভিন্ন তন্ত্রের গঠনগত ও শরীরবৃত্তিয় কাজের সমন্বয়েই তৈরি হয়েছে মানব শরীর।

"তিনি আল্লাহ যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, অতপর তোমাকে সুবিন্যস্ত করেছেন, সুগঠিত করেছেন এবং সম্পৃক্ত করেছেন। তাঁর ইচ্ছামতো তোমার আকৃতি তৈরি করেছেন। (ইনফিতার-৭-৮)।"

এ আয়াতটি থেকে বুঝা যাচ্ছে, মানব দেহের বাহ্যিক আকর আকৃতি ও গঠন শৈলী নির্ধারিত পরিমাপের উপর প্রতিষ্ঠিত। সাধারণতঃ মানুষের দৈর্ঘ্য ১ থেকে ২ মিটারের মধ্যে সীমাবদ্ধ। এ দৈর্ঘ্যের আকার পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির সঙ্গে ভারসাম্যপূর্ণ। মানুষ যখন প্রথম পৃথিবীতে পদার্পণ করে তখন থেকেই সে পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বলকে নিজের মধ্যে আয়ত্ত করতে থাকে।

www.pathagar.com

নিউরন বা দেহ সংকেত যন্ত্র

বুদ্ধি ও অনুভূতির আধার মানব মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্রের প্রধান কেন্দ্রস্থল। মস্তিষ্ক বা Brain এক বিস্ময়কর সৃষ্টি কর্ম যার মধ্যে নিহিত আছে ১৪ বিলিয়ন নিউরন ১ Neuron। সমগ্র জীবদেহের মূল উপাদান হচ্ছে জীবকোষ বা Cell body। এ জীবকোষের মধ্যে সর্বোৎকৃষ্ট যে কোষ, যা দ্বারা ইন্দ্রিয়, পেশী, মস্তিষ্ক ও স্নায়ুমণ্ডল গঠিত হয়েছে, তার নাম নিউরন।

অগ্রমস্তিষ্ক (Prosencepthation) অঞ্চলে অবস্থিত থ্যালামাস ও হাইপোথ্যালামাস যা সংবেদী অঙ্গ থেকে আসা যে কোন সংকেত দ্রুত গ্রহণ করে এবং বুদ্ধি অনুভূতি, চিন্তা, ইচ্ছাশক্তি, উদ্ভাবনীশক্তি. চেতনাশক্তি, প্রভৃতি মানসিক বোধের নিয়ন্ত্রণ করে। বিজ্ঞানীরা হাইপোথ্যালামাসকে আবেগের কেন্দ্র হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। শরীরের আভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক উদ্দীপনার সংকেত যখন স্নায়ু তন্তুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছে তখন নিউরন তা গ্রহণ করে দ্রুত সিদ্ধান্ত প্রেরণ করে। যেমন দেহের কোন অংশ একটুখানি স্পর্শ করলে, কিংবা গরম বা ঠাণ্ডা অনুভব করলে অথবা কেউ চিমটি কাটলে সংশিষ্ট স্নায়ুতন্ত্র সাথে সাথে নিউরনকে সংকেত পাঠায়। Neuron অতি দ্রুত সিদ্ধান্ত দিয়ে দেয় হাত সরিয়ে নাও অথবা চিমটি কাটা স্থানে একটুখানি মেসেজ করে নাও। এটি কোন অধীত বিদ্যার ফসল নয় বরং নিউরন থেকে আসা সিদ্ধান্তের ফল, যা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সংগঠিত হয়। যদি কেউ পিন দ্বারা খোঁচা দেয় তখন কি ঘটে। পিনের খোঁচা বাহ্যিক উদ্দীপক (Stimulus)। ত্বকের গ্রাহক (Receptor) কোষ উদ্দীপনা গ্রহণ করে সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে পৌছায়। সেখান থেকে নির্দেশ আসে Motor nurve এর মাধ্যমে পেশীতে। তারপর হাত সরিয়ে নেয়া হয়। চলার পথে আপনি বিপদগ্রস্ত হয়েছেন। কিংবা কোন ভয়ানক জন্তুর সামনে পড়ে গেছেন। এমতাবস্থায় Neuron সিদ্ধান্ত দেবে, কারো সাহায্যের জন্য চিৎকার কর কিংবা একটি লাঠি হাতে নাও অথবা গাছ বেয়ে উপরে ওঠে যাও। এভাবে আমাদের বুদ্ধি, বিবেচনা এবং সিদ্ধান্ত প্রদানকারী স্নায়ুতন্ত্রের ক্ষুদ্রতম একক নিউরন।

অতএব নিউরন এতই বিস্ময়কর স্নায়ুকোষ যার বহুবিধ কার্যপ্রণালী বিজ্ঞানীদের আকুল পাথারে ফেলে দিয়েছে।

www.pathagar.com

কোরানিক সূত্র

"আমাদের নির্দেশনাসমূহ তোমাদের নিজেদের মধ্যে প্রতিভাত হবে। (হা-মীম ৫৩)"

"পৃথিবী জুড়ে রয়েছে একান্ত বিশ্বাসীদের জন্য অনেক প্রমাণ, আরো রয়েছে তোমাদের নিজেদের মধ্যে। তারপরেও কি তোমরা প্রত্যক্ষ করবে না?" (যারিয়াত ২০-২১)

মানুষের মস্তিষ্ক, স্নায়ুতন্ত্র, স্নায়ুতন্ত্রের একক নিউরনকে আল কোরআন 'আয়াত' (Sign) হিসেবে বর্ণনা করেছেন, যাতে করে জ্ঞানী লোকেরা এসব আয়াতের বিস্ময়কর তথ্যাবলি আবিষ্কার করে নেয়।

হৃৎপিণ্ড বা রক্ত পরিচালন যন্ত্র Hearts

মানব দেহের অসাধারণ সৃষ্টি হৃদপিণ্ড বা herats। হৃৎপিণ্ড দেহের সমস্ত অংশে রক্ত সঞ্চারণের জন্য পাম্প যন্ত্রের মতো কাজ করে। চলমান এ যন্ত্রটি দেহের বিভিন্ন অংশ থেকে শিরার (vein) মাধ্যমে আনীত রক্ত ধমনীর (artery) সাহায্যে শরীরের বিভিন্ন অংশে প্রেরণ করে। হৃৎপিণ্ড প্রতিটি সুস্থ মানুষের জীবদ্দশায় গড়ে ২৬০০ মিলিয়ন বার স্পন্দিত হয়ে প্রতিটি নিলয় (ventricle) থেকে প্রায় ১৫৫ মিলিয়ন লিটার বা দেড় লক্ষ টন রক্ত বের করে দেয়।

হৃদপেশী দ্বারা নির্মিত হৃৎপিণ্ড, যার মধ্যে রয়েছে চারটি প্রকোস্ট ও চারটি ভাল্ব। এটি সংকোচন (systole) এবং প্রসারণ (diastorle) প্রক্রিয়ায় শিরার মাধ্যমে দূষিত রক্ত টেনে আনে। এরপর উক্ত রক্ত পরিশুদ্ধ করে ধমনীর সাহায্যে শরীরের বিস্তৃত অংশে ছড়িয়ে দেয়। হৃৎপিণ্ডের সংকোচন ও প্রসারণ প্রক্রিয়ায় যে ছন্দময় স্পন্দন উদগত হয় তা জীবনের গতি সচল রাখে। এ স্পন্দন বন্ধ হলেই জীবনের সমাপ্তি ঘটে। প্রতিবার হৃদ স্পন্দনের সময় কতগুলো পর্যায়ক্রমিক পরিবর্তন ঘটে এবং পরবর্তী স্পন্দনের সময় তার পুনরাবৃত্তি হয়। এটাকে বলা হয় হৃদ চক্র বা cardiac cycle সুস্থ মানবদেহে হৃৎপিণ্ড প্রতি মিনিটে ৬০-৭০ বার অর্থাৎ গড়ে ৬৫ বার স্পন্দিত হয় এবং প্রতিটি চক্রে সময় লাগে মাত্র ০.৮ সেকেন্ডে।

"তিনি সে-ই মহান সত্তা যিনি তোমাদের জন্য কান, চোখ এবং হৃদয় সৃষ্টি করেছেন, অথচ তোমরা খুব কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (মুমিনুন-৭৮)।"

হৃৎপিণ্ডের কার্যপ্রণালী অত্যন্ত জটিল। দেহের ভিতরে রক্ত গতিশীল রাখায় হৃৎপিণ্ডের কাজ। শরীরের উর্ধ্বভাগ থেকে রক্ত সুপেরিয়র ভেনা ক্যাভা এবং নিম্নভাগ থেকে ইনফেরিয়র ভেনা ক্যাভার মাধ্যমে হৃৎপিণ্ডের ডান অলিন্দে। Right atrium) প্রবেশ করে। সেখান থেকে দক্ষিণ নিলয়ে বাহিত হয়। ফুসফুস

www.pathagar.com

থেকে O_2 সমৃদ্ধ রক্ত, দুটি ফুসফুসীয় শিরার মাধ্যমে বাম অলিন্দে পৌছায়। সেখান থেকে রক্ত বমি নিলয়ে চলে যায়। এটাই হার্টের আসল কর্মপ্রক্রিয়া। দক্ষিণ অলিন্দের গাত্রে এক ধরনের বিশেষ কোষ হার্টের পেসমেকার বা গতি নির্ধারক হিসেবে কাজ করে। এর নাম Sino Atrial node সংক্ষেপে S.A Node। হার্টের উপর দিয়ে প্রবাহিত বৈদ্যুতিক প্রবাহ বা ঢেউ এখান থেকে শুরু হয়। S.A. Node নষ্ট হয়ে গেলে আজকাল কৃত্রিম পেসমেকার লাগিয়ে রোগীকে কিছুদিন বাঁচিয়ে রাখা হয়। হার্টের স্বাভাবিক কর্মকাণ্ডের জন্য যে দুটি রক্তনালী দ্বারা রক্ত পৌছে ঐ দু'টি রক্তনালীর নাম করোনারী ধমনী। করোনারী ধমনীর অনেক শাখা প্রশাখা হৃৎপিণ্ডের পেশীর ভিতরে বিস্তার লাভ করে এবং কোষসমূহের স্বাভাবিক কাজ কর্ম ঠিক রাখে। কিন্তু হার্টের কাজকর্মে বিপত্তির কারণ করোনারী ধমনীতে উরুতে রয়েছে, যা কেটে নিয়ে ডাক্তারেরা হার্টে লাগিয়ে থাকেন নষ্ট করোনারী ধমনীর স্থলে। করোনারী ধমনী নষ্ট হয়ে যাবে। "আল্লাহ মাতৃগর্ভ থেকে তোমাদের বের করেছেন যখন তোমরা কিছুই জানতে না। তিনি তোমাদের কর্ণ, চক্ষু এবং হৃৎপিণ্ড দিয়েছেন যেন তোমরা তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (নাহল-৭৮)।

www.pathagar.com

চোখ ও ক্যামেরা

আমাদের চোখ আলোকের মধ্য দিয়ে দৃষ্টি সঞ্চার করে। দৃষ্টি সঞ্চারের সাথে অনেকগুলি আনুসঙ্গিক অঙ্গ জড়িত। যেমন
কর্নিয়া, স্ক্লেরা, আইরিস, কোরয়েড, রেটিনা, লেন্স, পিউপিল, Ciliary bodies, কনজাংটিভা, অ্যাকুয়াস হিউমার, Eyeglands ইত্যাদি। এসব অঙ্গের আচরণ ও কার্যপ্রণালী কিছু কিছু আবিষ্কৃত হলেও বেশির ভাগ অঙ্গের কার্যকারণ রহস্যময় রয়ে গেছে।
চোখের গঠন এবং দেখার পদ্ধতি অনুকরণে আবিষ্কার হয়েছে ক্যামেরা। আমাদের চোখের সামনে আছে একটি লেন্স। এ লেন্স কিছু বিশেষ ধরনের কোষ দিয়ে তৈরি ক্যামেরাতেও এমনি একটি কাঁচের লেন্স থাকে। এই লেন্সের মধ্যে কোন জিনিসের উপর থেকে প্রতিফলিত আলো ঢুকে ক্যামেরার ফিল্মে পড়ে। আর তার উপরে ঐ বস্তুর একটা উল্টো প্রতিবিম্ব তৈরি হয়। চোখের মধ্যে ফিল্মের কাজ করে রেটিনা। রেটিনার চার পার্শ্বে কালো রঙের একটি স্তর আছে। এর নাম কোরয়েড (choriod)। চোখে আলো প্রবেশ করে পিউপিল (pupil) দিয়ে। আলো বাড়া কমা নিয়ন্ত্রণ করে আইরিস (iris)। আবার রেটিনার আছে আলো গ্রহণকারী কোষ Photo receptor। এ কোষ দু'প্রকার। Cone এবং Rod। অধিক আলো এবং রঙিন আলোর অনুভূতি গ্রহণ করে কোন (Cone) গ্রাহক কোষ। আর কম আলোর অনুভূতি গ্রহণ করে বড় (rod) গ্রাহক কোষ। কোষগুলি আলোর অনুভূতি দ্রুত মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে (visula centre) প্রেরণ করার সাথে সাথে আমরা দেখতে পাই। প্রত্যেক জিনিসের ছবি রেটিনায় গিয়ে একটি উল্টা প্রতিবিম্ব তৈরি করে। কিন্তু মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রের সাহায্যে তা সোজা হয়ে যায়। অর্থাৎ মস্তিস্কে গিয়ে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবে সোজা হয়ে যায়।
চোখের বিষয়ে কোরানিক সূত্র
"আমরা কি তাকে দু'টি চোখ, একটি জিহ্বা এবং দুটি ঠোই দেইনি?" (বালাদ ৮-৯)"

প্রাণের উৎপত্তি

যে কোষ নিয়ে ক্লোনিং করা হয় সে কোষটির (ঈবষষ) মধ্যে অবশ্যই ভ্রূণ সৃষ্টির প্রয়োজনীয় উপাদান ও প্রাণ থাকে। আরবীতে প্রাণকে বলা হয় রূহ। রূহ নিয়ে বিজ্ঞানীরা অনেক গবেষণা করেছেন। কিন্তু কোন কিছু কূল কিনারা করতে

www.pathagar.com

পারেননি। ভবিষ্যতেও পারবে না। কেননা এ বিষয়ে মানুষকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে খুব সামান্য। রূহ সংক্রান্ত জ্ঞান আল্লাহ তা'লার তাঁর নিজের কাছে রেখে দিয়েছেন। তবে বিজ্ঞানীদের গবেষণা এখনো থামেনি। জার্মান রসায়ন বিজ্ঞানী Baron Von Riechenbach বলেছেন, মানুষ, গাছপালা ও পশু-পাখির শরীর থেকে বিশেষ এক প্রকার জ্যোতি বের হয়। বৃটিশ ডাক্তার ওয়াল্টার কিলনার উরপুধহরহ উুব রঞ্জিত কাছের ভেতর দিয়ে লক্ষ্য করেন, মানুষের দেহের চারপাশে ৬-৮ সেন্টিমিটার পরিমি স্থান জুড়ে একটি উজ্জ্বল আলোর আভা মেঘের মতো ভাসে। এরপর সাবেক সোভিয়েত বিজ্ঞানী আলেকজান্ডার গুরভিচ আবিষ্কার করেন যে, জীবন্ত সব কিছু থেকে বিশেষ একটি শক্তি আলোর আকারে বের হয় যা খালি চোখে দেখা যায় না। কিরলিন ফটোগ্রাফির মাধ্যমে প্রাণী দেহের বিচ্ছুরিত এ আলোক রশ্মির ছবি তোলা হয় যার উৎস হচ্ছে রূহ বা প্রাণ।

অতএব রূহ সংক্রান্ত বৈজ্ঞানিক গবেষণার সীমা এখানেই শেষ। অর্থাৎ 'রূহ' বিষয়ক গবেষণা তেমন অগ্রসর হবে না।

পৃথিবীতে প্রাণের উৎপত্তিগত তত্ত্ব থেকে এটা স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, প্রাণ সম্পর্কিত কোন বিষয় এখন আর অনুদঘাটিত নেই। ডঃ মরিস বুকাইলি তাঁর The Origin of Man গ্রন্থে মলিকুলার বায়োলজির (Molecular Biology) একজন প্রখ্যাত বিজ্ঞানীর উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, "জীবনের আদি উৎসের ব্যাপারটা এখন আর আদৌ কোন গবেষণাগারের পরীক্ষা-নিরীক্ষার বিষয় নয়। কেননা প্রাণের আদি উৎস সংক্রান্ত সব রহস্যই উদঘাটিত হয়েছে। এ ধরনের বক্তব্যের অর্থ এতোই পরিষ্কার যে, এর থেকে অনায়াসেই ধরে নেয়া চলে প্রাণ সম্পর্কিত এমন কোন বিষয় নেই যা এখন মানুষের অজানা।

সম্প্রতি বায়োক্যামিস্ট্রি ও বায়োফিজিয়ানদের দ্বারা প্রচুর পরীক্ষা-নিরীক্ষা পরিচালিত হচ্ছে। এসব পরীক্ষা-নিরীক্ষার উদ্দেশ্য হলো Cell বা জীবকোষে যে নির্দিষ্ট সংখ্যক কেমিক্যাল কম্পাউন্ড বা রাসায়নিক সংমিশ্রণ রয়েছে তার সমন্বয় প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে কিভাবে জীবনের স্ফূরন ঘটে তা প্রত্যক্ষ করা। কিন্তু রাসায়নিক সংমিশ্রণ যে কিভাবে সংগঠিত হয়ে জীবকোষ সৃষ্টি করে সে বিষয়টা অত্যন্ত জটিল। তবুও এ পরীক্ষা নিরীক্ষায় গবেষক বিজ্ঞানীদের কোন ক্লান্তি নেই। কিছু সংখ্যক গবেষকের অভিমত এসব কেমিক্যাল কম্পাউন্ড প্রকৃতির অনুকূল প্রভাবে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অথচ সংগঠিত প্রক্রিয়ায় পারস্পরিক সম্মিলন ঘটায় এবং তার কারণে সৃষ্টি হয় সেই অভূতপূর্ব জটিল বস্তুটি, যাকে আমরা জীবকোষ বলি।

১৯৫৫ সালে রসায়ন বিজ্ঞানী এস এল মিলার একটি জটিল কেমিক্যাল কম্পাউন্ড–উদ্ভাবন করেন এবং এ রাসায়নিক মিশ্রণটি আবিষ্কার করেই মিলার মনে করতে শুরু করেন যে, প্রাণ বা জীবনের সূত্র তিনি আবিষ্কার করে ফেলেছেন। তার আবিষ্কৃত রাসায়নিক বস্তুটির নাম 'এ্যামিনো এসিড'। এটি জীবকোষের প্রোটিন মধ্যস্থিত একটি উপাদান। স্কীম (H2O) মিথেন (CH4), অ্যামোনিয়া (NH3)ও হাইড্রোজেন (H2) সমন্বয়ে গঠিত একটি গ্যাসীয় পরিবেশে বৈদ্যুতিক আলোর

www.pathagar.com

তীব্র ঝলক দিতে গিয়ে মিলার এ উপাদানটি পেয়েছিলেন। ঐ উপাদানটির মূল সৃষ্টি কিভাবে ঘটেছিল তার কোনো ব্যাখ্যা তিনি দিতে পারেননি। তাছাড়া দুইশ কিংবা তিনশ কোটি বছর পূর্বে মাটির এই পৃথিবীতে এ ধরনের অনুকূল পদ্ধতিতে সমন্বিত গ্যাসের কোনো অস্তিত্ব ছিল কিনা, মিলারের আবিষ্কারে সে রকম কোন ধারণাও আমরা পাচ্ছি না। অথচ এ ধরনের কোনো অজানা ধারণার উপরে বৈজ্ঞানিক কোনো থিওরী দাঁড় করানো চলে না। সুতরাং প্রাণের উৎপত্তিগত মিলারের এ তত্ত্বের বিরুদ্ধে বিরোধিতার ঝড় উঠেছিল।

বিজ্ঞানী P.P Grashe তার The Evolution of living organism গ্রন্থে বহু প্রাচীন প্রাণের অস্তিত্ববাহী জীবন্ত কিছুর নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার কথা বলেছেন। যেমন ট্রান্সভাল এলাকার পাহাড়ী অঞ্চলে মোটামুটিভাবে ৩২০ কোটি বছর আগে সংগঠিত প্রাণ তথা জীবন্ত কিছুর অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এসব নিদর্শন ছিল অনেকটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র ব্যাকটেরিয়ার মতো অথবা এ্যামিনো এসিডের অণুর মতো। এগুলি এতোই ক্ষুদ্র যে এর এক একটি ছিল এক মিলিমিটারের দশ সহস্র ভাগের এক ভাগ কিংবা তার চেয়েও ক্ষুদ্র।

এসব প্রাণই হয়ত এমিনো এসিড কিংবা সাগরের পানিতে প্রোটিনের জন্ম দিয়ে থাকবে। অপরাপর অণুজীবের অস্তিত্ব ক্লোরোফিলযুক্ত সিয়ানোফিলাস অ্যালজের পলিতে থাকা সম্ভব।

পরবর্তী উপাদানটি সালোক সংশেষণে (photosynthesis) ব্যবহৃত হয়। এই ফটোসিনথেসিস প্রক্রিয়ায় আলোর প্রভাবে উৎপাদিত যে সাধারণ বস্তুর উদ্ভব ঘটে তা থেকে কমপেক্স অর্গান কম্পাউন্ড সৃষ্টি হতে পারে। কানাডায় লেক সুপারিয়রে অপেক্ষাকৃত আধুনিক কালে গড়ে ওঠা পাথুরে আগাছা অ্যালজের ফসিলের অনুরূপ ফিলামেন্টাস ব্যাকটেরিয়ার অস্তিত্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এই ব্যাকটেরিয়ার গঠন কাঠামো ক্ষতিপয় অ্যালজের গঠন কাঠামোর মতো খুবই সরল। অনেকটা জীবকোষের মতো। অনুরূপ নমুনা মধ্য অস্ট্রেলিয়ার পাথুরে কাঠামোতেও পাওয়া গেছে। এই পাথুরে কাঠামো গড়ে ওঠেছে প্রায় শত কোটি বছর পূর্বে। সময়ের এই যে ব্যবধান এর মধ্যেই হয়ত ভিন্ন ধরনের কোনো অ্যালজে সত্যিকার জীবকোষ (Cell) জন্ম দিয়ে থাকবে। সেই Cell এর যেমন নিউক্লিয়াস ও ক্রোমোজোম ছিল তেমনি তার মধ্যে ছিল DNA (Deoxyribonucleic Acid) অবশ্য এই অ্রালজে সম্পর্কে বহু তথ্য এখনো অজানা রয়ে গেছে। এরপর ঘটে বহুকোষী অবস্থার আগমন। তবে জীবজগতে এককোষ থেকে বহুকোষী অবস্থায় পৌছানো। সেই ধারাবাহিকতার মধ্যেও রয়েছে বিরাট ব্যবধান।

সুতরাং উপরোক্ত আলোচনায় দুটি মৌলিক বিষয় ফুটে ওঠেছে। যেমন

১। আদি প্রাণের উৎস হলো পানি বা সাগর।

২। নতুন নতুন প্রাণকোষের আগমনের কারণে একের সাথে অপরের সমন্বয় ঘটেছে। এক কাঠামো থেকে আর এক কাঠামোর রূপ পরিগ্রহ করেছে। এভাবে গোটা ব্যাপারটাই ক্রমান্বয়ে জটিলতার পর্যায়ে পৌছেছে।

www.pathagar.com

বিশিষ্ট জীব বিজ্ঞানী ডঃ মরিস বুকাইলি বলেছেন, প্রাণের উৎপত্তিগত তত্ত্ব ও তথ্য যাই হোক না কেন প্রাণ কিন্তু প্রথম আবির্ভূত হয়েছিল পানিতেই। আধুনিক গবেষণায় প্রমাণ হয়েছে যে, পানি ব্যতিরেকে জীবন ধারণ অসম্ভব। গ্রহান্তরে জীবনের বা প্রাণের সন্ধান করতে গিয়ে প্রথম যে প্রশ্নটি আসে তা হলো সেখানে পানির কোন অস্তিত্ব আছে কিনা।

আদিতে যে প্রাণের বিকাশ ঘটেছিল তার গঠন কাঠামো এখনকার একটি Cell এর মতো তেমন জটিল কিছু ছিল না। তথাপি সে সময়েও সেই প্রাণকে বেঁচে থাকার জন্য শক্তির উৎপাদন ও লেনদেন প্রক্রিয়া অপরিহার্যভাবে চালু রাখতে হয়েছিল। পৃথিবীর বুকে প্রথম যে জীবন্ত প্রাণ, তা আজকের যুগের আবিষ্কৃত ব্যাকটেরিয়া কিংবা তার অনুরূপ ছিল কিনা তা নিশ্চিত করে বলা অসম্ভব। কিন্তু আজকের যে ব্যাকটেরিয়া আদিতে তা ছিল খুবই সরল ও সাধারণ। এখন সেই ব্যাকটেরিয়ার জীবন ক্রমান্বয়ে জটিলতা প্রাপ্ত হয়েছে।

আজকের ব্যাকটেরিয়ায় রয়েছে হাজার হাজার অণুকোষ তার মধ্যে রয়েছে অণু গঠনের প্রক্রিয়া এবং সেই প্রক্রিয়ার পদ্ধতি সংখ্যাও অগণিত। আর সেই ব্যাকটেরিয়া নিজে নিজেই তার টিকে থাকার উপযোগী উপাদান সংশেষিত করে নিয়েছে। এভাবেই সে শুধু বেড়ে ওঠেনি। বরং একই সঙ্গে বংশবৃদ্ধির (reproduction) কাজও চালিয়ে গেছে। এককোষী জীবমাত্রই অ্যামিবার মতোই নিজে নিজে বিভক্ত হওয়ার উপাদানে পরিগণিত। যদিও এ এককোষী প্রাণী এতো ক্ষুদ্র যে তা এক মিলিমিটারের সহস্রভাগের এক ভাগ মাত্র। তবুও তার গঠন প্রকৃতি আশ্চর্যজনকভাবে জটিল। এ ধরনের এককোষী প্রাণীর গঠন প্রকৃতির মৌল উপাদানে রয়েছে এমন এক উপাদান যাকে বলা হয় সাইটোপ্লাজম। এরও রাসায়নিক সংগঠন যথেষ্ট জটিল। এ রাসায়নিক পদার্থের মধ্যে রয়েছে নিজে নিজে বিভক্ত হওয়ার বহুবিধ উপাদান। এর মধ্যে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ হলো নিউক্লিয়াস। নিউক্লিয়াসে রয়েছে আবার ভিন্ন ভিন্ন জটিল অংশ। এর মধ্যে রয়েছে ক্রোমোজোম, (Chromosome), যার অংশে আছে জিন (Gene) নামক পদার্থ। এ জিন জীবকোষের প্রতিটি অংশ ও উপাদানের নিয়ন্ত্রক। জিন একটা সিস্টেমের মধ্য দিয়ে কোষের উপাদান সমূহের নিকট নির্দেশ সরবরাহ করে থাকে। শুধু সরবরাহ কেন। কোন কোন তথ্য যন্ত্র যেভাবে এক সঙ্গে তথ্য প্রেরণ ও তথা গ্রহণ করে জিনের নিয়ন্ত্রণমুখী নির্দেশক কার্যক্রমের ধারা পদ্ধতি হুবহু সে রকম। এ কাজে যে রাসায়নিক উপাদানটি জিনকে সাহায্য করে তার নাম DNA। এই DNA ও আবার এককোষী এবং এর গঠন প্রণালীও বেশ জটিল। এ যে জটিল নিউক্লিক এসিড DNA যা আসলে 'দুত' হিসেবে জিনের নির্দেশ আদান প্রদান করে থাকে, তা অপর আর একটি এককোষী পদার্থের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এ পদার্থের নাম Ribonucleic Acid সংক্ষেপে RNA। এভাবে একটি এককোষী অনুজীব তথা জীবকোষের মধ্যে বহুমুখী জটিল ক্রিয়া প্রক্রিয়া অব্যাহত থাকে এবং এরই মধ্যস্থিত অতি সাধারণ রাসায়নিক উপাদান থেকে নতুন এক প্রোটিন সৃষ্টির কাজ নিশ্চিত করে। এ ক্রিয়াকে বলা হয় সিনথেসিস অব প্রোটিন।

www.pathagar.com

অতএব, আধুনিক জ্ঞান বিজ্ঞানের তথ্য প্রমাণ দ্বারা এ সত্য আজ প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে প্রতিটি জীবন্ত সৃষ্টির উৎপত্তি ঘটেছে পানি থেকেই। পানির রাসায়নিক ক্রিয়া কর্মের মাধ্যমে প্রাণের উৎপত্তির বাস্তবতা একট অতি সহজ সরল উপলব্ধি। আল কোরআন ৭ম শতাব্দীতে এ তথ্যই পেশ করেছে।

We made from water every living thing. Will they not then believe?

"আমরা প্রতিটি জীবন্ত জিনিসকে পানি থেকে তৈরি করেছি। এরপরেও কি তারা বিশ্বাস করবে না? (আম্বিয়া-৩০)।"

আল্লাহপাক পানি থেকে গোটা প্রাণী জগত সৃষ্টি করেছেন। এদের মধ্যে কিছু কিছু প্রাণী পেটে ভর দিয়ে চলে, কিছু দু'পায়ে ভর দিয়ে হাঁটে এবং কিছু চার পায়ে হাঁটে। আল্লাহ তাআলা যা ইচ্ছা করেন তা-ই সৃষ্টি করতে পারেন। আসল কথা হলো তিনি সকল বিষয়ের উপর ক্ষমতাবান। (নূর-৪৫)।

উপরোক্ত দু'টি আয়াতে যে বক্তব্য রাখা হয়েছে তার একটি অর্থ এই হতে পারে যে, জীবন্ত সব কিছুই সৃষ্টি হয়েছে পানি দ্বারা। অর্থাৎ জীবন্ত বস্তু সৃষ্টির কাজে পানি হলো অপরিহার্য উপাদান। অথবা এর আর এক অর্থ হতে পারে যে, প্রতিটি জীবন্ত কিছুর উৎপত্তি ঘটেছে পানি থেকেই। এভাবে যে অর্থই করা হোক না কেন সব অর্থই বৈজ্ঞানিক প্রতিষ্ঠিত সত্যের সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

একথা সকলেই জানে যে, পৃথিবীতে প্রাণ তথা জীবনের প্রাচীনতম নিদর্শনের প্রথম হলো উদ্ভিদ জগত। পৃথিবীর প্রাচীনতম যুগ ক্যামব্রিয়ান (Cambrian) নামে পরিচিত। সেই ক্যামব্রিয়ান আমলেও আগে এক ধরনের সামুদ্রিক শৌরা বা আগাছার অস্তিত্ব ছিল যেগুলি অ্যালজে নামে পরিচিত, যা পূর্বে উল্লেখ করেছি। প্রাণী জীবনের আবির্ভাব ঘটে এর কিছু কাল পরে। আর সে প্রাণী জীবনেরও আবির্ভাব ঘটেছিল সমুদ্র থেকে।

উপরে আয়াতদ্বয়ে যে 'মাআ' শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে তার অর্থ পানি। এর দ্বারা যেমন বৃষ্টির পানি বুঝায় তেমনি সমুদ্রের পানিকেও বুঝায়। শুধু তাই নয় এই 'মাআ' দ্বারা যে কোন তরল পদার্থকেও বুঝানো হয়ে থাকে। বলাবাহুল্য এই 'মাআ' জীবনের একক জীবকোষের (Cell) অপরিহার্য উপাদান।

বাক বচন, নিদ্রা ও ধর্ম

প্রায় ১২০ বছর পূর্বে মনোবিজ্ঞানের জন্ম। ১৮৭৯ সালে জার্মানির লিপজিগ বিশ্ববিদ্যালয়ে মনস্তত্ত্ব গবেষণাগার প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর মনস্তাত্ত্বিক তত্ত্বগুলি পরীক্ষা নিরীক্ষা শুরু হয় এবং বিজ্ঞানের একটি শাখা হিসেবে Psychology আত্মপ্রকাশ করে। গ্রীক শব্দ Psyche (মন) এবং Logos (বিজ্ঞান) থেকে Psychology শব্দের উৎপত্তি, যার আভিধানিক অর্থ মনোবিজ্ঞান।

বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, মনোবিজ্ঞান "হলো মানুষের আচরণগত বিষয়নিষ্ঠ বিজ্ঞান, যা জীবনব্যাপী মানসিক প্রক্রিয়ার বিশেষণ এবং সহজাত নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করে। এটি মনুষের আচরণ ও বিকাশের গতি-প্রকৃতি সম্পর্কিত বিজ্ঞান। আচরণ ও এর বিকাশ সম্পর্কে জ্ঞানের অভাবনীয় প্রসারের ফলে বিকাশগত মনোবিজ্ঞান। বিকাশগত মনোবিজ্ঞানের আওতাভুক্ত বিষয়গলি হলো প্রত্যক্ষণ, অনুধাবন, মনোক্রিয়ার দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, সামাজিক মিথস্ক্রিয়া ইত্যাদি।"

www.pathagar.com

কথা সেন্টার ও ডারউইনের বির্বতনবাদ

মনস্তত্ত্ব বিজ্ঞানের কেন্দ্রীয় বিষয় 'মানুষ' (Man)। মহানুভব স্রষ্টা কর্তৃক প্রদত্ত মানুষের বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো, তার কথা বলার ক্ষমতা। কিন্তু কোন বৈশিষ্ট্যের নিরিখে মানুষ কথা (speech) বলে? এক্ষেত্রে মস্তিষ্কের ভূমিকা সর্বাধিক। কথা বলার সহায়ক দু'টি পদ্ধতিগত বৈশিষ্ট্য মানুষের কণ্ঠে সম্পৃক্ত করা হয়েছে যা মস্তিস্ক (brain) দ্বারা নিয়ন্ত্রিত। তার একটি হলো Phonoation অপরটি Articulation।

Phonoation: এ পদ্ধতিতে স্বর যন্ত্রের স্বর পর্দার (Vocal cord) সাহায্যে শব্দতরঙ্গ ও কম্পন সৃষ্টি হয়।

Articulation : এ পদ্ধতিতে ঠোঁট, জিহ্বা, মুখবিবর, মাংসপেশী, তালু প্রভৃতি অঙ্গের সহ্চারণ দ্বারা শব্দউচ্চারণরিত হয় এবং সাথে সাথে তা ডেলিভারী হয়। প্রয়োজনীয় কথা তৈরির জন্য সংশিষ্ট অঙ্গ থেকে স্নায়ু তন্তুর মাধ্যমে সংকেত প্রেরিত হয় মস্তিস্কের একটি কেন্দ্রের, যার নাম "Speech centre". উপরন্তু কথা বলার সাথে জড়িত অঙ্গসমূহের নড়াচড়া (movement) নিয়ন্ত্রণ করে মস্তিস্কের যে অঙ্গ, তার নাম 'ব্রোকার জোন'। বিজ্ঞানীরা বলে থাকেন, মস্তিস্কের 'ব্রোকার অঞ্চল' মানুষকে সবাক করেছে। অন্য কোন প্রাণীর মস্তিস্কে ব্রোকার অঞ্চলের সন্ধান মেলেনি। তাই তারা কথা বলতে পারে না।

ডারউইনের বির্বতনবাদ তত্ত্বটি যেসব কারণে মিথ্যা প্রমাণিত হয়েছে তার একটি কারণ এই যে, যদি গরিলা, শিম্পাঞ্জি কিংবা বানরের বিবর্তন থেকে মানুষ সৃষ্টি হতো তাহলে অবশ্যই ঐসব প্রাণীর মস্তিষ্কে ব্রোকার অঞ্চলের সন্ধান পাওয়া যেত।

অতএব, কথা বলার বিশেষ শিল্প নৈপুণ্যতা কেবল মানুষের মস্তিস্কে এবং স্বর যন্ত্রে সম্পৃক্ত রয়েছে। এ বিষয়ে আল্লাহতা'য়ালা বলছেন,

"তিনি (আল্লাহ) মানুষ সৃষ্টি করেছেন এবং তার মধ্যে কথা বলার কৌশলগত শিক্ষা দান করেছেন। (রহমান ৩-৪)"

সুন্দর করে কথা বলা এক প্রকার আর্ট

হৃদয়ের অনুবভতি উপমা ও অনুপ্রাস দ্বারা ব্যক্ত করার জন্য স্বরযন্ত্র থেকে উৎসারিত শব্দ সমষ্টি-ই ভাবের উন্মেষ ঘটায়। অন্তর্নিহিত চিন্তা-চেতনা,

www.pathagar.com

আবেগ-উচ্ছ্বাস এবং আবেদন-নিবেদন বিপুল প্রসারী কথার রেণুতে প্রকাশ পায়।

বর্ণিত প্রকাশ ভঙ্গির তাৎপর্যগত আদর্শের মাধ্যমে। যেমন বড়দের সাথে, পিতা-মাতার সাথে এবং শিক্ষকদের সাথে কথা বিনিময় করতে হবে শ্রদ্ধা জড়িত কণ্ঠে। প্রতিবেশির সাথে আত্মীয়-স্বজনের সাথে কিংবা বন্ধুর সাথে বাক্য বিনিময় হবে সম্প্রীতির সুরে। আর ছোটদের সাথে, এতিমদের সাথে এবং দাস-দাসীদের সাথে সংলাপ হবে স্নেহ মাখা কণ্ঠে। কথা বলার এরূপ স্তর বিন্যাস প্রতিষ্ঠিত হলে মানব পরিবেষ্টিত সমাজে সম্প্রীতিমূলক নেটওয়ার্ক গড়ে ওঠে।

এ ব্যাপারে কোরানের বাণী

"আর আমার বান্দাদের বলে দিন তারা যেন এরূপ কথা বলে যা উত্তম। (বনি ইসরাঈল-৫৩)"

"পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন, এতিম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশি, দূর প্রতিবেশি, সঙ্গী-সাথী, পথচারী এবং তোমাদের অধিকার ভুক্ত দাস-দাসীদের প্রতি সুন্দর ব্যবহার করবে তথা সুন্দর ভাষায় কথা বলবে। দাম্ভিকতা আল্লাহ্ মোটেও পছন্দ করেন না। (নিসা-৩৬)"

"আবদুলাহ ইবনে আমর (রঃ) থেকে বর্ণিত, নবীজী (সাঃ) বলেছেন, "প্রকৃত মুসলমান হচ্ছে সে ব্যক্তি যার জিহ্বা এবং হাত থেকে অপর মুসলমান নিরাপদ। (বুখারী)"

"ইবনে মাসুদ (রঃ) থেকে বর্ণিত, এক ব্যক্তি নবীজীর (সাঃ) নিকট আরজ করলেন, হে আল্লাহর রসুল, আমি ভাল করি না মন্দ করি তা কি করে জানব? নবীজী বললেন, যখন তোমার প্রতিবেশিরা বলবে, তুমি ভাল (কাজ) কর তখন প্রকৃতই তুমি ভাল লোক। আর তারা যদি বলে তুমি মন্দ (কাজ) করে থাকে। তাহলে সত্যিকার অর্থে তুমি মন্দের প্রতি আকৃষ্ট। (ইবনে মাজাহ)"

"হযরত আয়শা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, এক বেদুইন নবী (সাঃ) এর কাছে এসে বলল, আপনারা শিশুদের চুমু দেন। আমরা তো তাদের চুমু দিই না। জবাবে নবীজী (সাঃ) বললেন, আল্লাহতা'আয়ালা তোমাদের অন্তর থেকে দয়ামায়া তুলে নিয়ে গেলেও আমি তার কি করতে পারি।"

"হযরত আনাস (রাঃ) বলেন, একদা তিনি ছোটদের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদেরকে সালাম দিলেন এবং বললেন নবীজী (সাঃ) এভাবে ছোটদের সালাম দিতেন। (মুসলিম)"

www.pathagar.com

নিদ্রাতত্ত্ব ও স্বপ্ন

"আমি রজনীকে সৃষ্টি করেছি বিশ্রামের জন্য"-আল কোরআন সুরা নাবা-৯
And We have made your sleep for rest (নাবা-৯)
ঘুম মানুষের জন্য অবধারিত বিশ্রাম। এটি শরীর মন তথা পুরা স্নায়ু তন্ত্র অবকাশ গ্রহণের মাধ্যম। ঘুম কেন মানুষকে আচ্ছন্ন করে তার সঠিক তত্ত্ব এখনো অনুদঘাটিত। ঘুমকে মস্তিস্কের পরিবর্তিত জাগ্রত অবস্থা বলা যায়। মস্তিস্কের যে অংশ আমাদের জাগিয়ে রাখতে সাহায্য করে, তা আমাদের brain stem এর উপর বিস্তৃত এক প্রকার স্নায়ু জাল। ঐ স্নায়ু জালের উপর থেকে ইন্দ্রিয় অনুভূতির প্রভাব হ্রাস পাওয়ার সাথে সাথে আমাদের চোখে ঘুম নেমে আসে।

ঘুমকে দু'পর্যায়ে ভাগ করা যায়–
১. ঘুমের এ অবস্থায় চোখের তারা দ্রুত নড়াচড়া করে।
২. ঘুমের এ অবস্থায় চোখের তারা থাকে স্থির।
নিদ্রায় আক্রান্ত হয়ে মানুষ সরাসরি অর্থোডক্স পর্যায়ে গিয়ে উপস্থিত হয়। এ অর্থোডক্স পর্যায়ের স্থায়িত্ব এক ঘন্টা কিংবা তারও বেশি হতে পারে। REM একে অনুসরণ করে চলে। REM-এর স্থায়িত্ব ২ মিনিট থেকে ১৫ মিনিট পর্যন্ত হয়ে থাকে।
ঘুমের REM পর্যায়ে মানুষ স্বপ্ন দেখে। আমরা যে স্বপ্ন দেখি তা ব্যাখ্যা করলে দেখা যায়, আমাদের চেতন মনের গভীরে একটি অবচেতন মন আছে। আমরা যখন জাগ্রত অবস্থায় থাকি তখন আমাদের ভাবনা, চিন্তা আবেগ, অনুভূতি চেতন মনের নিয়ন্ত্রণে থাকে। আর যখন ঘুমিয়ে পড়ি অমনি অবচেতন মনের অতৃপ্ত আশা আকাঙ্খা এবং জানা অজানা ঘটনাবলি স্বপ্নের রূপ ধরে মনের চেতন স্তরে উঠে আসে।
কোরআনে নবীদের স্বপ্নের কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তবে নবী রাসূলগণের স্বপ্ন এক প্রকার ওহী, যার নাম ওহীয়ে গাইরে মাতল। নবী ইউসুফ (আঃ) এর স্বপ্ন সম্পর্কে আর কোরআন বলছে, "স্মরণ করুন, যখন ইউসুফ (আঃ) তার

www.pathagar.com

পিতাকে বললেন, পিতাজী, আমি এক স্বপ্নে দেখেছি এগারটি গ্রহ, চাঁদ এবং সূর্যকে। আমি তাদের দেখেছি আমার প্রতি অবনত হতে।" (ইউসুফ-৪) জাতির পিতা হযরত ইব্রাহীম (আঃ) তার স্বপ্নকে বাস্তবায়িক করার ঘটনা আল-কোরআনে বিবৃত হয়েছে "আমরা তাহাকে ডেকে বললাম, হে ইব্রাহীকম, আপনি তো স্বপ্নকে প্রমাণ করে দেখিয়েছেন। (সাফায়াত-১০৪/১০৫)"

নিদ্রা অবস্থায় REM-পর্যায়ে যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয় তা আল্লাহর নবীদের জন্য ওহী এবং সাধারণ মানুষের জন্য নির্দেশনা Sign)। ঘুমের সময় মস্তিষ্ক বাইরের উদ্দীপনা থেকে মুক্ত থাকে। কিন্তু গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন কোন মানুষের হাতে অত্যন্ত গরম কিংবা খুব ঠাণ্ডা বস্তুর ছোঁয়া লাগলে সে হাত সরিয়ে নেয়। অথবা একজন ঘুমন্ত মানুষের মুখের উপর যদি মশা কিংবা মাছি বসে শিহরণ জাগায় তাহলে ঐ ব্যক্তি হাত নেড়ে মশা মাছিকে বিতাড়িত করে। এটাকে বিজ্ঞানীরা অবচেতন মনের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া হিসেবে চিহ্নিত করে থাকেন। কারণ ঘুমন্ত অবস্থায়ও ত্বকে অবস্থিত উদ্দীপক গ্রাহক সচেতন থাকে। তাই সে বাইরে যে কোন খবর গ্রহণ করে সংজ্ঞাবহ স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের অনুভূতি কোষকে জানিয়ে দেয়। সেখান থেকে নির্দেশ আসে চেষ্টায় স্নায়ু দিয়ে পেশীতে। তখনই ঘুমন্ত ব্যক্তি নিজের অজান্তে হাত সরিয়ে নেয়। কিংবা হাত নড়াচড়া করে মশামাছি তাড়ায়। মস্তিষ্ক ও দেহের অন্যান্য বহু অংশ আছে নিদ্রার মাধ্যমে বিশ্রাম গ্রহণ করে থাকে। কিন্ত দেহের কোনো কোনো অংশ নিদ্রাকালীন সময়ে বিশ্রাম তো গ্রহণ করেই না বরং সচল থাকে। এগুলো হলো, হৃৎপিণ্ড, ফুসফুস এবং মস্তিষ্কের গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রসমূহ। এটি এক বিস্ময়কর রহস্য।

কোরআনের বাণীতে

"আর আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে দিবা-নিশি আমাদের নিদ্রা এবং তার কৃপা অন্বেষণ করা। নিশ্চয় এতে গবেষক সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে অনেক প্রমাণ। (রূম-২৩)"

নিদ্রা বা ঘুম এমন একটি শরীর বৃত্তীয় অবস্থা যার দ্বারা স্নায়ুতন্ত্র ও শিরা-উপশিরাসহ সারাদেহ পুনঃসুস্থ হয়ে ওঠে। মস্তিষ্ক নিদ্রাকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং নিদ্রার উপকারিতা ভোগ করে। নিদ্রা কেন মানুষকে আচ্ছন্ন করে তার সঠিক কোনো তত্ত্ব আবিষ্কৃত না হলেও কিছু বাস্তব ধারণার মাধ্যমে নিদ্রার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করা হয়েছে।

এটা বিশ্বাস করা হয় যে, সেরিব্রাল এ্যানোক্সেমিয়ার (cerebral anoxaemia) কারণে নিদ্রাকালে মস্তিস্কের মধ্য দিয়ে সম্পূর্ণ রক্তপ্রবাহ পরিবর্তিত হয় না। মস্তিষ্কের কোন পার্টিকুলার অংশে বিশেষ করে মধ্য-মস্তিস্কে যথেষ্ট রক্ত প্রবাহ হ্রাস পাওয়া সম্ভব। এ হ্রাস জনিত কারণ নিদ্রার সঙ্গে সংশিষ্ট। স্নায়ুকেন্দ্রে

www.pathagar.com

অক্সিজেনের ঘাটতির কারণে দিনে (কর্মদিবসে) এবং রাত্রে (নিদ্রাকালীন সময়ে) অক্সিজেন গ্রহণ ও কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করার মাত্রা।

দেখা যাচ্ছে নিদ্রাকালীন সময়ে অক্সিজেন গ্রহণ কম হয় এবং কার্বন ডাইঅক্সাইড নির্গমও তুলনামূলকভাবে কম হয়ে থাকে। এটা ভালভাবে সকলে জানে যে, কার্বন ডাইঅক্সাইডের আধিক্য আরামহীনতা ও অচেতনতার কারণ হয়ে দাঁড়ায়। যখন সহজভাবে বলা হয় অক্সিজেনের অভাব কিংবা কার্বন ডাইঅক্সাইডের উপস্থিত এবং টিস্যুগুলোর মধ্যে অন্যান্য ক্রিয়ার উদ্ভব সাধারণভাবে নিদ্রা ঘটিয়ে থাকে। কিন্তু এসব ঘটমান প্রক্রিয়া মোটেও ব্যাখ্যা দিতে পারে না ঐ সমস্ত মানুষের ব্যাপারে যারা শরীরিক পরিশ্রমের কাজে অংশ গ্রহণ না করেও নির্দিষ্ট সময়ে নিদ্রার কোলে ঢলে পড়ে। কেননা যুক্তি দেখানো হয় যে, দৈহিক পরিশ্রমের কারণে শরীর অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়লে মানুষকে দ্রুত নিদ্রা আবিষ্ট করতে পারে। যখন মানুষ চোখ বন্ধ করে বাইরের দৃশ্য দেখা বন্ধ করে দেয় তখন সে নিজেকে বাহ্য প্রভাব থেকে গুটিয়ে নিদ্রায় মশগুল হয়ে পড়ে। এ অবস্থায় মন উদ্দীপ্ত হতে পারে না এবং নিরবচ্ছিন্ন শান্তি নেমে আসে। এটা মনে করা হয় যে, ঘুমের পূর্বে মানুষ যতক্ষণ জাগ্রত অবস্থায় থাকে ততক্ষণে মস্তিষ্কে নিদ্রা সৃষ্টিকারী বস্তু সমন্বিত হয়ে ওঠে এবং কিছুক্ষণের মধ্যে সে গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ে।

বিজ্ঞানী Lindsley-এর মতে, নিদ্রা সম্পর্কে এমন কোন একক তত্ত্ব নেই যা পুরাপুরিভাবে গ্রহণ করা যেতে পারে। রাসায়নিক তত্ত্বে জোর দেয়া হয়েছে টক্সিন পুঞ্জিভবনের উপর, কার্বন ডাইঅক্সাইডের বৃদ্ধির উপর, অক্সিজেনের কমতির উপর এবং বিশেষভাবে হিপনোটক্সিন উৎপন্নের উপর। যে ধারণাটি অতি সাধারণভাবে গ্রহণ করা হয়েছে সেটি হল এ যে, মস্তিষ্কের মধ্যে একটি জেগে থাকার কেন্দ্র রয়েছে। খুব সম্ভব এ কেন্দ্রটি এর মধ্যে অবস্থিত। প্রতিনিয়ত অন্তর্মুখী অনুভূতি দ্বারা আক্রান্ত হয়। জেগে থাকার কেন্দ্রটি যতক্ষণ অনুভূতির সংকেত প্রাপ্ত হয়ে কর্মব্যস্ত থাকে ততক্ষণ মানুষের চোখে ঘুম আসে না। অর্থাৎ মানুষ জেগে থাকে। নিদ্রা তখনই মানুষকে আক্রান্ত করে যখন পেশীর ক্লান্তি ও অবসাদের কারণে অন্তর্মুখী অনুভূতিগুলো ব্যাপকহারে হ্রাস পায়। অন্ধকারে এবং শান্ত পরিবেশে মস্তিষ্কে প্রেরিত ইন্দ্রিয়ানুভূতির সংকেতগুলোও অধিক মাত্রায় হ্রাস পায়। এর ফলে মানুষের চোখে নিদ্রা এসে ভর করে।

মানুষের মস্তিস্ক থেকে গৃহীত ইলেকট্রিক্যাল বৈশিষ্ট্যগুলির রেকর্ড বিশ্লেষণ করে দেখানো হয়েছে যে, বিভিন্ন পর্যায়ের মাধ্যমে নিদ্রা বিভিন্ন মাত্রায় কার্যকর হয়ে থাকে। মস্তিষ্ক তরঙ্গের জাগ্রত অবস্থায় থেকে একটি নির্দিষ্ট পরিবর্তন দেখা যায়। এ পরিবর্তনকে তন্দ্রানুধরন বলে আখ্যায়িত করা হয়। এ ধরনকে

www.pathagar.com

অনুসরণ করে আসে আরেকটি পরিবর্তন যা প্রকৃত নিদ্রার ইঙ্গিতবাহী। এ নিদ্রা সূচীত হয় ব্যাপক আকারে, ধীর গতিতে ও অনিয়মিতভাবে যা মস্তিষ্ক গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত।

রক্ত সঞ্চালনের মাধ্যমে পেশী আন্দোলিত হয়ে থাকে। এ আন্দোলন নিদ্রা সূচীত করে পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে জানা গেছে যে, অধিকাংশ মানুষ ঘুমের সময় অবস্থান পরিবর্তন করে থাকে। ফটোগ্রাফিক রেকর্ড থেকে প্রতিভাত হয়েছে যে, বড় নিদ্রা-ভোগী ব্যক্তি ঘুমন্ত অবস্থায় ২০ থেকে ৩০টি অবস্থান পরিবর্তনের ক্রিয়া সম্পন্ন করে থাকে। এ অবস্থান পরিবর্তন ঘটে ৭ মিনিট পরপর। তাই ঘুমন্ত অবস্থায় নড়াচড়ার সুবিধার্থে বিছানা প্রশস্ত হওয়া সমীচীন। সুতরাং উপরোক্ত তত্ত্বগুলো থেকে এটা খুবই স্পষ্ট হয়েছে যে, নিদ্রার উপর কোনো তত্ত্বই এর সঠিক কারণ সম্পর্কে ব্যাখ্যা দিতে পারেনি। তাই এর কারণ উদঘাটনের জন্য গবেষক বিজ্ঞানীগণ গবেষণা কর্মে নিয়োজিত রয়েছেন।

www.pathagar.com

আবহাওয়া তত্ত্ব

যে পৃথিবী আমরা বাস করি তার ভেতরে প্রতিনিয়ত নানা রকম আলোড়ন সৃষ্টি হচ্ছে। সৌরবিকিরণ ভূ-পৃষ্ঠের কোথাও লম্বাভাবে কোথাও তির্যকভাবে পড়ে। এছাড়া কোনো নির্দিষ্ট স্থানে এবং বছরের এক এক সময়ে তার এক এক রকম অবস্থা তৈরি হয়। সে কারণেই ঋতুর পরিবর্তন ঘটে একের পর এক। অধিকন্তু পৃথিবীর আহ্নিক গতি বায়ু প্রবাহকে প্রভাবিত করছে। যার ফলে মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়-তুফান সৃষ্টি হয়ে থাকে। আমাদের জীবনে এসবের ভূমিকা এবং প্রভাব ভীষণভাবে আলোড়ন সৃষ্টি করে থাকে। বিজ্ঞানের যে শাখায় মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়-তুফান ইত্যাদির গতি প্রকৃতি আলোচনা করা হয়েছে তার নাম মৌসুম-বিজ্ঞান বা Meteorology।

আবহওয়া বিষয়ে কোরআনের সূত্র :

"আর আবহাওয়া পরিবর্তনের মধ্যে জ্ঞানী লোকদের জন্য রয়েছে অনেক সংকেত। (জাসিয়া-৫)"

মৌসুম বিজ্ঞানে আবহাওয়া পরিবর্তনের ঘটনা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। এর উপর ভিত্তি করে আবহাওয়া পূর্বাভাস দেয়া হয়। কাল বৈশাখী, বজ্রবৃষ্টি, সাইক্লোন, টর্নেডো, সামুদ্রিক নিম্নচাপ প্রভৃতি প্রাকৃতিক দুর্যোগ সংগঠিত হওয়ার পূর্বে মানুষকে সতর্ক করার অসাধারণ সংকেত বায়ু পরিবর্তনের মধ্যে রয়েছে।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস

"আর আল্লাহর নির্দেশনা সমূহের একটি এই যে, তিনি সুসংবাদবাহী (পূর্বাভাস) বায়ু প্রেরণ করেন যাতে তার অনুগ্রহ তোমরা আস্বাদন করতে পার। (রুম-৪৬)"

ঝড়, বৃষ্টি, সাইক্লোন প্রভৃতি শুরু হওয়ার আগে এমন একটি বায়ু প্রবাহিত হয় যার মধ্য থেকে মেটোরোগ্রাফ (mateorgraphs) অংকন করা যায়। অর্থাৎ তাপমাত্রা, আদ্রতা, বায়ুর গতিবেগ, বৃষ্টিপাতের পরিমাণ, বজ্রবৃষ্টি thunder storms জলোচ্ছাস প্রভৃতির সার্বিক মানচিত্র পাওয়া যায় এবং এ মানচিত্র আগে বাগে দেওয়ার নাম আবহাওয়ার পুর্বাভাস। আল-কোরআন এটাকে এটাকে বলেছে সুসংবাদবাহী পূর্বাভাস। সাধারণত আবহাওয়ার পূর্বাভাস তিন প্রকার,

১. স্বল্পকালীন পূর্বাভাস -যার মেয়াদ ৪৮ ঘন্টা।
২. মধ্যমেয়াদী পূর্বাভাস যা এক সপ্তাহের জন্য দেয়া হয়।
৩. দীর্ঘ মেয়াদী পূর্বাভাস যা সাধারণত হয় বা আট মাস আগে দেয়া হয়।

www.pathagar.com

আবহাওয়া পূর্বাভাস দেয়ার জন্য প্রথমেই আবহাওয়ার মানচিত্র বা weather map দরকার। সারা পৃথিবীতে অসংখ্য আবহাওয়া পর্যবেক্ষণকেন্দ্র আছে। প্রতিটি পর্যবেক্ষণকেন্দ্র থেকে আবহাওয়ার বিভিন্ন তথ্য টেলিগ্রাফ, টেলিপ্রিন্টার বা বেতারের মাধ্যমে মূল কেন্দ্রে পাঠানো হয়। সেখানে এ তথ্যগুলি একটি মানচিত্রে সাংকেতিকভাবে অংকন করা হয। এবার যে সব জায়গায় বায়ুর চাপ সমান, তাদের একটি রেখা দ্বারা যুক্ত করা হয়। এ রেখাকে বলা হয় সমচাপ রেখা। এ সমচাপ রেখা টেনে উচ্চ চাপ অঞ্চল নিম্নচাপ অঞ্চলকে পরস্পর থেকে আলাদা করা হয়। নিম্নচাপ অঞ্চলে যে সমচাপ রেখা প্রতিভাত হয় তার মান সবচেয়ে কম। নিম্নচাপ অঞ্চলকে ঘিরে ক্রমশ আরো সমচাপ রেখা টানা হয়। তাদের মান ক্রমশ বাড়ে। এভাবে সমতাপ রেখা ও সমবৃষ্টি রেখা ইত্যাদির সাহায্যে ঐ মানচিত্রটিকে সম্যক বিশ্লেষণ করা হয়।.

"তিনিই সে সত্তা যিনি অনুগ্রহ পূর্ববক বৃষ্টির পূর্বে সুসংবাদবাহী বায়ু পাঠিয়ে দেন। এমনকি যখন বায়ুরাশি পানি পূর্ণ মেঘমালা বয়ে আসে। তখন আমরা সেই মেঘমালাকে কোনো শুষ্ক ভূখণ্ডের দিকে পরিচালিত করি। অতঃপর সেই মেঘমালা থেকে বারি বর্ষণ করি। অতঃপর পানি দ্বারা সর্বপ্রকার ফসল উৎপন্ন করে দিই। (আ'রাফ-৫৭)"

বর্তমানে কৃত্রিম উপগ্রহের মাধ্যমে আবহাওয়া পরিস্থিতি নিরূপন করা হয়। ১৯৬০ সালে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্র সর্বপ্রথম আবহাওয়া নিরূপক কৃত্রিম উপগ্রহ (Weather stellife) মহাকাশে উৎক্ষেপণ করেছিল। এ উপগ্রহ উত্তর দক্ষিণে বা দক্ষিণ উত্তরে যেত এবং দুই মেরুর উপর দিয়ে পৃথিবীর চারদিকে পাক খেত। এগুলোর উচ্চতা ভূ-পৃষ্ঠ থেকে ৬০০-১৬০০ কিঃ মিঃ এর মতো এবং পৃথিবীর চারদিকে একপাক ঘুরতে সময় নিত প্রায় ১০০-১২০ মিনিট। এই কৃত্রিম উপগ্রহগুলি নিচের দিকে শক্তিশালী ক্যামেরাযুক্ত এবং প্রতি দু'মিনিট অন্তর ছবি তুলতে থাকে। ছবিগুলিকে বেতার তরঙ্গে পরিণত করে আবহাওয়া চিত্র বেতারের মাধ্যমে পাঠিয়ে দেয়। ভূ-পৃষ্ঠে পর্যবেক্ষণ কক্ষে গ্রাহক যন্ত্রে ঐ বেতার তরঙ্গ আবার চিত্রে রূপান্তরিত করার ব্যবস্থা আছে। এ ব্যবস্থার নাম Automatic Picture transmission Unit বা APT.

বর্তমানে আরো অত্যাধুনিক INSAT উপগ্রহের মাধ্যমে আবহাওয়া পরিস্থিতি নিরূপণ করা হয়। এ উপগ্রহ পৃথিবীর উপর নিরক্ষীয় অঞ্চলে কোন বিশেষ দ্রাঘিমার উপর অবস্থান করে। এর উচ্চতা ৩৮০০০ কিঃ মিঃ এবং এটি পৃথিবীর সাথে সমান তালে পাক খেয়ে যায়। অনেক উপরে থাকার কারণে INSAT উপগ্রহ একটি বিরাট অঞ্চলের ছবি তুলতে পারে এবং ভূ-পৃষ্ঠ থেকে বেতার সংকেত পাঠিয়ে যখন খুশী এ ছবি পাওয়া যায়। বঙ্গোপসাগর ও আরব সাগরে যখন সাইক্লোন ঝড় বৃষ্টি হয়ে ধীরে ধীরে তটভূমির দিকে অগ্রসর হয়, তখন কোথায় এ ঝড়টি আছড়ে পড়বে এটি জানা বিশেষ প্রয়োজন। কারণ সে অঞ্চলের লোকজনকে প্রচণ্ড ঝড় এবং সম্ভাব্য জলোচ্ছ্বাসের জন্য সতর্ক করা একান্ত দরকার। এ সময়ে INSAT উপগ্রহ থেকে পাঠানো ছবিগুলি অত্যন্ত কার্যকর হয়ে থাকে।

www.pathagar.com

মেঘ সৃষ্টি

মেঘ সৃষ্টি হয় জলীয় বাষ্প থেকে। জলীয় কণা যখন সাগর, নদ-নদী, খাল-বিল থেকে বাষ্পাকারে উপরে ওঠে, তখন সেটা চারপাশের বায়ু স্তরের চেয়ে হালকা হয়ে যায়। ফলে জলীয় বাষ্প উৎপন্ন হয়েই উপরের দিকে উঠতে থাকে। আবার ঊর্ধ্বগামী বায়ু প্রবাহ ক্রমশ শীতল হয়ে আসে এবং ঘনীভবনের মাধ্যমে সেটা ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র জলকণায় পরিণত হয়। যদি সংশিষ্ট বায়ুমণ্ডলে ধুলিকণা বা কোনো রাসায়নিক পদার্থ কিংবা লবণের ক্ষুদ্রকণা অথবা আর অন্য কোনো কণা না থাকে তাহলে বাতাসের আদ্রতা ৩২০% না হলে ১০-৭ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের জলকণা তৈরি হবে না। ১০-৫ সেন্টিমিটার ব্যাসার্ধের জলকণা সৃষ্টি করতে গেলে বাতাসের আদ্রতা অন্তত ১১০% হওয়া চাই। কিন্তু এতবেশি আদ্রতা সাধারণত বাতাসে সৃষ্টি হয় না। অথচ আদ্রতা এর চেয়ে কম হলে জলীয় বাষ্প দ্রবীভূত হবেই না। তাহলে মেঘ সৃষ্টি হয় কেমন করে?

আসলে বাতাসে বর্তমান লবণকণা এবং অন্যান্য ভাসমান পদার্থই মেঘ সৃষ্টি করতে সাহায্য করছে। দেখা যায় বাতাসে যদি লবণের ক্ষুদ্র কণা প্রচুর পরিমাণে থাকে, তাহলে ৭৮% আর্দ্রতাই মেঘ তৈরি হয়। সমুদ্রের উপরস্ত বায়ু মণ্ডলে এ লবণ কণাগুলি সব সময়ই বিরাজমান। মহাসাগরীয় বাতাসে প্রতি লিটারে লবণ কণাও অন্যান্য রাসায়নিক কণার সংখ্যা ১০ লক্ষের মতো। আর স্থল ভাগে এর সঙ্গে ধূলিকণা ও প্রকৃতির অন্যান্য উৎস থেকে উৎসারিত জলকণা যুক্ত হয়ে এ কণাগুলি সংখ্যা দাঁড়ায় প্রতি লিটারে প্রায় ৫০ থেকে ৬০ লক্ষ, মেঘ আর কিছুই নয় এ জলকণাগুলির সমষ্টি মাত্রা।

কোরানের সূত্র

"তিনি আল্লাহ যিনি বায়ু প্রেরণ করেন। যেন তা মেঘমালাকে উত্থিত করে। অতঃপর মেঘরাশিকে যেভাবে ইচ্ছা আকাশে ছড়িয়ে দেন এবং তাকে স্তরে স্তরে স্থাপন করেন। এরপর তোমরা দেখতে পাও তার মধ্য থেকে নির্গত হয় বৃষ্টিধারা। (রুম-৪৮)"

www.pathagar.com

"আর আল্লাহই বায়ু প্রেরণ করেন, যা মেঘমালা সঞ্চারিত করে। অতঃপর আমরা তা নির্জীব অঞ্চলের দিকে পরিচালিত করি এবং তারদ্বারা নির্জীব অঞ্চলকে সজীব করি। (ফাতির-৯)"

মেঘমালা

আকাশে মেঘের দিকে তাকালেই বুঝা যায় যে, সব মেঘ এক রকমের নয়। এক এক মেঘের এক এক চেহরা। আকৃতি অনুযায়ী মেঘকে মোট চার ভাগে ভাগ করা যায়। (১) পুঞ্জ মেঘ (Cumulus) (২) স্তর-মেঘ (Stratus) (৩) উর্ষা-মেঘ (Cirrus)| এ তিন রকম মেঘের সমষ্টিকে বলা হয় নিম্বাস (Nimbus)।

কোরআনের সূত্র

তিনি আল্লাহ যিনি বিজলী প্রদর্শন করেন। যা ভয় এবং আশার সঞ্চার করে। আর বৃষ্টি কণা সহ মেঘমালাকে উর্ধ্বে ওঠান। (রাদ-১২)

মেঘ থেকে বৃষ্টিপাত

জল কণার ব্যাসার্ধ যত ছোট হবে, ততই বাষ্পের দ্রবীভবন হওয়া কঠিন হয়ে পড়বে। বড় ফোটা তৈরি করতে গেলে লবণ কণা-ধূলিকণা বা অন্যান্য ক্ষুদ্র দ্রবীকরণ কণা বাতাসে বর্তমান থাকা একান্ত প্রয়োজন। এসব কথা বায়ুতে যখন বিরাজ করে তখন জলবিন্দু সৃষ্টি হয়ে সেগুলি উর্ধ্বগামী বায়ু প্রবাহের মুখে পড়ে অপেক্ষাকৃত শীতল অঞ্চলে এসে হিমাংক স্তরের উপরে উঠলে কিছু জলবিন্দু অতি শীতল হয়ে যায়। আর কিছু জলবিন্দু বরফের কুচিতে পরিণত হয়। সেখানে অতিশীতল জলবিন্দুগুলি খুব শীঘ্রই বাষ্পীভূত হয়ে সঙ্গে সঙ্গে ঐ অঞ্চলে পাশাপাশি যে হিমকণাগুলি আছে তার উপরে জমা হয়ে যায় এবং সেগুলি আকারে বাড়ে। বড় আকারের হিমকণাগুলি যখন নিজের ভারে নিচে নামতে থাকে তখন ছোট ছোট জল বিন্দুগুলি এর গায়ে লেগে বড় বড় ফোঁটা তৈরি করে। তখন জলবিন্দুর ব্যাসার্ধ ১ মিলিমিটার বা তার চেয়ে বেশি হয়ে যায়। তখনই ঐ জল বিন্দুগলি বৃষ্টির আকারে ঝরে পড়ে।

কোরানিক সূত্র–

"আর আমরা জলধারী মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করি। (নাবা-১৪)"

"আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং তা দ্বারা নির্জীব জমীনকে সজীব করেন। নিশ্চয়ই এতে শ্রবণকারীদের জন্য রয়েছে নিদর্শন। (নাহল-৬৫)"

বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা করে দেখা গেছে, বৃষ্টির পানি অত্যন্ত নির্মল এবং বিশুদ্ধ। নদ-নদী, সাগর-মহাসাগর থেকে বাষ্পাকারে উত্থিত জলকণা হিমাংক স্তরে

www.pathagar.com

পৌঁছলে তা থেকে লবণ এবং অন্যান্য রাসায়নিক কণা মুক্ত হয়ে যায় এবং বাতাস তা শুষে নেয়। ফলে বৃষ্টির পানি পতিত জলের মত স্বচ্ছ এবং বিশুদ্ধ অবস্থায় ভূ-পৃষ্ঠে পতিত হয়। যা পান করার জন্য সম্পূর্ণ নিরাপদ।

কোরআনের সূত্র–

And We send down pure water from the sky.

"আর আমরা আকাশ থেকে বিশুদ্ধ বারি বর্ষণ করি। (ফোরকান-৪৮)"

"তিনি তোমাদের জন্য মেঘ থেকে বারি বর্ষণ করেন। যা থেকে তোমরা পান কর এবং তা দিয়ে তৃণরাজি উৎপন্ন হয়, যার উপর তোমরা পশুচারণ কর। (নাহল-১০)"

মৌসুমী বিজ্ঞানে বর্ণিত মেঘ, বৃষ্টি, ঝড়, তুফান, আবহাওয়ার পূর্বাভাস, ঋতু পরিবর্তন ইত্যাদি বিষয়ের পরিকল্পনা, পরিচালনা এবং নিয়ন্ত্রণ করেন যিনি- তিনি কে?

"আর যদি আপনি তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, কে আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেন, অতঃপর তা দ্বারা ভূমিকে মৃত অবস্থা থেকে সঞ্জীবিত করেন? তবে তারা অবশ্যই বলবে, 'আল্লাহ'। বলুন, সমস্ত প্রশংসা আল্লাহরই জন্যে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা বুঝে না। (আনকাবুত-৬৩)"

www.pathagar.com

ছায়া

ছায়া নিয়ে কোরআনের সূত্র

"তোমরা কি তোমাদের প্রভুর দিকে দৃষ্টি মেলে দেখ না? তিনি ছায়াকে কিভাবে দীর্ঘায়িত করেন! যদি তিনি ইচ্ছা করতেন তাহলে ছায়াকে স্থির করেও রাখতে পারতেন। অতঃপর আমরা সূর্যকে করেছি এর নির্দেশক। এরপর আমরা একে আমাদের দিকে ক্রমান্বয়ে গুটিয়ে আনি। (ফোরকান-৪৫-৪৬)

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

অস্বচ্ছ বস্তু দ্বারা আলো বাধাপ্রাপ্ত হলে ছায়া সৃষ্টি হয়। অর্থাৎ অস্বচ্ছ বস্তুর বিপরীত দিকে আলোর উৎস বিদ্যমান থাকলে ছায়া উৎপন্ন হয। আলোর প্রদান উৎস সূর্য। তার আলোর সামনে যত অস্বচ্ছ বস্তু অবস্থান করে ঐসব বস্তুর বিপরীত দিকে ছায়া পড়তে দেখা যায় এবং এ ছায়ার দৈর্ঘ্য সব সময় একই রকম থাকে না। বিভিন্ন সময় এর দৈর্ঘ্যের হ্রাস-বৃদ্ধি ঘটে অর্থাৎ কম বেশি হয়। এর কারণ হলো সূর্যের অবস্থান দ্বারা ছায়া পরিচালিত হয়। সূর্য যদি স্থির অবস্থায় না থাকে তাহলে ছায়ার দৈর্ঘ্য ও অবস্থান স্থির অবস্থায় থাকে না। ছায়ায় দৈর্ঘ্য আপাতন কোণের স্পর্শকের সঙ্গে উল্টা আনুপাতিক। আপাতন কোণ যত ক্ষুদ্র হবে ছায়ার দৈর্ঘ্যও তত বড় হবে। তাই কাল বেলা সূর্যের উচ্চতা কম থাকে বলে আপাতন কোণ ক্ষুদ্র হয়। যার ফলে ছায়া হয় দীর্ঘ সূর্যের উচ্চতা যতই বৃদ্ধি পেতে থাকে ক্রমান্বয়ে ততই ক্ষুদ্র হতে থাকে। পুনরায় ছায়া পর্যায়ক্রমে বড় হতে থাকে যখন উচ্চতা ক্রমান্বয়ে হ্রাস পায়।

ছায়া সংক্রান্ত কোরানের আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে আল্লাহ পাক যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তিনি ছায়াকে স্থির করে রাখতে পারতেন। এ বক্তব্যটি খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। এ অবস্থা সৃষ্টি হতো তখনই যখন পৃথিবীর ঘূর্ণন গতি খুবই মন্থর হতো। অর্থাৎ যেসময়ে পৃথিবী সূর্যের অক্ষপথ একবার সম্পূর্ণরূপে প্রদক্ষিণ করে সে সময়ের মধ্যে যদি পৃথিবী তার নিজ অক্ষে একবার আবর্তন করতো। (সূর্যের অক্ষপথ সম্পূর্ণরূপে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ২৫ মিলিয়ন আলোকবর্ষ। কিন্তু নিজ অক্ষপথ একবার ঘুরে আসতে

www.pathagar.com

পৃথিবীর সময় লাগে মাত্র ২৪ ঘন্টা)। এ অবস্থা হলে পৃথিবীর এক অংশ স্থায়ীভাবে সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকতো এবং এ অংশে সকল ছায়া স্থির হয়ে থাকতো। আর পৃথিবীর অপরাংশ স্থায়ীভাবে অন্ধকারে নিমজ্জিত হয়ে থাকতো। অবস্থা এরূপ হলে মহাবিপদ নেমে আসতো। কারণ পৃথিবীর যে অংশ সূর্যের দিকে উন্মুক্ত থাকতো সে অংশ উত্তপ্ত মরুভূমিতে পরিণত হতো। আর যে অংশ সূর্যের বিপরীত দিকে থাকতো সেখানে সবকিছু জমাটবাঁধা বরফে ঢাকা থাকতো, যা জীবন ধারণাকে অসম্ভব করে তুলতো।

পরম হিতৈষী আল্লাহপাক পৃথিবীকে দিয়েছেন আনুপাতিক ঘূর্ণন গতি যার ফলে ছায়া একবার দীর্ঘ হয় আবার খর্ব হয়। ছায়ার এ হ্রাস-বৃদ্ধির ঘটনা থেকেই আমরা বুঝতে পারি আল্লাহপাক কর্তৃক বেঁধে দেয়া আইনের আওতায় পৃথিবী আবর্তিত হচ্ছে এবং তার কোনো অংশই দীর্ঘ সময়ের জন্য সূর্যের সামনে স্থির করে রাখা হয় না। এ কারণেই পৃথিবীর আবহমণ্ডল বেশ সহনীয় এবং জীবনকে বিকশিত করার পক্ষে অতিশয় সহায়ক।

বিদ্যুতের ও দৃষ্টি সূত্র কোরানের সূত্র

"বিদ্যুৎ-চমক তাদের দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নেয়। এটা যতখানি আলোকিত করে তার মধ্যে তারা পথ চলে। আবার যখন অন্ধকার হয়ে যায় তখন থমকে দাঁড়িয়ে যায়। আল্লাহপাক ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি দুই-ই নস্ট করে দিতে পারেন। কারণ তিনি সকল বস্তুর উপর শক্তিমান।" (বাকারা-২০)

"তিনি আল্লাহ যিনি বিজলী প্রদর্শন করেন। যা ভয় এবং আশার সঞ্চার করে। আর বৃষ্টি কনা সহ মেঘমালাকে ঊর্ধ্বে ওঠান। (রাদ-১২)"

এ আয়াতের মর্মার্থ দাবী করে যে, মানুষ আলোর উপস্থিতিতে সব কিছু দেখতে পায়। অন্ধকারে কিছুই দেখে না। কিন্তু আলোর ঝলক তীব্র হলে চোখের আলো-গ্রাহী (Photoreceptor) কোষগুলো অসংবেদনশীল হয়ে পড়ে।

তিনি আল্লাহ যিনি বিজলী প্রদর্শন করেন। যা ভয় এবং আশার সঞ্চার করে। আর বৃষ্টি কণা সহ মেঘমালাকে ঊর্ধ্বে ওঠান। (রাদ-১২)

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

মানুষের চোখ আলোর মধ্য দিয়ে দৃষ্টি সঞ্চার করে। অর্থাৎ আলোর প্রতি মানুষের দৃষ্টি খুবই সংবেদনশীল। চোখের আলোক সংবেদী স্তর রেটিনা নামে পরিচিত। রেটিনা আলোক উদ্দীপনাবাহী জটিল সুসংবদ্ধ স্নায়ুকোষ এবং আলোক সংবেদী গ্রাহক কোষ সমন্বয়ে গঠিত। আলোক সংবেদী গ্রাহক কোষ দুই ধরনের– কোণ (cones) এবং রড (rods)। cones সাধারণত দিনের

www.pathagar.com

আলোতে দেখতে সাহায্য করে এবং রং (colours) সম্পর্কে ধারণা সৃষ্টি করে। আর Rods রাতের অন্ধকারে এবং ক্ষীণ আলোতে দেখা জন্য না অভিযোজিত। কোনো বস্তু থেকে প্রতিফলিত আলোক তরঙ্গ (Light waves) এসে cones এবং Rods কোষকে উদ্দীপিত করলে তবেই মানুষ দেখতে পায়। কিন্তু সব ধরনের আলোক তরঙ্গ আমাদের চোখে ধরা পড়ে না। যেসব তরঙ্গ ধরা পড়ে তাদের বলা হয় দৃশ্যমান আলোক তরঙ্গ। যার ব্যাপ্তি 3800A থেকে 7200Aতরঙ্গ দৈর্ঘ্যের মধ্যে (1 Angstrom=10-8cm)। আলোক তরঙ্গ চোখে পড়লে cones এবং Rods এর যে রাসায়নিক পদার্থ আছে তা আলো শোষণ করে নেয়। কোন- এর আছে আয়োডোপসীন এবং র-এর আছে রোডপসীন। আলোর ছোঁয়ায় এ রাসায়নিক বস্তু দু'টির মধ্যে ফটোক্যামিক্যাল বিক্রিয়ার কারণে আবেগ সৃষ্টি হলে তা স্নায়ু তন্তুর মাধ্যমে মস্তিষ্কের দর্শন কেন্দ্রে পৌঁছে যায়। তখনই মানুষ দেখতে পায়। অন্ধকারে cones এবং Rods আলো গ্রহণ করতে পারে না বলেই কিছুই দর্শন করা যায় না।

আবার আলোর তীব্রতার প্রেক্ষাপটে দৃষ্টিশক্তি নিয়ে পরীক্ষা করলে দেখা যায় কোনস এবং রডস খুব তীব্র আলোতে অসংবেদী হয়ে পড়ে। বিদ্যুৎ চমক হঠাৎ জোরালো আলো উৎপন্ন করে ক্ষীপ্র গতিতে ছড়িয়ে দেয়। এসময় কোণস এবং রডস এর দিক থেকে কোনো সাড়া না আসার কারণে মানুষের দৃষ্টি সাময়িকভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ে। আকাশে বিদ্যুৎ ঝলকের ফলে চলার পথে মানুষের দৃষ্টিশক্তির যে প্রতিকূল অবস্থা সৃষ্টি হয় আলোচ্য আয়াতে আল্লাহপাক 'ইয়াখতাফু' শব্দ দ্বারা চমৎকারভাবে ব্যাখ্যা করেছেন।

www.pathagar.com

কৃষিতত্ত্ব বা ধর্ম

উদ্ভিদ ও ফসল উৎপাদনের পদ্ধতি ও তত্ত্ব বিজ্ঞানের যে শাখার আলোচনা বিশ্লেষণ হয় তাকে Agronomy বা কৃষিতত্ত্ব বলা হয়। ফল ও ফসলের বৈশিষ্ট্য, গুণাবলি, ব্যবহার ও সংরক্ষণ কৃষিতত্ত্বের অংশ এবং কোনো বিশেষ শস্যের ফলপ্রসূ উৎপাদনের জন্য মৃত্তিকার ব্যবস্থাপনা প্রধান বিবেচ্য। বংশগতি, শরীরবৃত্ত এবং বাস্তু সংস্থান দ্বারা শর্তাবদ্ধ বিভিন্ন শস্য উদ্ভিদের মধ্যে বিরাজমান সম্পর্ক ও শস্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা লাভ করা যায় Agronomy বা কৃষিতত্ত্ব থেকে।

কোরআনে কৃষিতত্ত্ব বিষয়ক সূত্র

"আর পৃথিবীতে রয়েছে সন্নিকটবর্তী বিভিন্ন এলাকা, আঙ্গুরবাগ, ক্ষেত-খামার। খেজুর গাছ একই রকম এবং ভিন্ন রকম। একই পানি দ্বারা উৎপাদিত কোনো কোনটা খাওয়ার জন্য অন্যটা থেকে উত্তম এবং নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য শিক্ষার বিষয় রয়েছে"। (রা'দ-৪)'

বসুন্ধরা

পৃথিবীর বিস্তীর্ণ প্রান্তর জুড়ে উৎপন্ন হয় নানাবিধ ফসল। মাটি ভেদ করে উঠে সবুজ বৃক্ষ। সৃষ্টির পরে মানুষের আবির্ভাবের সময় গাছ পালাই ছিল তার প্রথম বন্ধু। এখন বৃক্ষরাজির সাথে মানুষের বন্ধুত্ব আরো নিবিড় হয়েছে। কারণ এরাই মানুষের জন্য খাদ্য উৎপন্ন করে। অক্সিজেন উৎপন্ন করে। পরিবেশগত ভারসাম্য সৃষ্টি করে। ঘর সাজাবার আসবাবপত্র দান করে এবং আরো বিবিধ উপকার তো আছে।

তবে আমরা কী চিন্তা করে দেখেছি উদ্ভিদ ও ফসলের বীজ বহন করলে কেন অঙ্কুরোদগম ঘটে? এর কারণ হচ্ছে মহান আল্লাহ মাটিতে উর্বরা শক্তি সৃষ্টি করে দিয়েছেন এবং আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। ফলে পানি আর উর্বরা শক্তির প্রভাবে বীজ অংকুরিত হয় এবং মাটি ভেদ করে জেগে উঠে।

www.pathagar.com

বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণ

উদ্ভিদ ও ফসলের পুষ্টি সাধনের জন্য অন্তত ১০টি রাসায়নিক এবং ৪টি গ্যাসীয় পদার্থ অপরিহার্য। রাসায়নিক উপাদানগুলি হচ্ছে

১। সোডিয়াম
২। ক্যালসিয়াম
৩। পটাশিয়াম
৪। ম্যাগনেসিয়াম
৫। সালফার
৬। ফসফরাস
৭। বোরন
৮। ক্লোরিন
৯। আয়রণ
১০। এবং পানি

যা মাটির মধ্যে ধরা থাকে। এসব উপাদান উদ্ভিদ ও ফসল মূল্যের সাহায্যে মাটি থেকে চুষে নেয়। আর নাইট্রোজেন, অক্সিজেন, হাইড্রোজেন, কার্বন ডাইঅক্সাইড, প্রভৃতি গ্যাসীয় পদার্থ বায়ুমণ্ডল থেকে গ্রহণ করে পুষ্টি পরিপূর্ণ করে। এরপর বৃক্ষ ফল দেয়। ক্ষেতে ফসল উৎপন্ন হয়। ফল আর ফসলগুলো মানুষ ও অন্যান্য প্রাণী খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করে জীবন ধারণ করে।

কোরানের অন্যান্য সূত্র

"তিনি সেই মহান প্রভু যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন; এর দ্বারা আমরা সর্ব উদ্ভিদ উৎপন্ন করি; এবং তা থেকে সবুজ ফসল নির্গত করি যা যুগ্ম বীজও উৎপন্ন করে। আর খেজুর বৃক্ষের শীর্ষ থেকে ছাড়া বের হয় যা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে এবং আঙ্গুরের বাগান সমূহ, যাইতুন এবং আনার বৃক্ষ উৎপন্ন করি। সাদৃশ্য এবং অসাদৃশ্য প্রত্যেক বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য কর যখন তা ফলবান হয়। আরো লক্ষ্য কর পাকার সময়। এ সমুদয়ের মধ্যে অনেক নির্দেশনা রয়েছে সেসব লোকের জন্য যাদের রয়েছে বিশ্বাস। (আনআম-৯৯)"

বৃষ্টির সহায়ক কার্যকারিতা গাছপালা জন্মানোর ক্ষেত্রে অবদান রাখে। আরবী 'নাবাত' শব্দের সাধারণ অর্থ গাছপালা। এ গাছপালার আওতায় পড়ে সকল ধরনের বৃক্ষরাজি। এসব বৃক্ষরাজির সবুজ রং ও ক্লোরোফিল তাদের খাদ্য কার্বোহাইড্রেট তৈরির কাজে সাহায্য করে।

www.pathagar.com

ক্লোরোফিল বা আলোক চোষা সবুজ এন্টেনা

ক্লোরোফিল হচ্ছে মূল রং যা তার সবুজ রংকে বৃক্ষের পাতা ও ফলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। ক্লোরোফিল গাঢ় সবুজ বর্ণের আলোকগ্রাহী রঞ্জক যা আলোক শক্তি গ্রহণ করে। উদ্ভিদ ও সবুজ ফসলে বিদ্যমান ক্লোরোফিল অণু সালোক সংশ্লেষণ প্রক্রিয়ায় শর্করা তৈরির সময় প্রথমত এরা সূর্যের আলো শোষণকারী এন্টেনা হিসেবে কাজ করে। দ্বিতীয়ত 'রোজোন্যান্স ট্রান্সফার' প্রক্রিয়া দ্বারা সংগৃহীত শক্তি ক্লোরোফিলের এক অণু থেকে অন্য অণুতে স্থানান্তর করে এবং সর্বশেষে এ ক্লোরোফিল অণু এনজাইমের ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় রাসায়নিক জারণ ক্রিয়া সম্পাদন করে। অর্থাৎ উচ্চ বিভব সম্পন্ন একটি ইলেকট্রন ক্লোরোফিল অণু থেকে উত্থিত হয়: এই ইলেকট্রন তখন রাসায়নিক কাজ করতে পারে অর্থাৎ অন্য যৌগকে বিজারিত করে। এভাবে আলোক শক্তি রাসায়নিক শক্তিতে রূপান্তরিত হয় এবং এর রূপান্তর খুবই বিস্ময়কর।

দুধ

প্রাণী দেহের অভ্যন্তরে দুই বা ততোধিক উপাদানের রাসায়নিক বিক্রিয়ায় যে সুস্বাদু পুষ্টিকর পানীয় উৎপন্ন হয় তার নাম দুধ (Milk)। স্তন্যপায়ী প্রাণী যেমন গাভী, বাচ্চা প্রসব করার পর যে দুধ দেয় তা কিভাবে উৎপন্ন হয়? বায়ো ক্যামিস্টরা পরীক্ষা চালিয়ে দেখলেন যে, গাভীর ডাইজেস্টিভ খাদ্যের (Intestinal refuse) সার নির্যাস এবং রক্তের সাথে মিশে রাসায়নিক বিক্রিয়ায় দুধ উৎপন্ন করে। তবে গাভীর স্তনে এক ধরনের Cell আছে যার নাম Alvolar cells of mammary glands, ম্যামারী গান্ডের এ Cell গুলো দুধ উৎপাদনে প্রভাবকের ভূমিকা পালন করে। পুরুষ প্রাণীর মধ্যে উক্ত কোষগুলো থাকে না বলেই দুধ উৎপন্ন হয় না। খাদ্য ডাইজেস্ট হওয়ার পর এর সার অংশ কোষের ভেতরে গিয়ে জড়ো হয়। শ্বাসের সঙ্গে যে অক্সিজেন শরীরে প্রবেশ করে তাও কোষে গিয়ে পৌঁছে। অক্সিজেন খাদ্যের সার অংশ দহন করে তৈরি করে শক্তি। এ শক্তি মাপার একক হল ক্যালরি (Calorie)।

১ গ্রাম কার্বোহাইড্রেট দহন করে ৪ ক্যালরি শক্তি পাওয়া যায়। এভাবে ১ গ্রাম প্রোটিন দহন করে ৪ ক্যালরি এবং ১ গ্রাম ফ্যাট দহন করে ৯ ক্যালরি শক্তি

www.pathagar.com

পাওয়া যায়। খাবারের মধ্যে আমরা কার্বোহাইড্রেট পাই ভাত, রুটি, আলু জাতীয় খাবার থেকে মাছ, মাংস, ডিম, ডাল-এরা হচ্ছে প্রোটিনের যোগানদার। ফ্যাট আসে ঘি, তেল, মাখন থেকে। নানা শাক-সবজি টাটকা ফল, ডিম, মাছের তেল-এসব থেকে পাই ভিটামিন। কিন্তু এসব খাদ্য উপাদান এক সাথে দুধের মধ্যে ধরা আছে।

"প্রকৃতপক্ষে (স্তন্যপায়ী) পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে, তাদের ডাইজেষ্টীভ খাদ্য এবং রক্তের বিক্রিয়া দ্বারা আমরা দুধ তৈরি করি, যা পানকারীর জন্য খুবই সুস্বাদু। (নাহল-৬৬)"

শর্করা+স্নেহপদার্থ+চর্বি+ ভিটামিন+খনিজলবণ+পানি=দুধ "আর স্তন্যপায়ী পশুর মধ্যে তোমাদের জন্য শিক্ষণীয় বিষয় আছে। তাদের পাকস্থলীতে আমরা দুধ তৈরি করি, যা তোমরা পান কর (পুষ্টির জন্য)। মু'মিনুন-২১)"

পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা এখন বিশ্বব্যাপী প্রচার করছে যে, "মায়ের দুধের বিকল্প কিছুই নেই।" বাজারের কৃত্রিম দুধ পান করার কারণে শিশুরা স্বাভাবিকভাবে প্রবল মানসিক শক্তির অধিকারী হয় না। পক্ষান্তরে পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে দেখা গেছে, যে সব মা স্তন ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়েছে তারা সবাই শিশুকে স্তন দান করা থেকে বিরত ছিল। কারণ এসব মা মনে করতো শিশুকে স্তন দান করলে তাদের স্বাস্থ্যহানি ঘটবে কিংবা স্বাস্থ্যের সৌন্দর্য নষ্ট হবে। কিন্তু শিশু ভূমিষ্ট হওয়ার সাথে সাথে মাতৃস্তনে দুধ প্রবাহিত হয়। যা শিশু চুষে নিলে মাতৃদেহ ভারসাম্য অবস্থা লাভ করে। দুধ উৎপাদন Alvolar কোষগুলো সক্রিয় থাকে এবং mommary gland সমূহে ক্যান্সার হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না।

মাতৃ দুগ্ধে ভিটামিন A, ভিটামিন B অতি মাত্রায় পাওয়া যায়। দুধের মধ্যে রয়েছে–৮৯% পানি ৩.৫% প্রোটিন, ৩৬% ফেট, ৪.৭% কারবোহাইড্রেট, এবং ০.১২% ক্যালসিয়াম।

দুধ স্নায়ুকোষ এবং মেমোরী কোষ সমূহকে পরিপুষ্ট করে। ফলে প্রতিভার বিকাশ ত্বরান্বিত হয়।

শিশু মাতৃদুগ্ধ পান করে থর থর করে বেড়ে ওঠে। আর কোন খাবারের প্রয়োজন হয় না। তার কারণ কী? মানুষ বেঁচে থাকার জন্য যে খাদ্য গ্রহণ করে বিজ্ঞানীরা তাকে ছয় ভাগে ভাগ করেছেন।

শর্করা (Carbohydrate)
স্নেহ পদার্থ (Protein),
চর্বি (Fat),
ভিটামিন
খনিজ লবণ
এবং পানি

দুধ এমন একটি পানীয় যার মধ্যে উক্ত ছয় প্রকার খাদ্য-ই রয়েছে। সে জন্য দুধকে সুষম খাদ্য বলা হয়।

www.pathagar.com

প্রাণীর খাদ্য ও খাদ্য গুণ বৈজ্ঞানিক ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ

ঘন সন্নিবেশিত শস্যকণা শস্যকণার চারা বা খাদ্যশস্য ঘাসের গোত্রভুক্ত (Grass family)। এগুলো মানুষ ও গৃহপালিত পশু-পাখিদের শাক জাতীয় খাদ্য শস্যের উৎস। এসব খাদ্যে মিশে আছে

স্টার্চ (strach),

প্রোটিন,

কিছু খনিজদ্রব্য

এবং বিভিন্ন ধরনের ভিটামিন।

খাদ্য শস্যের শ্রেণি বিভাগের মধ্যে পড়ে অসংখ্য রকমের খাদ্যশস্য। পৃথিবীর প্রধান খাদ্য শস্যগুলো হলো–

ধান (paddy),

গম (wheat),

বার্লি (barley),

জোয়ার/ভুট্টা (millet),

যব (maize),

রাই (rye)।

এগুলো সব একবীজ পত্রী শস্য দানা।

দ্বিবীজ পত্রী বা যুগ্ম শস্য দানা হলো,

শিম, মটরশুটি, ডাল ইত্যাদি।

এসব খাদ্যের মধ্যে গম ও যব ইসলামের প্রাথমিক যুগে আরবদের কাছে পরিচিত ছিল। এগুলো শস্য ঘন সন্নিবিষ্ট। অর্থাৎ এদের মঞ্জুরীতে থাকে দুই সারি দানার ঠাসা বুনুনি।

এই আয়াতে বিষ্ট ঠাসা-বুনুনির কথা তুলে ধরা হয়েছে তা খুবই সঙ্গত। কারণ খাদ্য শস্যের শিষে সাজানো থাকে খাদ্য দানার ঘন সমাহার।

www.pathagar.com

কোরানের অন্যান্য সূত্র

"তিনি সেই মহান প্রভু যিনি আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেন; এর দ্বারা আমরা সর্ব উদ্ভিদ উৎপন্ন করি; এবং তা থেকে সবুজ ফসল নির্গত করি যা যুগ্ম বীজও উৎপন্ন করে। আর খেজুর বৃক্ষের শীর্ষ থেকে ছড়া বের হয় যা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে এবং আঙ্গুরের বাগান সমূহ, যাইতুন এবং আনার বৃক্ষ উৎপন্ন করি। সাদৃশ্য এবং অসাদৃশ্য প্রত্যেক বৃক্ষের প্রতি লক্ষ্য কর যখন তা ফলবান হয়। আরো লক্ষ্য কর পাকার সময়। এ সমুদয়ের মধ্যে অনেক নির্দেশনা রয়েছে সেসব লোকের জন্য যাদের রয়েছে বিশ্বাস। (আনআম-৯৯)"

"যিনি তোমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে শয্যার মত করে তৈরি করেছেন। চাঁদোয়ার মত করে আকাশসমূহ নির্মাণ করেছেন। আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করেছেন এবং তা দ্বারা তোমাদের খাদ্য হিসেবে ফলমূল উৎপন্ন করেছেন। এসব তথ্য যেহেতু তোমরা জান, তাই আল্লাহপাকের বিরুদ্ধে কোনো প্রতিপক্ষ দাঁড় করিও না। (বাক্বারা-২২)

খেজুর (Dates)

আরব ভূ-খণ্ডে খেজুর বৃক্ষের চাষ অতি প্রাচীন ঘটনা। বলতে গেলে হযরত আদম (আঃ) এর আবির্ভাবের পরেই খেজুর ফলের বাগান গড়ে ওঠে। আর পার্থিব জমিতে সর্ব প্রথম কৃষি কাজ শুরু করেন পৃথিবীর প্রথম মানব আদম (আঃ)। খেজুর বাগানসমূহ এমন সাদৃশ্যপূর্ণ হয়ে থাকে যেগুলো দেখলে মনে হয় যেন ধূসর মরুত সবুজের আনন্দ সম্মিলন। বৃক্ষগুলোতে যখন ফল ধরে তা নীচের দিকে ঝুলে পড়ে এবং খেজুর ফল শর্করা, ক্যালসিয়াম আর ভিটামিন A1, B1, B2 তে অত্যন্ত সমৃদ্ধ। ভেজা খেজুরে শর্করা থাকে ৬০% এবং শুকনা খেজুরে শর্করার পরিমাণ ৭০% প্রাচীন আমলে খেজুরই ছিল আরব, পারস্য এবং উত্তর আফ্রিকার অধিবাসীদের প্রধান খাদ্য। মুহাম্মদ (সাঃ) এর যুগেও খেজুর ছিল প্রধান খাদ্য।

আঙ্গুর (Grapes)

প্রায় ৬৫০০ বছর পূর্বে আঙ্গুরের চাষ শুরু হয় প্রাচীন মিশরে। অতপর এর চাষ ছড়িয়ে পড়ে আরব ভূ-খণ্ডের বিভিন্ন অঞ্চলে পারস্যে (ইরান) এবং এশিয়া ও ইউরোপে। সভ্যতার ক্রমবিকাশের ধারায় এর চাহিদা এবং ব্যবহার বেড়েই চলেছে। আঙ্গুর ফলের চাষের ঐতিহ্য অতি প্রাচীন হলেও বর্তমানে জীন প্রযুক্তির মাধ্যমে এর উৎপাদন বহুগুণ বৃদ্ধি করা হয়েছে। বাংলাদেশেও এখন প্রচুর পরিমাণে আঙ্গুর ফল উৎপন্ন হয়। অতি সুস্বাদু ফল হিসাবে আঙ্গুর সর্বসাধারণের কাছে অতি প্রিয় ফল। মানব দেহের পুষ্টি সাধনের প্রয়োজনীয় উপাদান যথা–আয়রণ, কার্বোহাইড্রেট, সাইট্রিক এসিড, ভিটামিন এ, বি প্রচুর পরিমাণে এতে রয়েছে।

www.pathagar.com

যাইতুন (olives)

মানব সভ্যতার উন্নয়ন মানুষের ইতিহাসের সাথে যাইতুন বৃক্ষ ও যাইতুন ফল নিবিড়ভাবে সম্পর্কযুক্ত। যাইতুনের চেয়ে অতি প্রাচীন ঐতিহাসিক বৃক্ষ দ্বিতীয়টি নেই। সুদূর মধ্যপ্রাচ্যে এটি শান্তি, সমৃদ্ধি, সৌন্দর্য ও শক্তির প্রতীক হিসেবে পরিচিত। এটি শুধু খাদ্য হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। এর তৈল ব্যবহৃত হয় নানা কাজে। যেমন, ঔষধ তৈরিতে, কসমেটিক প্রস্তুত করার জন্য, মেশিনারী এবং সাবান প্রস্তুত কার্যে।

যাইতুন বৃক্ষ প্রায় এক হাজার বৎসর বাঁচে। আল্লাহতাআলা কোরআনে যাইতুনের শপথ করেছেন এর উপকারিতা ও ঐতিহ্য উপলব্ধি করার জন্য।

আনার (Pomegranates) :

আনার ফলের চাষ শুরু হয়েছিল সর্বপ্রথম মিশর এবং মেসোপটেমিয়ায়। হযরত সোলায়মান (আঃ) সেই যুগে আনারের একটি বিরাট বাগান গড়ে তুলেছিলেন বলে জানা যায়। এ ফলটির গঠন প্রকৃতি অত্যন্ত নৈপুণ্যমণ্ডিত। উপরে মোটা শক্ত আবরণ আর ভেতরে থাকে গুটি গুটি দানা। দানাগুলো গুচ্ছাকারে বিভিন্ন চেম্বারে বিভক্ত থাকে। অত্যন্ত পুষ্টিকর ফল, যার মধ্যে রয়েছে প্রচুর আয়রণ, ভিটামিন, মিনারেল সল্ট, শর্করা ইত্যাদি।

পাকা ফল

পাকা ফলের মধ্যে যে আকর্ষণীয় রঙের সমাহার দেখা যায় তা নির্ভর করে বিভিন্ন গাছের রঙের উপর কিংবা গাছের প্রাণ রসবাহী কোষে যে রঙের উপাদান আছে তার আনুপাতিক উপস্থিতির উপর। ক্লোরোফিল হচ্ছে মূল রং যা তার সবুজ রংকে বৃক্ষের পাতা ও ফলের মধ্যে ছড়িয়ে দেয়। এ সবুজ রং ফলের প্রাথমিক গ্রুপ হিসেবে বিবেচিত। রঙের দ্বিতীয় গ্রুপটির ৬০টি র মত গঠন বস্তুর মধ্যে পাওয়া যায়। এদের রঙের ব্যাপ্তি হচ্ছে কমলা হলুদ থেকে টমেটো রাঙা লাল পর্যন্ত সীমিত। রঙের তৃতীয় পরিবারটি এ্যান্থোসাইয়ানীন রং থেকে উদ্ভূত। মৃদু গোলাপী আস্তরণের ব্যাপ্তি থেকে রক্তিম গোলাপী রঙ পর্যন্ত বিস্তৃত। এ্যান্থোসাইয়ানীন নিয়ন্ত্রিত হয় কোষের আস্তের সাহায্যে। সকল পাকা ফলের গায়ে যে লাল রং ফুটে ওঠে তা এ্যান্থোসাইয়ানীন অস্তিত্বের মাধ্যমে প্রকাশ পায় এবং এ ইঙ্গিত দেয় যে, এ ফল এখন খাবার পক্ষে উপযোগী। তখন পাখি, অন্যান্য প্রাণী ও মানুষ ফল খেয়ে ফলের বীজ বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়ে দেয়। এর ফলে বৃক্ষের বিস্তার ঘটে।

কোরআনের আলোচ্য আয়াতে আল্লাহাতাআলা কয়েকটি মূল্যবান বৃক্ষের নাম উল্লেখ করেছেন তার অসীম রহমতের প্রতীক হিসেবে। এরূপ হাজার হাজার ফলের বৃক্ষ গোটা প্রকৃতি জুড়ে রয়েছে যা গুনে শেষ করা যাবে না।

www.pathagar.com

তবে উদ্ভিদ জগত অতিশয় বিশাল। এর প্রজাতি সংখ্যা তিন লক্ষ পঞ্চাশ হাজার। এ প্রজাতিগুলোকে বিস্তৃতভাবে শ্রেণি বিন্যাস করা হয়ে থাকে। এর একটি শ্রেণি হলো সপুষ্পক গাছপালা। আর অন্য শ্রেণি ভুক্ত গাছপালাগুলো হলো অপুষ্পক। অপুষ্পক বৃক্ষরাজির ফুল হয় না। এদের বংশবৃদ্ধি ঘটে অন্যান্য বিবিধ পন্থায়। পরাগায়ন পদ্ধতিতে নয়।

"তাদের জন্য একটি সংকেত হলো নিষ্প্রাণ জমি, আমরা উহাকে সজীব করি এবং তাতে শস্য উৎপন্ন করি। যেন তারা ঐগুলো ভক্ষণ করতে পারে। (ইয়াসিন-৩৩)"

"আর আমরা আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করি যা অতি বরকতময়, অতপর তা দিয়ে বাগান রচি এবং তোলার জন্য খাদ্য শস্য উৎপন্ন করি। (ক্বাফ-৯)"

"আমরা ভূ-পৃষ্ঠকে বিস্তৃত করেছি এবং তার উপর সুদৃঢ় পর্বতমলাস্থাপন করেছি এবং তাতে প্রত্যেক বস্তু আনুপাতিক হারে উৎপন্ন করেছি। আমরা তোমাদের জন্য জীবিকার উপকরণ সৃষ্টি করেছি এবং তাদের জন্যও (কীট-পতঙ্গ, গবাদি পশু, বন্য প্রাণী ও অন্যান্য প্রাণী) যাদের প্রতি তোমাদের কোনো দায়িত্ব নেই। (হিজর-১৯-২০)"

"হে মানব জাতি! আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর। আল্লাহ ভিন্ন এমন কোনো স্রষ্টা আছে, যে আকাশ ও জমিন থেকে তোমাদের রিযিক সরবরাহ করতে পারে? (ফাতির-৩)"

এখানে আকাশ ও জমিন থেকে রিযক দেয়ার অর্থ হচ্ছে বৃক্ষ এবং ফসল বায়ু মণ্ডল আর জমিন থেকে পুষ্টি গ্রহণের মাধ্যমে খাদ্য উৎপন্ন করে। অনন্তর মানুষ এ খাদ্য খেয়ে জীবন রক্ষা করে। অধিকন্তু রিযিক মন্দের অর্থ জীবন ও জড় জগতের "তাবৎ চাহিদা" যা সরবরাহ করে থাকেন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন।

www.pathagar.com

রোমান্টিক খাদ্য মধু ও শিল্প নৈপুন্যে মৌমাছির বাসা

খাদ্যটির নাম মধু। তৎকালীন রাজা বাদশারা বলতেন মিরাকল ফুড বা আশ্চর্য খাবার। সকালের নাস্তা থেকে শুরু করে ডাক্তারী চিকিৎসায় এর ব্যবহার ছিল সমান। এখনো একই গুরুত্ব বহন করে আছে। মোগল আমলে রাজা বাদশাহারা তাদের যৌবন ধরে রাখার জন্য মধু খাদ্যটি নিয়মিত গ্রহণ করতেন। বর্তমানে বিশ্বখ্যাত খেলোয়াড়েরা (Sportsmen) স্ট্যামিনা বৃদ্ধির জন্য এটি গ্রহণ করে। সাহিত্যের ভাষায় এটিকে রোমান্টিক খাদ্য বলা হয়। কেননা জীবনের সকল অপূর্ব মুহূর্তে এর নামটি উচ্চারিত হয়ে থাকে। ফুলের মধু গ্রন্থি থেকে মৌমাছি মধু সংগ্রহ করে। আর তা সংরক্ষণ করে এমন কতগুলো প্রকোষ্ঠে (Cell) যা সুকৌশলে নির্মিত। মৌমাছির বাসা এতই শিল্প নৈপুণ্যতায় মণ্ডিত যা রীতিমত বিস্ময়কর। সমগ্র বাসা (Nest) অসংখ্য ষড়ভুজের (Hexagon) সমষ্টি। অর্থাৎ এক একটি প্রকোষ্ট ৬টি বাহু দ্বারা সীমাবদ্ধ। ২টি বাহু খাঁড়াভাবে এবং চারটি বাহু তির্যকভাবে সংযুক্ত। বাহুগুলো মোমের তৈরি এবং একটি বাসায় পরস্পর সংযুক্ত অসংখ্য প্রকোষ্ট থাকে। যেখানে মধু জমা রাখা হয়। পর্যবেক্ষণ করে দেখা গেছে মৌমাছি বাসা নির্মাণের জন্য তিনটি স্থান সবচেয়ে বেশি পছন্দ করে থাকে।

(১) পাহাড়ের কোল

(২) বৃক্ষ ডাল

(৩) বাড়ি ঘরের ছাদ।

একটি বাসায় কেবল একজন রানি মৌমাছি থাকে এবং হাজার হাজার কর্মী মৌমাছি (স্ত্রী) কঠোর পরিশ্রম স্বীকার করে মধু সংগ্রহ করে। এ কাজে কেউ এতটুকু অলসতা প্রদর্শন করেছে কিনা সে বিষয়ে সবাই রানির কাছে জবাবদিহি করতে বাধ্য থাকে।

মধুতে দু'রকম শর্করা পাওয়া যায়। গুকোজ এবং ফ্রুক্টোজ। এ দুটি উপাদান মধুর প্রধান উপকরণ। এতে সামান্য পরিমাণে সুক্রোজ ও মল্টোজ রয়েছে।

মধুতে কার্বোহাইড্রেট ৭৯.৫%, প্রোটিন ০.৩%, আয়ন-০.৭% হারে বিদ্যমান।

www.pathagar.com

ডাক্তারী ভাষায় মধুকে বলা হয় ডিটারজেন্ট টু আলসার। মেডিসিন হিসেবে মধু ব্যাকটেরিয়ার এক নম্বর শত্রু। অর্থাৎ এটি এন্টিবায়োটিকের মত কাজ করে। ওরাল ডিহাইড্রেশনে মধুকে চিনির পরিবর্তে ব্যবহার করা হয়। যা ডায়রিয়া প্রতিকারে বিশেষ কার্যকর। কণ্ঠস্বর সবল করার জন্য মধুর শরবত অত্যন্ত উপকারী। বিজ্ঞানীরা গবেষণা করে দেখেছেন যে, মধু রোগ জীবাণু খুব কার্যকর ভাবে ধ্বংস করে।

কোরআনের মধু তত্ত্ব-

"আপনার প্রভু মধুমক্ষিকাকে এ মর্মে ওহী করেছেন, তোমরা গাছের ডালে, পাহাড়ে এবং ঘরবাড়ীর ছাদে বাসা (মৌচাক) নির্মাণ কর। অতপর সর্বপ্রকার ফল থেকে ভক্ষণ কর এবং আপন প্রভুর পথে চল যা অতি সরল। তার পেট থেকে বিভিন্ন রঙ্গের পানীয় (মধু) নির্গত হয়। তাতে মানুষের জন্য রয়েছে রোগের প্রতিকার। নিশ্চয়ই এতে চিন্তাশীল সম্প্রদায়ের জন্য রয়েছে নির্দেশনা। (নাহল-৬৮-৬৯)"

ক্লোরোফিল মুক্ত গাছপালা ও কোরানিক সূত্রঃ

গাছ-পালার মধ্যে এমন কিছু গাছ আছে যাদের ক্লোরোফিল নেই। সেজন্য কার্বোহাইড্রেট উৎপন্ন করতে পারে না। এরা জীবন ধারণের জন্য মৃত এবং ক্ষয়িষ্ণু জৈব পদার্থের উপর নির্ভর করে। অথবা পঙ্গপালের মত জীবন্ত জীবকোষের উপর বসে তার রস চুষে নিয়ে বেঁচে থাকে। এসব অসবুজ গাছপালার বৃদ্ধিও নির্ভর করে আর্দ্রতার উপর। যে আর্দ্রতা বৃদ্ধি পায় বৃষ্টিপাতের কারণে।

ক্লোরোফিল মুক্ত গাছপালার সাধারণ সংজ্ঞার মধ্যে পড়ে যে সকল ভোজ্য খাদ্যদ্রব্য, চাল, গম, যাব, খেজুর, আম, কাঁঠাল, আপেল, আনারস, এমনকি বাদাম, ডাল, শিম, মটরশুঁটি ইত্যাদি। এসব খাদ্যদ্রব্য আমাদের দৈহিক বৃদ্ধি ও স্বাস্থ্য গঠনের জন্য একান্ত অপরিহার্য।

"আর (স্মরণ কর) যখন তোমরা বলেছ, "হে মুছা (আঃ)! আমরা তো একই রকম খাদ্য খেয়ে থাকতে পারব না। তাই আপনার প্রভুর নিকট আমাদের পক্ষে মিনতি পেশ করুন ভূ-পৃষ্ঠে যেসব খাদ্য জন্মে যেমন, সুগন্ধি সবজি, শশা, গম, মসুর ও পিঁয়াজ প্রভৃতি দেয়ার জন্য।" প্রতি উত্তরে তিনি (মুছা আঃ) বললেন, "তোমরা কি উত্তম খাদ্যের বিনিময়ে নিম্নমানের খাদ্য চাও? তাহলে যে কোন শহরে চলে যাও। তোমরা যা কামনা করছ সেখানে তা পাবে। আর তাদের উপর আরোপিত হলো লাঞ্ছনা ও দুর্গতি। তারা আল্লাহর রোষানলে পতিত হয়ে ঘুরতে লাগল। ০৯ বাকারা-৬১)"

www.pathagar.com

মান্না ও সালওয়া খাদ্য দুটি সুষমভাবে একত্রিত করা হলে প্রয়োজনীয় ক্যালরি পাওয়া যায়। এ মিশ্রিত খাদ্য বস্তু সহজে হজম হয়ে প্রোটিন (Protein) ভিটামিন এবং অতি প্রয়োজনীয় এ্যামিনো এসিডের চাহিদা মেটায়। তাই অত্যাধিক পুষ্টিমান সমৃদ্ধ মান্না ও সালওয়া আল্লাহপাক মেহেরবানী করে পাঠিয়েছিলেন বনী ইসরাঈলীদের প্রতি। তারা এ খাদ্য বস্তু দুটির প্রতি সন্তুষ্ট না থেকে কিংবা আল্লাহতাআলার প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন না করে ঐসব খাদ্যদ্রব্য (শাক-সবজি, গম, ডাল, পিঁয়াজ) দাবী করলো যেগুলো পুষ্টির দিক থেকে মান্না ও সালওয়ার স্থান দখল করতে পারে না।

আলোচ্য আয়াতে উদ্ভিদ গোত্রভুক্ত পাঁচ প্রকার খাদ্যবৃক্ষের উল্লেখ করা হয়েছে এবং এসব খাদ্যবৃক্ষ (food plants) সেই সময়ে মিশরে বিদ্যমান ছিল যখন হযরত মুছা (আঃ) নেতৃত্বে বনী ইসরাঈলীরা মিশর ত্যাগ করেছিল। খাদ্যবস্তুগুলোর পুষ্টিমানের সংক্ষিপ্ত বর্ণনা নিয়ে পেশ করা হলো যাতে কগের মান্না ও সালওয়ার পুষ্টিগুলোর গুরুত্ব উপলব্ধি করা যায়।

সুগন্ধি সবজি

আরবী বাকলুন শব্দের অর্থ খাদ্যাদি সুগন্ধ ও সুস্বাদু করণার্থ লতাপাতা। যেমন, ধনেপাতা, পিয়াজ ও রসুনের সবুজপাতা ইত্যাদি। এ শব্দ দ্বারা ব্যাপক অর্থে শাক-সবজি জাতীয় খাদ্যকেও বুঝানো হয় যেগুলো রান্না করে তৃপ্তি সহকারে আহার করা যায়। যেমন, বাঁধাকপি, শালগম, সরিষা ও পালং শাক। এসব সবজির পাতা রসালু ও সুস্বাদু। ধনেপাতা কিংবা অন্যকোন সুগন্ধিযুক্ত লতাপাতা উল্লেখিত শাক-সবজীর সাথে মিশ্রিত করা হলে সেসবের স্বাদ আরও বেশি বৃদ্ধি পায়। বনী ইসরাঈলীরা হয়তো বা এ ধরনের খাদ্য সামগ্রীর আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিল। কিন্তু এ জাতীয় খাদ্যের পুষ্টিমান মান্নার সমক্ষ কখনো হবে না।

শশা

শশা গ্রীষ্মকালীন এক প্রকার সবজি এবং উদ্ভিদ। পৃথিবীর প্রায় সবদেশে শশা জন্মায়। এমনকি শীত প্রধান দেশে কাচঘরের নিয়ন্ত্রণ তাপ ও আর্দ্রতায় এর চাষ করা হয়। মিশরে এটার চাষ শুরু হয়েছিল দ্বাদশ রাজবংশের আমলে শশার খাদ্যমান প্রধানত শর্করা ও ভিটামিনের মধ্যে পরিব্যাপ্ত। এতে পানির পরিমান ৯৫%, প্রোটিন ০.৭%, চর্বি ০.১% শর্তরা ৩.৪% এবং ছিলকা ০.৪%।

কচি অবস্থায় শশাকে সালাদ হিসেবে এবং রান্না করে তরকারী হিসেবে খাওয়া হয়। এটি বাংলাদেশের একটি প্রধান সবজি।

www.pathagar.com

রসুন ও প্রতিষেধক ঔষধ

রসুনের বৈজ্ঞানিক নাম Allium sativum. এটি বহু হাজার বছর ধরে একমাত্র আবাদি শস্য হিসেবেই পরিচিত। রসুনের উৎপত্তিস্থল মধ্যএশিয়ায় বলে মনে করা হয় এবং অতি প্রাচীনকালে সেখান থেকে ভূমধ্যসাগরীয় এলাকায় বিস্তার লাভ করে। মিশরে আজ থেকে ৫০০০ বছর পূর্বে ফেরাউনের রাজত্বকালে খাদ্যরূপে এটি পরিচিত ছিল।

প্রাচীনকাল থেকে নানা অসুখে রসুনকে ঔষধ হিসেবে ব্যবহার করা হতো। যেমন রসুনকে সব ধরনের বিষাক্ত দ্রব্যের প্রতিষেধক ঔষধ মনে করা হতো। রসুনের Allicin দ্রব্যে ব্যাকটেরিয়া নাশক গুণ বর্তমান।

রসুনকে সর্দি কাশি সহ বিভিন্ন রোগের কার্যক্ষমতা বাড়াতে রসুন বেশ কার্যকর বলে মনে করা হয়। রসুনে–৬৪% পানি, ৭% প্রোটিন, ২৮% শর্করা, সামান্য পরিমান ফেট, আঁশ ও ১% ছাই থাকে।

এর মধ্যে Allionin নামে এ্যামিনো এসিড ভেঙ্গে Allicin তৈরি হয় যার প্রধান উপকরণ হচ্ছে Diallyl disulphide যা রসুনের তীব্র গন্ধের জন্য দায়ী।

বনী ইসরাঈলীদের যারা এ খাদ্যের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিল, খাদ্যের স্বাদ ও সুগন্ধি বৃদ্ধি করার জন্য এরা রসুন ব্যাপকভাবে ব্যবহার করতো।

গম

গমের ১২টি প্রজাতি আছে। গমের বৈজ্ঞানিক নাম Triticum decoccum প্রাগৈতিহাসিক সময় থেকে গমের চাষ চলে আসছে। এদের মধ্যে এমার (Emmer) প্রজাতির গম প্রাচীনতম। জানা গেছে প্রাচীন মিশরে এমার গমের চাষ প্রথম শুরু হয়েছিল। গমের দানা থেকে আজকাল নানা ধরনের খাদ্য তৈরি হয়। গমের পুষ্টিমান থাকার কারণে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে এটাকে প্রধান খাদ্যের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একটি গমের দানায় খাদ্য গুণের পারিমাণ ১৩%, প্রোটিন ১২%, ফেট ২% শর্করা ৭০% এবং ফাইবার ২% বর্তমান থাকে। গম বাংলাদেশের দ্বিতীয় প্রধান খাদ্যশস্য।

মসুর

মসুরের প্রথম উৎপত্তি তুরস্কের দক্ষিণাঞ্চলে। আরবী 'আদাস' শব্দের অর্থ মসুর ডাল। এর বৈজ্ঞানিক নাম Lens culinaris Medik। পরে এটি গ্রীস, মধ্য ও দক্ষিণ ইউরোপ, মিশর, ইথিওপিয়া, ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল, আফগানিস্তান, ভারত, পাকিস্তান, বাংলাদেশ ও চীনে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে। এটি শীত প্রধান অঞ্চলের শস্য হলেও প্রায় গ্রীষ্মমণ্ডল অঞ্চলে শীতকালে এবং গ্রীষ্মমণ্ডলে অধিক উচ্চতায় ঠাণ্ডা ঋতুতে জন্মে। মসুর ছোট্ট দানাদার সিম জাতীয় ডাল।

www.pathagar.com

মসুর ডালের দানাতে পানি থাকে ১১.২%, প্রোটিন ২৫%, চর্বি ১% শর্করা ৫৬% এবং ফাইবার ৩% বিদ্যমান।

পিঁয়াজ

পিঁয়াজের উৎপত্তি ইরান, পাকিস্তান এবং ঐ দেশগুলির উত্তরবর্তী পাহাড়ী অঞ্চলে। আরবী 'বাসাল অর্থ পিঁয়াজ। পিঁয়াজের বৈজ্ঞানিক নাম Allium cepa অতি প্রাচীনকাল থেকে ভারতবর্ষে এবং মধ্যপ্রাচ্যে পিঁয়াজের চাষ হয়ে আসছে। প্রাচীন মিশরে পিঁয়াজ ছিল একটি জনপ্রিয় খাদ্য। একটি পরিপক্ষ পিঁয়াজের পানি থাকে ৮৬%, প্রোটিন ১.৪০%, চর্বি ০.২%, শর্করা ১১% একং ফাইকার (Fiber) ০.৪%।

পিঁয়াজ এমন একটি শস্য যা মাছ, মাংস, শাক-সবজি এবং সালাদ তৈরি করে খাওয়া হয়। পিঁয়াজের সবুজ পাতা খাদ্যের স্বাদ ও সুগন্ধ বৃদ্ধির জন্য ব্যবহার করা হয়।

অতএব, উল্লেখিত শাক-সবজি ও শস্যদানা বিশ্বময় জনপ্রিয় ও অপরিহার্য খাদ্যবকস্তু হিসেবে সমাদৃত। মিশর থেকে বিতাড়িত বনী ইসরাঈলীরা পূর্বে এসব খাদ্যদ্রব্যের স্বাদ উপভোগ করেছিল। তাই উন্মুক্ত মরুভূমির যাযাবর জীবনে পতিত হয়ে এসবের আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিল মান্না ও সালওয়ার পরিবর্তে। কিন্তু মানুষের অধিক পুষ্টির জন্য কিছু বিশেষ ধরনের খাদ্যপ্রাণের প্রয়োজন হয়। এ্যামিনো এসিড একটি বিশেষ জৈব উপাদান যা শাক সবজি জাত প্রোটিনের মধ্যে পাওয়া যায় না। মান্না শর্করা জাতীয় খাদ্য যার মধ্যে আছে সুক্রোজ (sucrose3), লেভুলোজ (Levulose), গ্লুকোজ (glucose) এবং ডেক্সট্রিন (dextrin)। এ গুলো খাওয়ার সাথে সাথে মানুষের শরীরে শক্তি সহ্চারিত হয়। কিন্তু গম তা পারে না। কারণ গমে যে স্টার্চ থাকে খাওয়ার পর প্রথমে সেটা গ্লুকোজে পরিণত হয়। তাই সে সরাসরি শক্তির যোগান দিতে পারে না। ডালজাত প্রোটিনের পুষ্টিমান কিছুটা বেশি (২০%)। কিন্তু ডে প্রোটিন কোয়েল পাখির (সালওয়া) মাংস থেকে পাওয়া যায়।

www.pathagar.com

সালোক সংশ্লেষণ আকাশ থেকে খাবার

সবুজ বৃক্ষ এবং ফসল সূর্যালোক থেকে শক্তি গ্রহণ করে পানি ও কার্বন ডাইঅক্সাইডের রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা শর্করা (carbohydrate) নামক খাদ্য তৈরি করে। এ প্রক্রিয়াকে সালোক সংশ্লেষণ বলা হয়।

সালোক সংশ্লেষণ সংগঠিত হওয়ার জন্য পানি কার্বন ডাইঅক্সাইড ক্লোরোফিল প্রয়োজন। উদ্ভিদ ও ফসল মূল শিকড়ের সাহায্যে মাটি থেকে পানি শোষণ করে তা পাতা ও অন্যান্য অঙ্গে পৌছে দেয়। বায়ু থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে। উদ্ভিদের পাতায় ক্লোরোফিল অণু থাকে। ক্লোরোফিল সূর্যালোক থেকে ফোটন (Photon) নামক আলোক কণা ধারণ করে উত্তেজিত হয়। যার ফলে একটি জটিল রাসায়নিক বিক্রিয়া দ্বারা শর্করা প্রস্তুত হয়।

উদ্ভিদ ছাড়া আর কোন প্রাণী নিজের খাদ্য (শর্করা) নিজে তৈরি করতে পারে না। অনন্ত অসীম প্রভু সালোক সংশ্লেষণ বিষয়ে কোরআন মজিদে তত্ত্ব পেশ করেছেন, "তিনি-ই সে সত্ত্বা, যিনি ইঙ্গিত সমূহ প্রদর্শন করেন এবং তোমাদের জন্য আকাশ থেকে খাদ্য সম্ভার সরবরাহ করেন (মু'মিন-১৩)"

এখানে আকাশ থেকে খাদ্য সম্ভার সরবরাহ করার অর্থ হচ্ছে সূর্যের আলো থেকে বৃক্ষরাজি ও ফসল সালোক সংশ্লেষণ (Photosyntheis) প্রক্রিয়ায় নিজেদের খাদ্য (শর্করা) তৈরি করে পরিপুষ্ট হয়। অতপর মানুষের জন্য খাদ্য-শস্য উৎপন্ন করে। আধুনিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা চালিয়ে দেখেছেন যে, প্রাকৃতিক প্রতিকূল অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতে অন্ধকার পর্যায়েও সালোক সংশ্লেষণ ঘটতে পারে। উদ্ভিদ সূর্যের আলো থেকে এডিনোসিস ট্রাই ফসফেট (ATP) নামক এক ধরনের অণু দেহের মধ্যে রিজার্ভ করে রাখে। সূর্যের আলো যখন থাকে না তখন ATP র সহায়তায় H_2 অণুর রাসায়ণিক বিক্রিয়ায় Co_2 বিজারণের মাধ্যমে শর্করা (Carbohydrate) তৈরি করে নেয়।

"মহিমাদীপ্ত আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডল ও ভূ-মণ্ডল সৃষ্টি করেছেন এবং আলো-আঁধার সৃষ্টি করেছেন। (আনআম-১)"

সালোক সংশ্লেষণ বিক্রিয়ায় উদ্ভিদ ও ফসল বাতাসে প্রচুর পরিমাণে অক্সিজেন ছেড়ে দেয় এবং বাতাস থেকে কার্বন ডাইঅক্সাইড গ্রহণ করে নেয়। পক্ষান্তরে

www.pathagar.com

মানুষ শ্বাস প্রশ্বাসের মাধ্যমে বায়ু থেকে অক্সিজেন গ্রহণ করে। আর কার্বন ডাইঅক্সাইড ত্যাগ করে।

"আল্লাহতাআলার অসংখ্য নিদর্শনের মধ্যে একটি হচ্ছে আকাশে বিদ্যুৎ চমকে, যার মধ্যে ভয়ও আছে আশাও আছে এবং তিনি আকাশ থেকে বারি বর্ষণ করে নির্জীব জমিনকে সজিব করেন। অবশ্যই এ সবের মধ্যে প্রকৃত সংকেত রয়েছে তাদের জন্য যারা জ্ঞান রাখে। (রুম-২৪)"

"তিনি আল্লাহ যিনি বিজলী প্রদর্শন করেন। যা ভয় এবং আশার সঞ্চার করে। আর বৃষ্টি কণা সহ মেঘমালাকে ঊর্ধ্বে ওঠান। (রাদ-১২)

কোরআনে বর্ণিত বিজলীতে ভয়ও আশা

আকাশে যখন বিদ্যুৎ স্পার্কিং হয় তখন কোরআন বলছে, এ ঘটনায় ভয় এবং আশা উভয়ই বিদ্যমান।

ভয়

ভয় কিসের? ভয় হচ্ছে, বজ্রপাতের কারণে জীবন সংহারের ভয়। সম্পদ ধ্বংস হওয়ার ভয়। বিকট শব্দে শ্রবণ শক্তি নষ্ট হওয়ার ভয়। কিন্তু আশাটা কী!

বিজলীতে আশা

আল্লাহ আশার কথা বলে জ্ঞানী লোকদের মনোযোগ আকর্ষণ করেছেন। কারণ জ্ঞান ব্যতীত আল্লাহর আয়াত অনুধাবন করা অসম্ভব।

বায়ুতে রয়েছে প্রচুর পরিমাণে নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন।। মেঘে ঢাকা আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকে তখন বায়ুর নাইট্রোজেন এবং অক্সিজেন-এর মধ্যে রাসায়নিক বিক্রিয়া সংগঠিত হয়ে

নাইট্রেট নামক যৌগমূলক সৃষ্টি হয়। বৃষ্টিধারার সাথে উক্ত নাইট্রোজেন মাটিতে নেমে আসে। মাটিতে অবস্থিত সোডিয়াম, ক্যালসিয়াম, ম্যাগনেসিয়াম ইত্যাদি উপাদানের সাথে নাইট্রেটের বিক্রিয়া ঘটে, যার ফলে সৃষ্টি হয় সোডিয়াম নাইট্রেট ক্যালসিয়াম নাইট্রেট, ম্যাগনেসিয়াম নাইট্রেট ইত্যাদি। আর এসব রাসায়নিক পদার্থ বৃক্ষ এবং ফসলের খাদ্য। আকাশে যতবেশি বিজলী চমকে ততবেশি এসব খাদ্য তৈরি হয়। ফলে রাতারাতি ফসলের চেহারা পালটে যায় এবং অধিক পরিমাণে ফসল আর ফসল উৎপন্ন হয়। অতএব, উপরোক্ত প্রক্রিয়ায় ফসলের খাদ্য তৈরি হয় কেবল আকাশে বিদ্যুৎ স্পার্কিং হলে। তা না হলে তো নয়। তাই আয়াতে আল্লাহতাআলা যে আশার কথা বলেছেন তা এখন বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা থেকে বুঝা গেল।

www.pathagar.com

পরাগায়ণ বা উদ্ভিদের তত্ত্ব :

পরাগায়ণ হচ্ছে উদ্ভিদের মিলন তত্ত্ব। পুংরেণু এবং স্ত্রী রেণু। উভয় রেণুর মিলন হলেই ফল সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পুংরেণু, স্ত্রীরেণু পর্যন্ত পৌঁছার জন্য দুটি মাধ্যম কাজ করে। একটি হচ্ছে বায়ু প্রবাহ অপরটি কীটপতঙ্গ।

বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে পুলিন উড়ে উড়ে চার প্যাশের ফুলের উপর গিয়ে পড়ে। ফলে পুংরেণু দ্বারা স্ত্রীরেণু নিষিক্ত হয় এবং ফল সৃষ্টি হয়।

আবার প্রজাপতি, ভ্রমর, মৌমাছি প্রভৃতি যখন ফুলের উপর বসে তখন পুলিন তাদের পাগুলো জড়িয়ে ধরে। পরক্ষণে ওরা যখন অন্য ফুলের উপর গিয়ে বসে, তাদের পায়ে জড়ানো রেণু বিপরীত রেণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেক (fertilization) ঘটায়। ফলে ফুলে মিলনের এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরাগায়ণ।

পরাগায়ন সম্পর্কে-কোরআনের ঐশী বাণী

"মহামহিম প্রভু তিনি, যিনি মাটি থেকে উদগত সবকিছু এবং তাদের নিজেদের মধ্যে আর তারা জানে না এমন বস্তু সমূহের মধ্যে জোড়া সৃষ্টি করেছেন। (ইয়াসীন-৩৬)"

"আর আমরা ফলদানকারী (গর্ভ দানকারী) বাতাস প্রেরণ করি। হিজর-২২)"

"আর তিনি প্রত্যেক ফল দুই-দুই জোড়া থেকে সৃষ্টি করেছেন। (রাআদ-৩)"

মহান আল্লাহতাআলা তার সৃষ্টি জগতের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে জোড়া ভিত্তিক ব্যবস্থা বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন। পদার্থ জগত, প্রাণীজগত এবং উদ্ভিদ জগতে বিপরীত জোড়া যেমন আছে তেমনি পরমাণুর মধ্যে রয়েছে জোড়া। পুলিন, Sperm, Ovum, ক্রোমোজোম, জীন DNA, RNAপ্রভৃতি জৈবিক উপাদানের মধ্যেও জোড়া ভিত্তিক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। সমগ্র সৃষ্টি জুড়ে জোড়া ব্যবস্থা না থাকলে পদার্থ জগতের সম্প্রসারণ ঘটতো না। উদ্ভিদ ও প্রাণী জগতের বংশ বিস্তারের ধারা থেমে যেত। গোটা সৃষ্টি প্রাণহীন আড়ষ্টতায় পর্যবসতি হয়ে যেত।

উদ্ভিদ মাটি বিদীর্ণ করে ওঠে এবং অনড় দাঁড়িয়ে থাকে। তাহলে এদের মিলন ঘটবে কিভাবে। হ্যাঁ, মিলন ঘটবার কৌশলগত ব্যবস্থা রয়েছে। বৃক্ষ ও

www.pathagar.com

তরুবীথির যে ফুল সৃষ্টি হয়, তার পরাগধানীতে থাকে পুষ্পরেণু বা পুলিন। পুলিন দু'প্রকার। পুংরেণু এবং স্ত্রী রেণু। উভয় রেণুর মিলন হলেই ফল সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে পুংরেণু, স্ত্রীরেণু পর্যন্ত পৌছার জন্য না দুটি মাধ্যম কাজ করে। একটি হচ্ছে বায়ু প্রবাহ অপরটি কীটপতঙ্গ।

বায়ু প্রবাহের মাধ্যমে পুলিন উড়ে উড়ে চার পাশের ফুলের উপর গিয়ে পড়ে। ফলে পুংরেণু দ্বারা স্ত্রীরেণু নিষিক্ত হয় এবং ফল সৃষ্টি হয়। আবার প্রজাপতি, ভ্রমর, মৌমাছি প্রভৃতি যখন ফুলের উপর বসে তখন পুলিন তাদের পা গুলো জড়িয়ে ধরে। পরক্ষণে ওরা যখন অন্য ফুলের উপর গিয়ে বসে, তাদের পায়ে জড়ানো রেণু বিপরীত রেণুর সাথে মিলিত হয়ে নিষেক (fertilization) ঘটায়। ফলে ফুলে মিলনের এ প্রক্রিয়াকে বলা হয় পরাগায়ণ (Pollination)।

কোনো কোনো পুংকেশর ও স্ত্রীকেশর উভয়ই থাকে। বায়ু প্রবাহের প্রভাবে এরা যখন দোল খায় তখন পারস্পরিক মিলন ঘটে। যেমন, খেজুর ফল, পাপিয়া ইত্যাদি।

www.pathagar.com

ভূ-বিজ্ঞান ও সামুদ্রিক ভূ-বিজ্ঞান

অশান্ত পৃথিবী যেখানে আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত সমুদ্রের জলোচ্ছ্বাস, ভূ-পৃষ্ঠের কম্পন। ভূ-পৃষ্ঠের উপরে এ-ই যে পরিবর্তন এর শুরুর মধ্যে আজ থেকে প্রায় ৪৬০ কোটি বছর আগে, যে দিন পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল। দূরন্ত পৃথিবীর জলে স্থলে সব সময়ে চলেছে এক জটিল পরিবর্তনের পালা। অনেক প্লাবন দুর্যোগ পেরিয়ে মানুষ বুঝতে পেরেছিল পৃথিবীকে কখনোই শান্ত বলা চলে না। পৃথিবীর এ বিচিত্র পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানব জাতির জন্য পৃথিবীকে বাস উপযোগী হয়েছে। স্রষ্টা ভূ-পৃষ্ঠকে সবুজ গালিচার মত করে সাজিয়ে দিয়েছেন। সেখানে ফসল, তৃণলতা ও নানা প্রকার পুষ্টিকর ফল উৎপন্ন হওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় উর্বরতা দান করেছেন। আকাশকে প্রতিরক্ষা ছাদ হিসেবে ভূ-পৃষ্ঠের উপর প্রবাহিত করেছেন। তাই ভূ-পৃষ্ঠের গঠন প্রকৃতি এবং উপযোগীতা বিশ্লেষণের জন্য জন্ম নিয়েছে ভূ-বিজ্ঞান Geology। সমুদ্র ভূ-বিজ্ঞান Marine Geology এরই একটি শাখা।

রাসায়নিক মিশ্রণ ও মাটির উপকরণ

ভূ-পৃষ্ঠের গঠন The earth's structure

ভূ-পৃষ্ঠের মাটির গঠন প্রকৃতি এমন, যা সহজে ম্যানেজ করা যায়। অর্থাৎ খনন করা যায়। সমতল করে পথ তৈরি করা যায়। মাটি পানিতে গলে নরম হয়। আবার শুকালে শক্ত হয়। মাটি সহজে ভাঙ্গা যায়। সৃষ্টির পর পৃথিবী প্রথমে ছিল গ্যাসীয় অবস্থায়। তারপর তরল অবস্থায়। ক্রমান্বয়ে তাপমাত্রা হ্রাস পেতে পেতে পৃথিবী আজকের অবস্থায় এসে পৌছেছে।

প্রকৃতিগত বৈশিষ্ট্যের কারণে মাটি অনেগুলো রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ। যেমন

অক্সিজেন,
সিলিকন,
আয়রণ
এলুমিনিয়াম,

www.pathagar.com

ক্যালসিয়াম,
সোডিয়াম,
পটাসিয়াম,
ম্যাগনেসিয়াম,
মলিবডেনাম,
বোরন

প্রভৃতি রাসায়নিক পদার্থ মাটিতে বিদ্যমান থাকায় মাটির নমনীয় বৈশিষ্ট্য সৃষ্টি হয়েচে। এর উর্বরতা যেমন তৈরি হয়েছে তেমনি মাটিকে ইচ্ছামত ব্যবহার করে মানুষ প্রয়োজনীয় সুবিধা গ্রহণ করছে। মাটি বিদীর্ণ করে ওঠা বৃক্ষ, তরুলতা আর ক্ষেতের ফসল নানা রকম খাদ্য উৎপন্ন করে। একই মাটি থেকে উদগত বৃক্ষ ফল দেয় কোনোটা মিষ্টি, কোনোটা তিক্ত, আবার কোনোটা স্বাদ-গন্ধহীন। সৃষ্টির এ বৈচিত্র্য কোনো বৈশিষ্ট্যের কারণে সৃষ্টি হয়েছে বিজ্ঞানীদের কাছে তা এখনো রহস্যময়।

ভূ-পৃষ্ঠের খিল The earth's pegs

প্রায় ২৫ কোটি বৎসর পূর্বে ভূ-পৃষ্ঠ বর্তমান অবস্থার মত ছিল না। সে সময়ে ভূ-গর্ভে চলছিল ভূমি ধস, ভূমিকম্প এবং ভাঙ্গা গড়ার খেলা। ফলে ভূমির পৃথিবী ভাঙ্গা গড়ায় পড়ে খণ্ড বিখণ্ড হয়ে যায়। আর সংকোচন ও প্রসারণের ফলে ভূ-পৃষ্ঠে উচু-নিচু ভাঁজ পড়ে যায়। বিশাল ভূ-পৃষ্ঠ জুড়ে সেরকম কোথাও পাহাড়ের ঢেউ গড়ে ওঠে, কোথাও সমতল ভূমি, কোথাও সাগর, মহাসাগর এবং নদ-নদী সৃষ্টি হয়। এরপর পর্বতগুলো ভূ-পৃষ্ঠের খিলের মত বা পেরেকের মত গ্রথিত হয়ে বসে। যার ভূমিকম্প বন্ধ হয় এবং ভূ-পৃষ্ঠে স্থিরতা প্রতিষ্ঠিত হয়। পৃথিবী পৃষ্ঠের পরিবর্তনের এ সময়কে বলা হয় মধ্যজীবীয় অধিযুগ ভূ-বিজ্ঞানে পর্বত সৃষ্টির আর একটি তত্ত্ব উল্লেখ আছে। তত্ত্বটির নাম সংকোচন তত্ত্ব। এ তত্ত্ব অনুযায়ী জন্মের সময় পৃথিবী ছিল ফুটন্ত তরল গোলাকার বলের মত। ক্রমে সেই উত্তপ্ত তরল বলটি ঠাণ্ডা হতে হতে তার উপরে তৈরি হয় ফলের খোসার মত ভূ-ত্বক। ভূ-ত্বক তৈরি হলেও ভূ-ত্বকের নিচে তরল শিলারাশির ঠাণ্ডা হওয়া থামেনি। সেগুলো জুড়িয়ে ঠাণ্ডা হয়ে ক্রমেই আকারে ছোট হয়ে আসে। এ ছোট হওয়া বা সংকোচনের ফলে বাইরের ভূ-ত্বক কুঁচকে গিয়ে পর্বতের ভাঁজ তৈরি হয়েছে।

আধুনিক ভূ-বিজ্ঞানীরা গবেষণা দ্বারা প্রমাণ করেছেন যে, ভূমির উপর পাহাড়গুলো কীলকের মত প্রতিষ্ঠিত হওয়োয় ভূ-পৃষ্ঠে ভারসাম্য সৃষ্টি হয়েছে। এবং ভূমিকম্পের ধ্বংস যজ্ঞ থেকে পৃথিবীবাসী অনেকখানি রক্ষা পেয়েছে।

www.pathagar.com

ভূ-বিজ্ঞান ও সামুদ্রিক ভূ-বিজ্ঞান নিয়ে কোরানিক তথ্য

"তিনি আমাদের জন্য ভূ-পৃষ্ঠকে চলার উপযোগী করেছেন। অতএব, তোমরা তার উপর বিচরণ কর এবং তাঁর প্রদত্ত খাদ্য উপভোগ কর। (মূলক-১৫)"

"আল্লাহতা'আলা ভূ-পৃষ্ঠকে গালিচার মত সৃষ্টি করেছেন এবং তার উপর তোমাদের জন্য পথ তৈরি করে দিয়েছেন যেন তোমরা চলাচল করতে পার। (ত্বোয়াহা-৫৩)"

"আর তিনি ভূমিতে প্রতিষ্ঠিত করেছেন সুদৃঢ় পাহাড় যেন তা তোমাদেরকে নিয়ে হেলে দুলে না পড়ে এবং নদী ও পথ তৈরি করেছেন যাতে তোমরা সঠিক পথ লাভ করতে পার। (নাহল-১৫)"

"আমরা ভূমিকে বিদীর্ণ করেছি, এরপর তাতে উৎপন্ন করেছি শস্য,
আর আঙ্গুর শাক-সবজী, আর যাইতুন, খেজুর, আর ঘন উদ্যান,
আর ফল ও তৃণ, তোমাদের জন্য এবং তোমাদের চতুষ্পদ
জন্তুদের জন্য।(আবাছা-২৬-৩২)

কোরআনের ঐশী বাণী

আমরা পর্বতমালাকে পেরেক হিসেবে সৃষ্টি করেছি। (নাবা-৭)

"এবং তিনি পৃথিবীর উপর সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছেন যেন তোমাদেরকে নিয়ে হেলে না পড়ে এবং নদীপথ ও স্থলপথ তৈরি করেছি যাতে তোমরা পথ প্রদর্শিত হও। (নাহল-১৫)"

"আমরা পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বত স্থাপন করেছি যাতে তাদেরকে নিয়ে পৃথিবী ঝুঁকে না পড়ে এবং তাতে প্রশস্ত পথ রেখেছি যাতে তারা পথ প্রাপ্ত হয়। (আম্বিয়া-৩১)"

"তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা, যাতে পৃথিবী তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে। (লোকমান-১০)"

উপরোক্ত আয়াত সমূহ থেকে স্পষ্টত প্রতীয়মান হচ্ছে পর্বতগুলো ভূ-পৃষ্ঠকে ব্যালেন্স পজিশনে রেখেছে যা আধুনিক বিজ্ঞানীরা গবেষণা দ্বারা কোরআনের তথ্যগুলোর যথার্থতা প্রমাণ করেছেন। ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত পাহাড়সমূহকে পাঁচ ভাগে ভাগ করা হয়েছে। এবং প্রত্যেক শ্রেণির পাহাড়ের আলাদা বৈশিষ্ট্য ও কার্যকারণ রয়েছে।

১. ভঙ্গিল পর্বত :

এ ধরনের পর্বত সৃষ্টি হয়েছে সমুদ্রের নিচে পলি জমে জমে যে পাললিক শিলাস্তর গড়ে ওঠে। দামাল প্রকৃতির নানা শক্তির চাপে সেই শিলাস্তরে ভাঁজ

www.pathagar.com

পড়ে ক্রমেই তা পাহাড়ে রূপ নেয়। যেমন হিমালয়, আল্পস পাহাড় তৈরি হতে অন্তত ২-৩ কোটি বছর সময় লেগেছে।

২. স্তূপ পর্বত :
সমতল ভূমি থেকে কোন পাথুরে অংশ ফাটল বরাবর ঠেলে বেরিয়ে এসে কিংবা নীচে ধসে গিয়ে তৈরি হয়েছে এ ধরনের পর্বত। সিয়েরা নেভাদা পর্বত এ জাতের।

৩. গম্বুজ পর্বত :
এ ধরনের পর্বত গম্বুজ চেহারার মত জমকালো। গম্বুজ পাহাড়ের ঢাল কেন্দ্রবিন্দু থেকে সবদিকে ছড়ানো। চট্টগ্রাম ও পার্বত্য চট্টগ্রামে এ ধরনের পাহাড় রয়েছে।

৪. আগ্নেয় পর্বত :
এ ধরনের পাহাড়ের জন্ম আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপাত থেকে। জলন্ত লাভা ঠাণ্ডা হয়ে এ পাহাড় তৈরি হয়েছে। ইতালীর ভিসুভিয়াস কিংবা জাপানের ফুজিয়ামা পাহাড় এ জাতের।

৫. ক্ষয়জাত পাহাড় :
উঁচু মালভূমি লক্ষ লক্ষ বছর ধরে নানা রকম প্রাকৃতিক শক্তি জল-হাওয়া-রোদ ইত্যাদি একটানা প্রবাহে ক্ষয়ে যায়। যার ফলে জন্ম হয় ক্ষয়জাত পাহাড়। চট্টগ্রাম, পার্বত্য চট্টগ্রাম ও সিলেটে এ ধরনের অনেক পাহাড় রয়েছে।
ভূ-বিজ্ঞানীরা বলেছেন, পৃথিবীর উত্তর গোলার্ধে অধিক পরিমাণে পাহাড়-পর্বত সৃষ্টি হওয়ায় যে অতিরিক্ত ভরের সৃষ্টি হয়েছে তার ভারসাম্য রক্ষার্থে পৃথিবী উত্তর মেরুত ২৩-১/২ ডিগ্রি কাত হয়ে রয়েছে। না হয় কক্ষপথে ঘুরার সময় পৃথিবী এদিক ওদিক ঢলে পড়ত।

সাগর-মহাসাগর
পৃথিবীর মানচিত্রটা পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে পাঁচটি মহাসাগর আর ছয় ষট্টিটি সাগর মিলিয়ে পৃথিবীর প্রায় একাত্তর ভাগ অংশই জলে ঢাকা। আর বাদ বাকীটা ডাঙ্গা। অর্থাৎ মহাদেশ। সাগর যে কত বৃহৎ ৩৬২,০০০,০০০ বর্গ কিঃ মিঃ তা অনেকটা অনুমান করা যায় সমুদ্রের পাড়ে বসে চোখ দুটো সামনে মেলে দিলে। শুধু আকারে বৃহৎ নয়, গভীরতাও অনেক। কোথাও কোথাও এত গভীর যে, সেখানে সবচেয়ে উঁচু পাহাড় হিমালয়কে ছেড়ে দিলে তার কিছুই

www.pathagar.com

আর দেখতে পাওয়া যাবে না। তাই মনে স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন জাগতে পারে, এতো গভীর সমুদ্র কিভাবে সৃষ্টি হল!

এ প্রশ্নটা শুধু সাধারণ মানুষের মনকেই নয়, ভূ-বিজ্ঞানীদের চিন্তাকেও নাড়া দিয়েছে। ১৯১২ সালে জার্মান ভূ-বিজ্ঞানী ওয়েগনার, তার 'চমান মহাদেশ' তত্ত্বটিতে সাগর মহাসগার সৃষ্টির কথা উল্লেখ করেন। উক্ত তত্ত্বে তিনি বলেন, আজ থেকে প্রায় ২৫ কোটি বছর আগে পৃথিবীর মহাদেশ আর মহাসমুদ্রের চেহারা এ রকম ছিল না। তখন পৃথিবীর সব মহাদেশ মিলে একটিই মহাদেশ ছিল। মেসোজয়িক (mesozoic) যুগের প্রথম দিকে ভূ-পৃষ্ঠের প্রাকৃতিক সংকোচনের (Contraction) ফলে মহাদেশটি ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে একে অন্যের কাছ থেকে দূরে সরে যায়। আর তাদের মাঝখানে জন্ম নেয় আজকের মহাসমুদ্রগুলো। সে সময় অবিরামভাবে আকাশ থেকে বৃষ্টি নামে যা সাগর মহাসাগরের পেট পূর্ণ করে দেয়।

এখন এ সাগর মহাসাগরগুলো পৃথিবীর একদেশ থেকে অন্য দেশে পণ্য সামগ্রী পারাপারের জন্য অত্যন্ত সহায়ক জলপথ। যাত্রীবাহী নৌকা, স্টীমার, জাহাজ সাগরের উপর দিয়ে যেমন চলে তেমনি সামরিক গান বোট, ফ্রীগেট, জঙ্গী বিমানবাহী নৌবহর প্রভৃতি দুর্দণ্ড প্রতাপে চলছে। অধিকন্তু সাগরের তলদেশ দিয়ে চলছে পারমাণবিক সাবমেরীন।

www.pathagar.com

সমুদ্র তত্ত্ব নিয়ে কোরআনের বাণী

"আর তোমরা জলযানগুলোকে সমুদ্রের বুক চিরে চলতে দেখবে যাতে তোমরা আল্লাহর কৃপা অন্বেষণ করতে পার এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক। (নাহল-১৪)"

"তোমরা কি দেখ না যে, আল্লাহর অনুগ্রহে জাহাজগুলো মহাসমুদ্রে চলাচল করে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তার নিদর্শন সমূহ প্রদর্শন করেন? নিশ্চয়ই এতে প্রত্যেক সহনশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অনেক ইঙ্গিত রয়েছে। (লোকমান-৩১)"

"এবং তার অন্যতম নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি হচ্ছে পর্বতসম জাহাজগুলো সমুদ্রের উপর স্বাচ্ছন্দে চলে। (শুরা-৩২)"

সমুদ্র বা মহাসমুদ্রে জাহাজ চলাচল সম্পূর্ণ নির্ভর করে তাদের পানিতে ভেসে থাকার ক্ষমতার উপর। কোন কঠিন পদার্থ পানিতে ভেসে থাকার ক্ষমতা তার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। এ বৈশিষ্ট্যের নিরিখে কোনো কঠিন ভারী বস্তু অন্য কোনো আকার ধারণ করলে তা পানি কিংবা বায়বীয় পদার্থের উপর ভাসতে পারে। যেমন এক খণ্ড লোহা পানিতে ডুবে যায় কিন্তু ঐ লৌহখণ্ড থেকে নির্মিত একটি পাত্র পানিতে ভেসে থাকে। পদার্তের এ গুণকে বলা হয় পবতা (buoyancy)। অর্থাৎ কোনো তরল কিংবা বায়বীয় পদার্তের কোনো কঠিন বস্তু নিমজ্জিত করলে কঠিন বস্তুর উপর খাড়া যে বল ঊর্ধ্বমুখে ক্রিয়া করে তাকে পবতা বলে। তরল বা বায়বীয় পদার্থের মধ্যে এ পবতা গুণ দান করে আল্লাহপাক জাহাজ ও নৌকাকে সাগর জলে ভেসে চলার ব্যবস্থা করে দিয়েছেন।

গ্রীক দার্শনিক আর্কিমিডিস সর্বপ্রথম তরল পদার্থের পবতা গুণ আবিষ্কার করেছিলেন। তিনি প্রমাণ করেছিলেন যে, পানিতে কোনো কঠিন পদার্থ ভাসলে তার ভারে যতটুকু পানি অপসারিত হয় সে অপসারিত পানির ওজন ভাসমান বস্তুর নিমজ্জিত অংশের ওজনের সমান। এ তথ্যটি আর্কিমিডিসের সূত্র নামে পরিচিত। পবতা বল কঠিন পদার্থের ভারকেন্দ্র বরাবর খাড়া উপর দিকে ক্রিয়া করে। সুতরাং পবতা বল কাজ করে পদার্থের ওজনের ঠিক বিপরীত দিকে

www.pathagar.com

এবং এ বল পানির গভীরতা দ্বারা প্রভাবিত। যে গভীরতা পর্যন্ত একটি জাহাজ ডুবে গিয়ে সেখান থেকে পানিকে সরিয়ে দেয়। পানির এ অপসারণ নির্ভর করে বস্তুর আকার ও ওজনের উপর।

প্রাথমিক পর্যায়ে সমুদ্রে জাহাজ চলাচলের সময় যে সমস্যা বড় হয়ে দেখা দিত সেটা হচ্ছে গন্তব্যস্থলে পৌছানোর জন্য সঠিক দিক নির্ণয় করা। জানা যায় প্রাচীন কালে নাবিকরা জাহাজ চালনা করতেন সূর্য ও নক্ষত্রের দিক লক্ষ্য রেখে। আরব নাবিকরা ভারত মহাসাগরে এ পদ্ধতি অবলম্বন করে দিক নির্ণয় করতো। একই পদ্ধতি-কৌশল বহু শতাব্দী ধরে আরবরা মরুভূমি যাত্রা কালেও ব্যবহার করতো। এখন নৌযান ও উড়োজাহাজ চালনার ক্ষেত্রে দিক নির্ণয়ের বিভিন্ন পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়। যেমন কম্পাস দেখে, ম্যাপ পড়ে এবং দীর্ঘ যাত্রায় রেডিও সাথে রেখে দিক নির্ণয়ের কাজ চলে। রাডার আবিষ্কারের ফলে নাবিকরা কুয়াশা এবং অন্ধকারের মধ্যেও দূরের জায়গা স্পষ্টভাবে দেখতে পায়।

বিংশ শতাব্দীর সাত দশক থেকে পৃথিবীর কক্ষপথে কৃত্রিম উপগ্রহ স্থাপন করে কম্পিউটারের সাহায্যে জাহাজের অবস্থান হিসেব করা হয়।

www.pathagar.com

পানি বা জল তত্ত্ব

নদীর জল মিষ্টি কিন্তু সমুদ্রের জল নোনতা। অথচ দুটোই এ পৃথিবীর জল। আর নদীর জল দিয়ে মিশছে সেই সমুদ্রের জলে। কিন্তু নদীর জলে একেবারে নুন নেই তা নয়। তবে সামুদ্রিক জলের পরিমাণে অনেক কম। পরীক্ষা করে দেখা গেছে, সমুদ্রের জলে সোডিয়াম এবং ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইডের পরিমাণ নদীর জলের তুলনায় অন্তত ১৭ গুণ বেশি। এসব সত্ত্বেও নিজস্ব প্রক্রিয়ায় সমুদ্রজল তার নোনতা ভাব একই জায়গায় ধরে রাখে।

লবণ সহ সমুদ্রজলে নানা রকম রাসায়নিক পদার্থের মিশ্রণ দেখা যায়।

১. সোডিয়াম ক্লোরাইড ২৩.৪৮%
২. ম্যাগনেসিয়াম ক্লোরাইড ৪.৯৮%
৩. সোডিয়াম সালফেট ৩.৯২%
৪. ক্যালসিয়াম ক্লোরাইড ০.১০%
৫. পটাসিয়াম ক্লোরাইড ০.৬৬%
৬. হাইড্রোজেন বোরাইট ০.০২৬%
৭. সোডিয়াম বাইকার্বোনেট ০.১৯২%
৮. পটাসিয়াম ব্রোমাইড ০.০৯৬%
৯. স্ট্রনটিয়াম ক্লোরাইড ০.০২৪%
১০. সোডিয়াম ফ্লোরাইড ০.০০৩%

সমুদ্রের জল নিয়ে কোরানিক তত্ত্ব

"দু'টি সমুদ্রের প্রবাহমান জল সমান নয়, একটি মিষ্টি এবং তৃষ্ণা নিবারক, অপরটি নোনা এবং তিক্ত। (ফাতির-১২)"

"তিনি-ই সমান্তরালে দু-ই সমুদ্রের জলরাশি প্রবাহিত করেন। একটি মিষ্টি ও তৃষ্ণ নিবারক এবং অপরটি লবণাক্ত ও বিস্বাদ। উভয় প্রবাহের মাঝখানে রেখেছেন একটি অন্তরায়, একটি দুর্ভেদ্য আড়াল। (ফোরকান-৫৩)"

www.pathagar.com

এটা সবাই জানে যে, পৃথিবীর অভিকর্ষ বলের টানে পানি উপর দিক থেকে নিচের দিকে নেমে আসে। এ পদ্ধতিতে পানির দুটি পৃথক ধারা সৃষ্টি হয়েছে। একটি ধারা স্থলভূমির উচ্চ এলাকায় এবং আর একটি ধারা পৃথিবীর নিম্ন এলাকায় প্রবাহমান। পানি সাধারণত ভূমি থেকে সাগরে বয়ে যায়। জোয়ারের সময় কিংবা অস্বাভাবিক আবহাওয়া অবস্থায় যেমন জলোচ্ছ্বাসের সময় সাগরের পানি ওভার-ফ্লো (over flow) হয়ে স্থল অঞ্চলের দিকে সবেগে ধেয়ে আসে। কিন্তু পুনরায় স্বাভাবিকতা ফিরে আসলে ফুলে ওঠা জলরাশি সাগরের বুকে ফিরে যায়। ভূ-পৃষ্ঠের উপরিভাগের ৭০% অংশ পানি দ্বারা আবৃত। এ পানি ধারণ করে রেখেছে সাগর-মহাসাগরগুলো। মহাসাগরের পানি লবণাক্ত এবং এ পানি ৩/২% লবণ ধারণ করে রেখেছে এবং পূর্বে উল্লেখিত সকল রাসায়নিক উপাদান এ দ্রবণে বিদ্যমান।

মিষ্টি পানি অপেক্ষা লবণ পানি অধিক ঘন। কিন্তু যখন তাদের একেই সমতায় রাখা হয় তখন তারা পরস্পরের সঙ্গে মিশে যায়। উল্লেখিত আয়াতদ্বয় তাদের মধ্যে যে পৃথকীকরণ অন্তরায়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ হচ্ছে তাদের উপর অভিকর্ষ শক্তির প্রভাব। মিষ্টি জল ও লবণাক্ত জলের চৌহদ্দীর মধ্যে ঘনত্বের একটি মধ্যবর্তী পার্টিসন সৃষ্টি হয়। এ পার্টিশন বা বিভাজনরেখা উভয়ের মধ্যে স্বাভাবিকভাবে মিশ্রিত হওয়ার প্রবণতা রোধ করে এবং উভয় জলে ঘনত্বের পার্থক্য থাকার দরুন মাধ্যাকর্ষণ বল বিভক্ত অবস্থাকে প্রভাবিত করে।

সুতরাং এটা সুস্পষ্ট যে, সাগরের লবণ পানির সাথে মিষ্টি পানি মিশে না। উভয়ে পাশাপাশি প্রবাহিত হয় কিন্তু কখনো মিশ্রণ ঘটে না। এ ব্যাপারটি অনুসন্ধানী লোকের কাছে আকস্মিক ঘটনা রূপে প্রতীয়মান হয় না। দু'জলের মধ্যে ব্যবধান উত্থিত হয় আল্লাহর অংকিত নকশা হিসেবে।

পানির এক নাম জীবন (Life)। জীবন বলতে আমরা বুঝি যার প্রাণ আছে, কাজ করার ক্ষমতা আছে, খাদ্য গ্রহণ করে এবং বর্ধিত হয়। মানুষ, পশু-পাখি, জীব-জন্তু, কীট-পতঙ্গ, বৃক্ষ-তরুবীথি প্রভৃতি জীবনধারী সৃষ্টি, যাদের প্রাণ আছে। খাদ্য গ্রহণ করে, কাজ করার ক্ষমতা রাখে এবং বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। কিন্তু মাটিরও কি জীবন আছে?

সূর্যের তীব্র তেজদীপ্ত রোদে মাটির শেষ জলবিন্দু যখন বাষ্পায়ীত হয়ে উবে যায় তখন জমীন থেকে একটি খাঁ খাঁ হাহাকার ধ্বনি উত্থিত হয়। এ সময়ে বীজ বপন করলে অংকুরোদগম ঘটে না। বৃক্ষ ও ক্ষেতের ফসলে সতেজ ভাব থাকে না। বায়ু প্রবাহে সন্তাপ বিরাজ করে। ভূ-পৃষ্ঠে কান লাগিয়ে শুনলে উপলব্ধি করা যায় মাটির প্রাণহীন আড়ষ্টতা। এহেন অবস্থায় যখন আকাশ থেকে বৃষ্টির নামে, পৃথিবী নবজীবন ফিরে পায়। তার চেহারায় সতেজ ভাব ফুটে উঠে। চারিদিকে বৃক্ষ, তরুলতা নব উদ্দীপনায় ঝলমল করে।

কারণ বৃষ্টিধারার সাথে নেমে আসে–

www.pathagar.com

অক্সিজেন
হাইড্রোজেন,
নাইট্রেট। মাটির উপাদান
সোডিয়াম,
ক্যালসিয়াম,
ম্যাগনেসিয়াম,
পটাসিযাম

প্রভৃতির সাথে মিশে প্রস্তুত করে বৃক্ষরাজি ও ফসলের খাবার। ফলে ভূ-পৃষ্ঠের জীবনী শক্তি, তার উর্বরতা পরিপুষ্ট হয়ে ওঠে। এ বিষয়টি সাধারণ মানুষ উপলব্ধি করতে না পারলেও ভূ-বিজ্ঞানীরা ও জ্ঞানী লোকেরা উপলব্ধি করতে সক্ষম হন।

"আমরা আকাশ থেকে বিশুদ্ধ বারি বর্ষণ করি যাতে নির্জীব ভূমি সজীব হয়ে উঠে এবং আমাদের সৃষ্ট বহু সংখ্যক প্রাণী ও মানুষ তৃষ্ণা নিবারণ করতে পারে। (ফোরকান-৪৮, ৪৯)"

"তাঁর বিধানের মধ্যে একটি নিদর্শন এ যে, তোমরা ভূমিকে দেখবে অনুর্বর পড়ে আছে। অতঃপর আমরা যখন তার উপর বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন সে শস্য-শ্যামল ও স্ফীত হয়। নিশ্চয়ই যিনি একে জীবিত করেন তিনি জীবিত করবেন মৃতদেরকেও। আসল কথা হচ্ছে, তিনি প্রত্যেক বিষয়ের উপর পূর্ণ ক্ষমতাবান। (হামীম-৩৯)"

"আল্লাহতাআলা আকাশ থেকে যে রিযিক (বৃষ্টি) সরবরাহ করেন তাতে মৃত ভূ-পৃষ্ঠ জীবন লাভ করে। (জাসিয়া-৫)"

"অতএব, আল্লাহর করণার ফলাফল দেখ কিভাবে তিনি মৃত্তিকার মৃত্যুর পর তাকে জীবিত করেন। (রোম-৫০)"

আকাশ থেকে আল্লাহপাক যে বৃষ্টি বর্ষণ করেন সে বর্ষণ একটানা বেশ কিছু ঘটনা উদ্ভব ঘটায়। কয়েকটি তাৎপর্যপূর্ণ দৃষ্টান্তের সাহায্যে সেগুলোকে তুলে ধরা যায়।

একটানা পানি সরবরাহ না থাকার কারণে যে খরার সৃষ্টি হয় সে খরার ফলে ভূমি ও গাছ-পালা পানিশূন্য হয়ে পড়ে। আয়াতসমূহে পানির অণু শূন্য জমিনকে বলা হয়েছে হয়েছে মৃত পৃথিবী (dead earth)। আর যখন বৃষ্টিধারা নেমে আসে তখন বীজের অংকুরোদগম মুরু হয়। ফলে মৃত্তিকার মধ্যে রাসায়নিক পরিবর্তন ঘটে। আর একেই বলা হয় পৃথিবীর নতুন জীবন লাভ। বীজের ফলশ্রুতিতে গাছপালা জন্মায় এবং পরিশেষে বৃক্ষরাজি ফুলে ফলে সুশোভিত হয়ে ওঠে। মৃত্তিকার প্রধান প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলোর উপর বৃষ্টির পানি গভীর প্রভাব ফেলে।

www.pathagar.com

সময়ের পরিমাপ সীমা নির্ধারণ আকাশযান ও ধর্ম

পৃথিবীর একমাত্র উপগ্রহ (Satelite) হচ্ছে চাঁদ। সূর্যের আলো পেয়ে আলোকিত হলেই আমরা তাকে দেখতে পাই। তা না হলে তো নয়। কারণ চাঁদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। সূর্যের আলো চন্দ্র পৃষ্ঠে পতিত হলে ঐ আলোর সাতটি রং থেকে হলুদ, কমলা এবং লাল রংয়ের আলো চাঁদের মাটি শুষে (absorb) নেয় এবং তা প্রতিফলিত হয়ে ভূ-পৃষ্ঠে প্রবাহিত হয়। ফলে জ্যোৎস্না রাতে বসুন্ধরা মিষ্টি আলোতে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে।

একমাত্র প্রাকৃতিক উপগ্রহ চাঁদ। পৃথিবীর নিকটতম প্রতিবেশি। আমাদের কাছ থেকে এর গড় দূরত্ব ২৩৮৮৫৭ মাইল। উপগ্রহ অনেকাংশে গ্রহের মতই। অর্থাৎ এরা গ্রহদের মত প্রধানত কঠিন পদার্থে গঠিত। এদের নিজস্ব কোনো আলো নেই। যদিও প্রতিফলিত আলোতে এদেরকে উজ্জ্বল দেখায়। এদের নিজস্ব কক্ষপথ আছে এবং গ্রহের চতুর্দিকে ঘুরে। প্রত্যেক গ্রহের কিন্তু উপগ্রহ নেই। যেমন, সূর্যের নিকটতম দুই গ্রহ-বুধ আর শুক্রের কোনো উপগ্রহ নেই। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুসারে সৌরজগতে মোট উপগ্রহের সংখ্যা ৪৮টি। এদের মধ্যে পৃথিবীর ভাগে আছে ১টি, মঙ্গলের দু'টি, বৃহস্পতির ১৬টি, শনির ২১টি, ইউরেনাসের ৫টি, নেপচুনের ২টি এবং প্লুটো গ্রহের ১টি।

"তিনি আল্লাহ, যিনি সূর্যকে বানিয়েছেন উজ্জ্বল আলো বিকিরণকারী আর চাঁদকে করেছেন জ্যোৎস্নাময়।"

কোন আলোর উৎস থেকে আলো প্রাপ্ত হয়ে আলোকিত হওয়াকে আরবীতে 'নুরাও' বলা হয়। যেমন, বৈদ্যুতিক বাতি দ্বারা ঘর আলোকিত হয় কিন্তু সে আলোপ ঘরের নিজস্ব নয়। এ আয়াত দ্বারা বুঝা যায় সূর্যের আলো দ্বারা চাঁদ আলোকিত হয়।

আকাশে পশ্চিম দিক থেকে পূর্বে প্রসারিত এক ফালি জায়গা আছে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা যার নাম দিয়েছেন রাশিচক্র। এ রাশিচক্রে তারারা একটি সরলরেখা বা ত্রিভুজ জাতীয় কোনো এক জ্যামিতিক ক্ষেত্র রচনা করে পূর্ব দিক থেকে পশ্চিম দিকে অবিকৃতভারে ঘুরে বেড়ায়। ভ্রমণ কালে সংশ্লিষ্ট তারাগুলোর মধ্যে বিন্যাস বা দূরত্বের কোনো পরিবর্তন ঘটে না। এটা এক লক্ষ্যণীয় দৃশ্য। রাতের পর রাত, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে, ব্যাপারটা সামনে ঐভাবেই ঘটে চলেছে। মনে হয় তারারা যেন পরস্পরের সঙ্গে এক সুদৃঢ় বন্ধনে যুক্ত। অসীম অন্তরীক্ষে ওরা ভ্রমণ করে একসঙ্গে দলবদ্ধভাবে, যা অত্যন্ত দর্শনীয় দৃশ্য।

রাশি মণ্ডলী নিয়ে কোরানিক সূত্র

"তিনি আল্লাহ, যিনি নভোমণ্ডলে রাশিচক্র তৈরি করেছেন এবং দর্শকদের জন্য তা সুশোভিত করেছেন। (হিজর-১৬)"

www.pathagar.com

"তিনি মহামহিম আল্লাহ যিনি আকাশে স্থাপন করেছেন রাশিচক্র এবং তাতে ঔজ্জ্বল্য ভরে দিয়েছেন এবং চন্দ্রকে করেছেন দীপ্তিময়। (ফোরকান-৬১)"
আকাশের রাশিচক্রে যে ১৩টি তারা ত্রিভুজ কিংবা সরল রেখা গঠন করে ঘুরে বেড়ায় তাদের নামঃ

1. Aries (মেষরাশি)
2. Taurus (বৃষরাশি)
3. Gemini (মিথুনরাশি)
4. Cancer (কর্কটরাশি)
5. Leo (সিংহরাশি)
6. Virgo (কন্যারাশি)
7. Libra (তুলারাশি)
8. Scorpius (বৃশ্চিকরাশি)
9. Sagitarius (ধনুরাশি)
10. Copricornus (মকররাশি)
11. Aquarius (কুম্ভরাশি)
12. Pisces (মীনরাশি)

উক্ত রাশিচক্র অনুযায়েই মানুষের রাশির নাম করণ হয়েছে।

চাঁদের গতি ও পূর্ণিমা এবং চন্দ্রগ্রহণ

মহাকাশে প্রত্যেক গ্রহ-উপগ্রহ সুনির্দিষ্ট নিয়মে নির্ধারিত কক্ষপথে ঘুরছে এবং এটি একটি চিরন্তন গতি হিসেবে প্রতিষ্ঠিত ঘূর্ণন গতি।
বিজ্ঞানী কেপলার গ্রহের ঘূর্ণন সম্পর্কিত যে তিটি সূত্র আবিষ্কার করেছেন সেব সূত্র বা law চাঁদের ঘূর্ণন প্রকৃতির ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। বিজ্ঞানের সর্বশেষ তথ্য থেকে জানা যায় চাঁদের এক গুচ্ছ জটিল ঘূর্ণন গতি রয়েছে।
যেমন এটা নিজ অক্ষে আবর্তিত হয়।
পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে।
আবার পৃথিবীর সঙ্গে সর্যের চারপাশে ঘুরে।
এবং সৌর পরিবারের সঙ্গে ছায়াপথের চারপাশে ঘুরে। সুতরাং চাঁদ তার একই মুখে পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। আর যখন সে পৃথিবীর চারপাশে ঘুরে তখন তার একই দিক পৃথিবী ও সূর্যের সামনে আসে এং সূর্যের আলোয় আলোকিত হয়। পৃথিবী থেকে চাঁদের যে অংশগুলি আলোকিত দেখায় সে অংশগুলোকে বলা হয় পর্ব (phases)।
যখন পৃথিবী সূর্য ও চাঁদের মাঝখানে এসে পড়ে তখন পূর্ণিমা (full moon) দেখা যায়। এমন কোনো অবস্থায় চাঁদ যদি পৃথিবীর ছায়ার মধ্যে এসে পড়ে তখন সংঘটিত হয় চন্দ্র গ্রহণ (Lunar eclipse)। পুনরায় যখন চাঁদ সূর্য ও

www.pathagar.com

পৃথিবীর মাঝখানে এসে পড়ে, তখন চন্দ্রের আলোকিত অংশ দেখা যায় না। অর্থাৎ পৃথিবী থেকে চন্দ্রকে আর দেখা যায় না। আর এটা হলো নতুন চাঁদের পর্যায় (phase)।
সুতরাং পৃথিবীর চাঁদ এমন এক গুরুত্বপূর্ণ উপগহ যাকে ব্যাপক গতি প্রকৃতি ধারা সমৃদ্ধ করা হয়েছে।

কোরআন সে সূত্রইই প্রকাশ করেছে বিভিন্ন আয়াতে।
"সূর্য এবং চাঁদ যথাযথ হিসাব অনুসরণ করে চলেছে। (রহমান-৫)"
"তিনি-ই রাত আর দিন সৃষ্টি করেছেন চাঁদ আর সূর্য সৃষ্টি করেছেন এবং প্রত্যেকে মহাকাশে ঘুরে বেড়াচ্ছে। (আম্বিয়া-৩৩)"

চাঁদের মঞ্জিল-চন্দ্রমাস, চন্দ্রবর্ষ এবং Lunar Station-
পৃথিবীর কক্ষপথ প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের মোট সময় লাগে ২৭ দিন ৩ ঘন্টা। এ পরিক্রমণ কালে চাঁদের কক্ষপথে অবস্থিত কতগুলো নির্দিষ্ট তারকাকে অতিক্রম করতে হয়। তাই চাঁদের কক্ষপথ (Lunar orbit) ২৭টি অক্ষাংশে বিভক্ত। এসব বিভক্ত অক্ষাংশগুলোকে বলা হয়। Lunar Stations বা চাঁদের মঞ্জিল। Lunar Stations অতিক্রম করার সময় তাকে আমরা ক্রম হ্রাস এবং ক্রম বৃদ্ধি হতে দেখি। যার ফলে তারিখ এবং মাস গণনা করা সহজ হয়েছে। দুইটি অমাবশ্যা (Two New moons)। দুইটি পূর্ণিমার (Two full moons) উপর ভিত্তি করে চন্দ্রমাস, বৎস, নির্ণয় করা হয়।

Lunar Stations **সম্পর্কে কোরআনিক সুত্র**
"চাঁদের জন্য মঞ্জিল সমূহ (Lunar Stations) নিরূপণ করে রাখা হয়েছে যতক্ষণ না সে পুরাতন খেজুর শাখার ন্যায় ক্ষীণ হয়ে ফিরে। (ইয়াসীন-৩৯)"
"ওরা আপনাকে চাঁদের (হ্রাস-বৃদ্ধি) সম্পর্কে জিজ্ঞেস করছে, আপনি বলুন চাঁদ মানুষের জন্য সময় নির্ণয়ের আয়াত স্বরূপ। (বাকারা-১৮৯)"

চাঁদর টানে রোজ দু'বার জোয়ার ভাটা
চাঁদের আকর্ষণে পৃথিবীতে নদী সমুদ্রে জোয়ার-ভাটা ঘটে। চাঁদ পৃথিবীর চারদিক অবিরাম ঘুরছে। এ ঘূর্ণনের সময় পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের সম্মুখে পড়ে সেখানে চন্দ্রের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি হয়। স্থলভাগ অপেক্ষা জল ভাগের উপর চাঁদের আকর্ষণ সবচেয়ে বেশি বলে চারিদিক থেকে পানি ঐ আকর্ষণ স্থানের দিকে প্রবাহিত হয়। ফলে চন্দ্রের কাছাকাছি অংশের পানি ফুলে ওঠে এবং জোয়ার সৃষ্টি করে। এ জোয়ারকে মুখ্য জোয়ার বলে। আবার ঠিক ঐ সময়ে পৃথিবীর যে অংশে চন্দ্রের টানে মুখ্য জোয়ার ঘটে তার বিপরীত

www.pathagar.com

দিকের পানি অপেক্ষা পানির নীচের স্থলভাগ চন্দ্রের দিকে বেশি আকৃষ্ট হয়। এ সময় এই পানির উপর পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ শক্তির প্রভাব কমে যায় এবং বিকর্ষণ শক্তির প্রভাবে চারিদিকের পানিরাশি সে স্থানে এসে জোয়ারের সৃষ্টি করে। এরূপ সৃষ্ট জোয়ারের গৌণ জোয়ার বলে।

যখন পৃথিবীর কোনো অংশে মুখ্য জোয়ার আসে তণ তার বিপরীত অংশে গৌণ জোয়ার হয়। সে সময় কিন্তু এ জোয়ারের মধ্যবর্তী দু'পাশের স্থান থেকে পানি সরে যায়। দু'স্থানে তখন ভাটা হয়। পৃথিবীর যে অংশ চন্দ্রের কাছাকাছি আসে সে-ই অংশে এর তার ঠিক বিপরীত অংশে জোয়ার ও ভাটা হয়। সে কারণে প্রতিদিন পৃথিবীর প্রত্যেক স্থানে দু'বার জোয়ার ও দু'বার ভাটা হয়।

সূর্যও জোয়ার ভাটা সৃষ্টি রে থাকে। অমাবশ্যায় চন্দ্র ও সূর্য পৃথিবীর একদিকে একই লাইনে অবস্থান করে। সূর্যের আকর্ষণ চন্দ্রের তুলনায় কম হলেও উভয়ের মিলিয়ে আকর্ষণ খুব প্রবল হয়। এ মিলিত আকর্ষণের ফলে যে জোয়ার হয়, তাতে পানি খুব বেশি ফুলে ওঠে। এরূপ জোয়ারকে ভরা কঠাল বা তেজ কঠাল (Spring tides) বলে। যখন চাঁদ ও সূর্য ৯০ দূরত্বে অবস্থান করে তখন সর্বনিম্ন ভাটা হয়। এভাবে ভাটা হওয়াকে বলা হয় তরা কঠাল (Neap tides)।

নদী বা সমুদ্রে জোয়ার ভাটা আমাদের জন্য বিশেষ কল্যাণ বয়ে আনে। যেমনঃ

১। জোয়ার ভাটার কারণে বড় বড় বাণিজ্যিক জাহাজ বন্দরে গমনাগমন করতে পারে অতি সহজে।

২। জোয়ার ভাঁটার কারণে নদীতে স্রোত সৃষ্টি হয়।এর ফলে নদীর আবর্জনা সমূহ বয়ে নিয়ে যায় এবং পানি নির্মল থাকে।

৩। জোয়ার ভাটার কারণে নদীতে তলানি জমতে পারে না। আর নদীও ভরাট হয় না।

৪। জোয়ার ভাটায় নদীর পানি লবণাক্ত হয়। যার কারণে পানি ঘনত্ব বেড়ে যায় এর পানি সহজে বরফে পরিণত হয় না। সুতরাং চাঁদ ও সূর্য্যের প্রভাবে সংঘটিত।

জোয়ার ভাটা নিয়ে কোরানিক সূত্র

"আমরা রাত ও দিনকে দু'টি নিদর্শন করেছি। অতপর রাতের নিদর্শন নিস্প্রভ করে দিয়েছি এবং দিনের নিদর্শনকে দেখার উপযোগী করেছি। যাতে তোমরা তোমাদের প্রভু অনুগ্রহ অন্বেষণ করতে পার। (বাণী ইসরাঈল-১২)"

"আল্লাহ নিদর্শন সমূহের মধ্যে রাত ও দিন, চাঁদ ও সূর্য অন্তর্ভুক্ত। (হামীম-৩৭)"

"তিনি চাঁদ ও সূর্যকে তার আইনের অধীনে নিয়োজিত করে রেখেছেন। যে সময়কালের জন্য এদের নিয়োগ করা হয়েছে সে সময় পর্যন্ত এরা তাদের গতিপথে চলমান থাকবে। আল্লাহ সকল বিষয় পরিচালনা করেন এবং তার বিধান সমূহের ব্যাখ্যা দেন বিস্তৃতভাবে। (রা'দ-২)"

www.pathagar.com

সময়ের একক নির্ধারণের সহায়ক
দিন মাস এর গণনা ও সময়ের পরিমাপ ও বারো মাস

পৃথিবীতে সময়ের নির্ধারণের তিনটি স্বাভাবিক একক হচ্ছে দিন, মাস, বৎসর। এ এককগুলো Fixed করার ভিত্তি হচ্ছে সূর্য, চাঁদএবং পৃথিবী। অর্থাৎ মানুষ সময়ের এককগুলো পেয়েছে সূর্য, চাঁদ এবং পৃথিবীর ঘূর্ণন প্রকৃতি থেকে। যেমন পৃথিবী তার নিজ অক্ষের উপর একবার আবর্তন করতে সময় লাগে প্রায় ২৪ ঘন্টা। সেজন্য পৃথিবীতে ২৪ ঘন্টায় একদিন নির্ধারণ করা হয়েছে। সূর্যের চারিদিকে একবার ঘুরে আসতে পৃথিবীর সময় লাগে ৩৬৫ দিন। তাই ৩৬৫ দিনে বছর গণনা করা হয়। সূর্যকে একবার প্রদক্ষিণ করতে চাঁদের সময় লাগে ২৯ দিন ১২ ঘন্টা ৪৪ মিনিট ৩ সেকেন্ড। এটাকে মোটামুটি ৩০ দিন ধরে "মাস" নির্ণয় করা হয়েছে। এভাবে আধুনিক যুগের ঘড়ি এবং ক্যালেন্ডার হচ্ছে জ্যোতির্বিজ্ঞান চর্চার প্রত্যক্ষ ফসল। সময়ের একক নির্ধারণ সম্পর্কে—

কোরআন সূত্র দিয়েছে,

"তিনিই প্রভাতের সূচনা করেন এবং রাতকে প্রশান্তির জন্য আর চাঁদ এবং সূর্যকে সময় নিরূপণের জন্য নিয়োজিত করেছেন। (আনআম-৯৬)"

প্রাচীনকালে সূর্যোদয় থেকে সূর্যোদয় এবং সূর্যাস্ত থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত সময়ের ব্যাপ্তিকে দিন নির্ধারণ করা হতো। এতে দেখা গেছে ঋতু পরিবর্তন জনিত কারণে দিনের দৈর্ঘ্য ঠিক থাকে না। তাই আধুনিক বিজ্ঞানে দিন ধার্য করা হয়েছে সূর্যের পর পর দু'বার মধ্য গগনে আসার কাল পরিমাণকে। সূর্যের মধ্য গণনে আসাকে ইংরেজীতে বলা হয় Culmination.

Culmination দু'প্রকার। Upper culmination এবং Lower culmination.

Upper culmination হচ্ছে সূর্য যখন দর্শকের ঠিক মাথার উপরে আরোহণ করে দিনের সূচনা করে। আর Lower culumination হচ্ছে মধ্যগগণ থেকে ঢলে সূর্য যখন ক্রমান্বয়ে দিনের সমাপ্তি ঘটায়। সুতরাং দিনে সূচনা ও সমাপ্তি ঘটার জন্য দুটি Upper culmination এবং দুটি Lower culumination সংঘটিত হতে হয়।

www.pathagar.com

এ বিষয়ে কোরআনের সূত্র হচ্ছে,

"তিনি দুই উদয় এবং দুই অস্তাচলের (নির্দেশনাকারী) প্রভু। (আর-রহমান-১৭)"

"নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট মাসের সংখ্যা হচ্ছে বার (এক বছর)। এ নিয়ম তিনি বিধিবদ্ধ করে দিয়েছেন নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডল সৃষ্টির দিক থেকে। (তাওবা-৩৬)"

পাখির উড়ন-আকাশযান ও ধর্ম মাধ্যাকর্ষণ শক্তি

মহাবিশ্বের যে কোনো দুটি বস্তু পরস্পর আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণের নাম মহাকর্ষ। দুটি বস্তুর মধ্যে একটি যদি পৃথিবী হয় তখন যে আকর্ষণ সৃষ্টি হয় তার নাম মাধ্যাকর্ষণ বা অভিকর্ষ। যেমন, সূর্য ও চন্দ্রের মধ্যে যে আকর্ষণ তা মহাকর্ষ (gravitation) কিন্তু পৃথিবী ও একটি চেয়ারের মধ্যে যে আকর্ষণ তা মাধ্যাকর্ষণ (gravity)। উপরের দিকে কোন বস্তু নিক্ষেপ করলে তা পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরে আসে কেন? এর কারণ হচ্ছে মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ঐ বস্তুটিকে পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে টানতে থাকে, যার কারণে তা পৃথিবী পৃষ্ঠে ফিরে আসতে বাধ্য হয়। এ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি ব্যতীত পৃথিবীর কোনো কিছু ব্যালেন্স এ থাকতে পারবে না।

বিজ্ঞান আবিষ্কারের ইতিহাস থেকে জানা যায় পৃথিবীর মাধ্যাকর্ষণ বল বা অভিকর্ষ বল সম্পর্কীয় ধারণাটি সর্বপ্রথম উপস্থাপন করেন ৯ম শতাব্দির মুসলিম বিজ্ঞানী আল কারেজমী।

তিনি সে সময়ে তত্ত্ব প্রকাশ করেছিলেন, "The earth attracts everything towards it" অর্থাৎ জীব ও জড় প্রত্যেক বস্তু পৃথিবীর কেন্দ্রের দিকে আকৃষ্ট হয়।

অষ্টাদশ শতাব্দিতে বৃটিশ বিজ্ঞানী Isaac Newton বিজ্ঞানী আল কারেজমীর আরো নয়শত বছর পর বৈজ্ঞানিক পরীক্ষার মাধ্যমে উক্ত তত্ত্বটি কনফার্ম করেন এবং গাণিতিক সূত্রের সাহায্যে তা প্রমাণ করেন।

F= মাধ্যাকর্ষণ

G= ধ্রুবক

M= পৃথিবীর ভর

m= বস্তুর ভর

d= দূরত্ব

অথচ পৃথিবীর অভিকর্ষ বল তত্ত্বটি নিউটন কর্তৃক আবিস্কৃত তত্ত্ব হিসেবে বিশ্বব্যাপী প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। পশ্চিমা বিজ্ঞানীরা আল কারেজমীর নাম নিশানা মুছে ফেলেছে। বিজ্ঞান আবিষ্কারের ইতিহাস উল্টে দেয়ার দেয়ার এ প্রয়াস শুধু বিদ্বেষ প্রসূত সংকীর্ণতা বললে কম বলা হবে বরং এর চেয়ে বেশি কিছু বলা যায়।

www.pathagar.com

মধ্যাকর্ষণ শক্তির কোরানিক সূত্র

"আমরা কি পৃথিবীকে আকৃষ্টকারী বানাইনি, জীবিত ও মৃত (জড়) প্রত্যেক বস্তু ধারণ করার জন্য? (মুরসালাত-২৫-২৬)"

এখানে মৃত বলতে বুঝানো হয়েছে প্রাণহীন জড় বস্তুকে। অর্থাৎ প্রাণী এবং প্রাণহীন সকল বস্তুকে পৃথিবী তার কেন্দ্রের দিকে টানে।

সৌরজগতের তৃতীয় গ্রহ আমাদের পৃথিবী, নির্দিষ্ট কক্ষপথে লাটিমর মত ঘুরে। এর ফলে একটি অন্তর্মুখী শক্তির সৃষ্টি হয়। যার কারণে এর কেন্দ্রে অবস্থিত পরমাণুর আকর্ষণ ক্ষমতা প্রবল হয়ে ওঠে। সে জন্য উর্ধ্বগামী কোনো বস্তু অভিকর্ষ শক্তি টানে ভূ-পৃষ্ঠে ফিরে আসে। এরূপ প্রত্যেক গ্রহ এবং উপগ্রহের আলাদা আলাদা মাধ্যাকর্ষণ বল বা অভিকর্ষ বল আছে। সুমহান আল্লাহ তার সৃষ্টি কৌশল দ্বারা এ অভিকর্ষ বল সৃষ্টি করে দিয়েছেন যা না হলে পৃথিবীতে অবস্থান করা খুবই কঠিন হতো।

প্রত্যেক ক্রিয়ার একটি সমান ও বিপরত প্রতিক্রিয়া আছে।

পাখি আকাশে উড়ে ডানায় ভর করে। শুধু ডানা থাকলে কি আকাশে উড়া যায়? অবশ্যই না। ডানায় থাকতে হবে পালক। একটি পাখির দেহে চার ধরনের পালক থাকে।

(১) আচ্ছাদান পালক (contour plume)

(২) তুলো পালক (down plume)

(৩) সুতো পালক (filo plume) এবং

(৪) উড়াল পালক (flight father)

উড়াল পালক থাকে ডানা ও লেজে। এগুলো লম্বা শক্ত বড় পালক। মূলদেশ ফাঁপা চওড়া থেকে সরু। উড়াল পালক পাখিকে উড়তে সাহায্য করে। পাখি যে কৌশলের মাধ্যমে আকাশে উড়ে তার নাম Lift and forward thrust কৌশল। উড়ার সময় তাকে বায়ুর চাপ সামনের দিক থেকে বাধা প্রদান করে। মাধ্যাকর্ষণ শক্তি তাকে ভু-পৃষ্ঠের দিকে টানে। এমতাবস্থায় পাখি ডানা দোলিয়ে বায়ুর চাপকে বক্ষদেশে কেন্দ্রিভুত করে। সে কেন্দ্রিভুত বায়ুর একটি ভরবেগ থাকে। ভরবেগ সংরক্ষিত থাকার কারণে পাখি বিপরীত দিকে গতি প্রাপ্ত হয়। অর্থাৎ Forward thrust সৃষ্টি হয়। এ ক্ষেত্রে নিউটনের তৃতীয় গতি সূত্র সক্রিয় হয় যার ফলে পাখি শুন্যে উড়বার গতি লাভ করে। আর এটাকে বলা হয় ফ্লাপিং ফ্লাইট। এছাড়া আরো দুটি উড়ার কৌশল পাখির আয়ত্বে আছে। এটি হচ্ছে Gliding flight। (এ পদ্ধতিতে পাখি ধীর গতিতে উড়তে সক্ষম)। অপরটি হচ্ছে Lifting flight (Lifting flight কৌশলের মাধ্যমে পাখি ইচ্ছামতো উপরে উঠে এবং নীচে নামে।)

www.pathagar.com

অতএব, পাখি আকাশে উড়ার সমগ্র কৌশলের উপর বিজ্ঞানের তিনটি সূত্র কার্যকর

১। নিউটনের ৩নং গতি সূত্র : Every action has equal and opposite reaction

২। মাধ্যাকর্ষণ বল : Then earth attracts everything towards it"

৩। বায়ুর চাপ : প্রতি বর্গ ইঞ্চি জায়গার উপর বায়ুর চাপ প্রায় ১৫ পাউন্ড।

তবে উচ্চতার উপর চায়ুর চাপের হ্রাস বৃদ্ধি ঘটে।

এ তিনটি সূত্রের সমন্বয়ে পাখিকে বিশাল আকাশে উড়ে বেড়ানোর কৌশল যিনি শিক্ষা দিয়েছেন, তিনি সমস্ত মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এ জন্য যে যাতে করে তারা Air cratf, space craft আবিষ্কার করে নিতে পারে এবং বিস্তীর্ণ মহাশূন্যে উড়ে উড়ে আল্লাহ তায়ালার আশ্চর্যজনক জ্যোতিষ্কসমূহ অবলোকন করতে পারে।

আকাশ যানের কোরানিক সূত্র

"তারা কি তাদের উপর পাখিদের প্রতি লক্ষ্য করে না? উহারা ডানা বিস্তার করে উড়ে বেড়ায়। আবার ডানা সংকুচিত করেও উড়ে যায়। রহমান ব্যতী কে আছে এমনি করে শূন্যের উপর রাখতে পারে। (মূলক-১৯)।"

"তারা কি পাখিগুলোকে দেখে না কেমন অনুগত হয়ে মধ্য আকাশে উড়ে? আল্লাহ ছাড়া কেউ তাদেরকে উড্ডীন করে রাখেনি। বস্তুতঃ বিশ্বস্ত লোকদের জন্য এখানে স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে। (নাহল-৭৯)"

পাখির উড়ার কৌশলগত পদ্ধতি পরীক্ষা করে মানুষের মধ্যে বিমান আবিষ্কারের প্রেরণা সৃষ্টি হয়। উনবিংশ শতাব্দির শুরুতে বিজ্ঞানীরা বিমান তৈরিতে পূর্ণ সফলতা লাভ করেন। এ সফলতার পেছনে পাখি ছিল নিদর্শন স্বরূপ। বর্তমানে অত্যন্ত ব্যয়বহুল space craft তৈরি করে নভোচারীরা গ্রহ থেকে গ্রহান্তরে ভ্রমণ করে চলেছেন।

www.pathagar.com

জ্যোতিবিদ্যা জ্যোতিবিদ্যায় কোরানিক সূত্র

"তারা কি তাদের শির উপরে আকাশ পানে তাকায় না? আমরা কিভাবে তা নির্মাণ করেছি এবং কিতাবে তা (গ্রহ, নক্ষত্র, গ্যালাক্সি, নেবুলা দ্বারা) সজ্জিত করেছি এবং কোন ত্রুটির অবকাশ রাখিনি। (ক্বাফ-৬)।"

"তিনি আল্লাহ যিনি সপ্ত আকাশ সৃষ্টি করেছেন স্তরে স্তরে। রহমানের সৃষ্টি নৈপুণ্যতায় কোন কিণু অসামঞ্জস্য দৃষ্ট হবে না। অতঃপর আকাশ পানে তাকাও! বার বার তাকাও। কোন ত্রুটি দেখতে পাও কি? (মূলক-৩)"

"তোমাদের সৃষ্টি অধিক কঠিন না আকাশের? যা তিনিই নির্মাণ করেছেন এবং সমুন্নত করেছেন এবং যথার্থ আদেশ (মহাকর্ষ শক্তি) প্রদান করেছেন। (নাযিয়াত-২৭-২৮)।"

"অতঃপর তিনি আকাশের দিকে মনোযোগ দিলেন এবং যথাযথাবে সপ্ত আকাশ নির্মাণ করলেন। (বাকারা-২৯)"

"তিনি আল্লাহ যিনি তোমাদের উপর সাত আকাশ নির্মাণ করেছেন। (তালকাক-১২)"

"তিনি আল্লাহ যিনি স্তরে স্তরে সপ্ত আকাশ নির্মাণ করেছেন। (মূলক-৩)"

"বল, সপ্ত আকাশ আর আরশের মালিক কে? (মু'মিনূন-৮৬)"

মহাবিশ্বের বিভিন্ন অংশ থেকে পৃথিবীর কাছে যে বিকিরণ আসে তা পর্যবেক্ষণ ও ব্যাখ্যা দানের ফলে বিজ্ঞানের একটি শাখা গড়ে ওঠেছে যার নাম জ্যোতির্বিদ্যা। মানুষের ইতিহাসে বেশির ভাগ অংশই এ বিকিরণ বিদ্যুৎ-চুম্বক বর্ণালীর দৃশ্যমান অংশে নিবদ্ধ ছিল এবং চক্ষু ছিল একমাত্র গ্রাহক। দূরবীক্ষণ যন্ত্র আবিষ্কারের পর পর্যবেক্ষণ ক্ষমতা অনেকগুণ বেড়ে যায় যার ফলে সূর্য, চন্দ্র এবং গ্রহগুলির অনেক বিস্তৃত বিবরণ পাওয়া যায়। মানুষের চোখে যা আগে দেখা যায়নি এমন অসংখ্য জ্যোতিষ্কের অস্তিত্ব এখন ধরা পড়েছে। দূরবীক্ষণ যন্ত্রের বর্ধিত আলোক সংগ্রহের ক্ষমতা সূক্ষ্ম পর্যবেক্ষণের কাজ অনেক গুণ বাড়িয়ে দিয়েছে এবং একই সঙ্গে মহাবিশ্ব ও সৌরজগতের প্রকৃতি সম্বন্ধে তাত্ত্বিক আলোচনা বেড়েই চলেছে।

www.pathagar.com

মহাকাশে যা কিছু জ্যোতির্ময়, জ্যোতির্বিজ্ঞান যেশুধু তাকে নিয়ে গড়ে ওঠা একটি বিষয় তা নয়। যার দীপ্তি নেই, যে জ্যোতির্বিহীন মহাকাশের এমন বস্তুও জ্যোতির বিজ্ঞানের পরিমণ্ডলে আসে। সেখানে–সূর্য, চন্দ্র, গ্রহ, নক্ষত্র, ধূমকেতু যেমন আছে তেমনি আছে কোয়াসার, চাঁদের আলো তার নিজস্ব নয়, সূর্যের একদিন মৃত্যু ঘটবে, আর সে-ই সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীরও। প্রতিটি বস্তুকা অপর প্রতিটি বস্তু কণাকে আকর্ষণ করে, ক্যালেন্ডার প্রবর্তন–এমন অনেক বিষয় নিয়ে জ্যোতির্বিজ্ঞানের সাম্রাজ্য। ইংরেজীতে জ্যোতির্বিজ্ঞানকে বলা হয় Astronomy. আল কোরআনে জ্যোতির্বিজ্ঞানের অনেক বিস্ময়কর তত্ত্বের স্পষ্ট ইঙ্গিত রয়েছে যা পূর্বে মানুষ অনুধাবন করতে পারেনি।

মহাকাশ ও সপ্ত আকাশ.

পৃথিবীর চারদিকে ঘিরে আছে অসীম আকাশ। সৃষ্টির পর থেকে মানুষ অবাক বিস্ময়ে তাকিয়েছে আকাশ পানে। যার পরিসীমায় অসংখ্য উজ্জ্বল বস্তু ও শক্তির সমাহার ঘটেছে। আদি অন্তহীন মহাবিশ্বের যাবতীয় বস্তু ও শক্তি যে অঞ্চলে বিন্যস্ত বা ভাসমান তাকে আমরা মহাকাশ বলি।

পূর্বে একথা মনে করা হতো যে, আকাশ পৃথিবীর উপরে খিলানে নির্মিত একটি কঠিন গম্বুজ যার গাত্রে এঁটে আছে চন্দ্র, সূর্য, তারকা ও অন্যান্য গ্রহ-উপগ্রহ। কিন্তু পূর্বের এ ধারণায় বিজ্ঞানসম্মত কোন যুক্তি নেই। গ্রহ-উপগ্রহগুলো কোন গম্বুজে দৃঢ়ভাবে আটকানো নেই। এদের উৎপত্তি, বিকাশ ও আবর্তন মহাশূন্যের গোলাকার আবেষ্টনীতে সংঘটিত হয় এবং কিভাবে তা সংঘটিত হয় তা-ই আলোচনার বিষয়–

মহাবিস্ফোরণ বা Big Bang ঘটার পর আদি অগ্নিবল বিস্ফোরিত হয়ে দ্রুতবেগে বর্ধিত হতে থাকে এবং শীতল হয়ে হাইড্রোজেন ও হিলিয়াম গ্যাসের ঘন মেঘপুঞ্জ ক্ষুদ্র মেঘ খণ্ডে ভেঙ্গে পড়ে এবং ব্যাপক আকারে ঘূর্ণন শুরু করে। ভেঙে পড়া গ্যাসীয় মেঘের আকার এমন ছিল যে, তাদের মধ্যকার মহাকর্ষ বলও বেশি ছিল। ফলে নিজস্ব মহাকর্ষ বলের প্রভাবে মেঘগুলি সংকুচিত হতে থাকে এবং গ্যাসীয় মেঘ নক্ষত্রে পরিণত হয়ে জ্যোতি বিকিরণ শুরু করে। নক্ষত্রের ভেতরকার ক্রমবর্ধমান চাপ গ্যাসীয় বস্তুর আরও ভেঙ্গে পড়াকে এগিয়ে দেয়। নক্ষত্রটি এ অবস্থায় দুটি পরস্পর বিপরীত অভিমুখী বলের প্রভাবে সাম্যাবস্থায় থাকে। এ দু'টি বলের মধ্যে একটি হচ্ছে মহাকর্ষীয় আকর্ষণ যা সংকুচিত করার চেষ্টা চালায় এবং পারমাণবিক সংযোজন (Atomic fusion) বিক্রিয়াকে প্রজ্জ্বলিত করে। অপরটি Atomic Fusion এর ফলে নির্গত শক্তি দ্বারা উৎপন্ন আভ্যন্তরীণ চাপ। আমাদের সূর্য এখন তার বিকাশের এ রকম সাম্যাবস্থায় আছে। এর সৃষ্টি হয়েছিল ৫০০০ মিলিয়ন বৎসর পূর্বে।

www.pathagar.com

এভাবে সৃষ্ট নক্ষত্রগুলি পারস্পরিক মহাকর্ষ শক্তির টানে গ্যালাক্সি ও গুচ্ছ গ্যালাক্সি গঠন করে। আবার ঘটনা প্রবাহে কোন কোন নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের প্রচণ্ড চাপ ও তাপের কারণে বিস্ফোরণ ঘটে। এর ফলে সৃষ্টি হয় নীহারিকা (Nebula), অতি নোভা (Super Nova) ইত্যাদি। পরিণত দশায় সুপার নোভার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে সংকোচন শুরু হলে তা থেকে ভারী মৌল উৎক্ষিপ্ত হতে থাকে এবং ব্যাপক আকারে চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এ ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়া মৌলিক পদার্থগুলো ধাপে ধাপে, গ্রহ, উপগ্রহ ও গ্রহানুতে পরিণত হয় এবং নির্দিষ্ট নক্ষত্রের চতুর্দিকে ঘুরতে থাকে।

তবে এ সকল আকাশী বস্তু (Heavenly bodies) তাৎক্ষণিক প্রক্রিয়ায় সৃষ্টি হয়নি।

২৫০ মিলিয়ন বৎসর ব্যাপী নক্ষত্রমণ্ডল অর্থাৎ গ্যালাক্সি ও গুচ্ছ গ্যালাক্সিগুলো গঠিত হয়। ৭৫০ মিলিয়ন সময়ের ব্যবধানে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহানুপুঞ্জ এবং ধুমকেতুসহ আমাদের সৌরজগত গড়ে ওঠে।

অতএব বিশাল মহাকাশ সৃষ্টির ক্রিয়া প্রক্রিয়াগুলি যার আদেশে সংগঠিত হযেছে তিনি প্রচণ্ড ক্ষমতার মালিক আল্লাহ তায়ালা।

আকাশের সংখ্যা আদি অন্তহীন মহাকাশ মহাকর্ষ বলের প্রভাবে সাতটি অঞ্চলে বিভক্ত হয়েছে। এ সাতটি অঞ্চলকে আমরা সপ্ত আকাশ বলে থাকি।

www.pathagar.com

নবম শতাব্দীর বিশিষ্ট মুসলিম বিজ্ঞানী আল কারেজমী

সর্বপ্রথম আকাশের স্তর সাতটি সম্পর্কে ধারণা পেশ করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর ইউরোপীয় বিজ্ঞানীরা এ তথ্যের ভিত্তিতে মহাকাশে অভিযান চালিয়ে তা কনফার্ম করেন।

১ম আকাশ

আমাদের সৌর জগতের চারটি গ্রহ এ আকাশে অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে বুধ (Mercury), শুক্র (Venus), পৃথিবী (Earth) মঙ্গল (Mars)। সূর্য থেকে এর ব্যাসার্ধ 13 আলোক মিনিট (13 Light minutes)। আলোক মিনিট হচ্ছে আলো প্রতি মিনিটে যে দূরত্ব অতিক্রম করে। উল্লেখ্য ১ সেকেন্ডে আলো ৩,০০,০০০ কিঃ মিঃ পথ অতিক্রম করে থাকে।

২য় আকাশ

এখানে সৌরজগতের পাঁচটি গ্রহ সূর্যকে প্রদক্ষিণ করে। গ্রহগুলি (৫) বৃহস্পতি (Jupitar) শনি (Satum) ইউরেনাস (৮) নেপচুপ (৯) প্লুটো। এর ব্যাসার্ধ ৫ আলোক ঘন্টা।

৩য় আকাশ

এ আকাশ আঞ্চলিক নক্ষত্ররাজি দ্বারা সমৃদ্ধ। নক্ষত্র সমূহ হচ্ছে, Alpha Centauri, Sun, Tau ceti, Barnard star, Sirius, Procyon, 61 Cygni ব্যাসার্ধ ২০ আলোক বর্ষ।

৪র্থ আকাশ

আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সি (Milky wasy galaxy) এ আকাশব্যাপী বিস্তৃত এবং এর ব্যাসার্ধ ৫০,০০০ আলোক বর্ষ। পূর্বে এটাকে মহাবিশ্ব মনে করা হতো। এখন এরূপ ২০,০০০ কোটি গ্যালাক্সির সন্ধান পাওয়া গেছে। আমাদের ছায়াপথ গ্যালাক্সি মহাকর্ষ বলের বাধ্যবাধকতায় ১০০ বিলিয়ন নক্ষত্র সাথে নিয়ে আবর্তিত হচ্ছে।

www.pathagar.com

৫ম আকাশ

আঞ্চলিক গ্যালাক্সি মণ্ডলী এ আকাশে অবস্থিত। এগুলো হচ্ছে, ARGO, URSA MONOR, ANDROMEDA, LEO-1. LEO-11 ইত্যাদি। এর ব্যাসার্ধ 20,00,000 আলোক বর্ষ।

৬ষ্ঠ আকাশ

এখানে রয়েছে আঞ্চলিক সুপার গ্যালাক্সি গুচ্ছ। এদের নাম Sculptor, Virgo, NGC 5128, URSA ইত্যাদি। এগুলো শূন্য রাজ্যের সবচেয়ে বিশাল আকাশী বস্তু (Delestial bodies)। মহাশূন্যে এসব আকাশী বস্তুর মধ্যকার ব্যবধান তুলনামূলকভাবে ব্যাপক। এর ব্যাসার্ধ ৭৫০,০০,০০০ আলোক বর্ষ।

৭ম আকাশ

আদি অন্তহীন বিশাল মহাবিশ্ব, যার সীমা পরিসীমা কারো জানা নেই। এখানে ছায়াপথের সর্বোত্তম গুচ্ছগুলো অবস্থিত আছে। আর আছে কোয়াসার (Quasars)। জ্যোতিষ্কসমূহের মধ্যে কোয়াসার এক রহস্যময় অদ্ভুত ধরনের আকাশী বস্তু। এর দূরত্ব ২০,০০,০০০০০০ আলোক বর্ষ।

সপ্ত আকাশের সুবিশাল ব্যবস্থাপনা যা দর্শন করে নভোচারীদের শিহরণ জাগে। প্রত্যেক আকাশে অবস্থিত গ্রহ, নক্ষত্রসহ গ্যালাক্সিমণ্ডলী, নেবুলা, সুপার নোভা প্রভৃতি সুশৃঙ্খল সুনিয়ন্ত্রিত আবর্তন দেখে মহান স্রষ্টার প্রতি কে না অবনত হয়? সপ্ত আকাশের মালিক মহান আল্লাহ বলেছেন,

এটা খুবই লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, সাত (সাবআ) সংখ্যাটি রহস্যজনকভাবে মহাবিশ্বের সাথে সম্পর্কযুক্ত।

মহাকাশে সাত ধরনের আকাশী বস্তু বিদ্যমান,

এগুলো হলো

(১) নক্ষত্র (stars)
(২) গ্রহপুঞ্জ (plantes)
(৩) উপগ্রহপুঞ্জ (Satellites)
(৪) ধুমকেতু (comets)
(৫) নীহারিকা (nebula)
(৬) ছায়াপথ (galaxies)
(৭) কোয়াসার (Quasars) ইত্যাদি।

আবার সাত ধরনের নক্ষত্র রয়েছে। যথা-

(১) বাদামী বর্ণের বামন তারকা (brown dwarf stars)
(২) প্রধান অণুক্রমিক তারকা (main sequence stars)

www.pathagar.com

(৩) লাল বর্ণের দৈত্যাকৃতির তারকা (red gianst stars)
(৪) পালসেটিং তারকা (pulsating stars)
(৫) শুভ্র বামন তারকা (white dwarf stars)
(৬) নিউট্রন তারকা (neutron stars) এ
৭. কৃষ্ণবিবর (black holes)
কোনো কোনো ভাষ্যকার (Commentators) সাত (৭) সংখ্যার অর্থ করেছেন 'বহু' (Many)। কারণ সূরা ফাতেহার শুরুতে বলা হয়েছে, 'সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি বহু সৃষ্টিজগতের রব।" তাহলে মহাবিশ্বে বহু জগত (Worlds) আছে। প্রত্যেক জগতের উপর সপ্ত আকাশ আছে। সেখানে সাত ধরনের নক্ষত্র আছে। সাত প্রকার জ্যোতিষ্কও আছে। প্রত্যেক জগতে সূর্য আছে। সূর্যের আলোতে সাত প্রকার রং আছে।
সুতরাং আল্লাহপাক কর্তৃক ব্যবহৃত সাত (৭) এক রহমতময় সংখ্যা যা নিয়ে এখনো নিবিড় গবেষণা চলছে।

মহাকর্ষ বল ও কেন্দ্রাতিগ বল

মহাবিশ্বের প্রত্যেক বস্তু অপরকে আকর্ষণ করে। মহাবিশ্বের প্রতিটি বস্তু কণা একে অপরকে সজোরে আকর্ষণ করে। এ আকর্ষণ শক্তি প্রত্যক্ষভাবে তাদের ভরের গুণফলের উপর এবং পরোক্ষভাবে দূরত্বের বর্গের উপর নির্ভর করে। দুটি বস্তুর মধ্যে যার ভর বেশি, সেটি যার ভার কম তাকে কাছে টানে। দূরত্ব কম হলে আকর্ষণ শক্তি বৃদ্ধি পায়। আর দূরত্ব বেশি হলে আকর্ষণ শক্তি হ্রাস পায়।
মহাকাশের গ্রহ, ক্ষেত্রগুলো মহাকর্ষ শক্তির প্রভাবে ব্যালেন্স পজিশনে কায়েম রয়েছে। পরীক্ষা ও পর্যবেক্ষণ দ্বারা প্রমাণিত হয়েছে যে, গ্রহ, নক্ষত্রগুলো মহাকর্ষীয় টানে পরস্পর পরস্পরের কাছে আসতে চায়। কিন্তু মহাশূন্যের অবিরাম সম্প্রসারণ গতির কারণে পরস্পরের মধ্যে দূরত্ব বেড়ে যায়।

কোরানিক সূত্র

"তিনি আল্লাহ যিনি স্তম্ভ ব্যতীত আকাশমণ্ডলীকে সুউচ্চ করেছেন তোমরা তো তা দেখতে পারছ। অতঃপর তিনি আরশে অধিষ্ঠিত হয়েছে।"
"তিনি তোমাদের কাজে নিয়োজিত করেছেন রাত, দিন, সূর্য এবং চন্দ্রকে। তারকাসমূহ তাঁরই বিধানের প্রতি অনুগত রয়েছে। নিশ্চয় এতে জ্ঞানী লোকদের জন্য রয়েছে অনেক প্রমাণ। (নাহল-১২)"
"তিন স্তম্ভ ব্যতীত নভোমণ্ডলকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তোমরা তো তা দেখছ। (লোকমান-১০)"

www.pathagar.com

"নিশ্চয় আল্লাহ নভোমণ্ডল এবং ভূ-মণ্ডলকে এমনভাবে ধারণ করে রেখেছেন যার ফলে ওগুলো বিচ্ছিন্ন হয়ে পতিত হয় না। (ফাতির-৪১)"

মুসলিম বিজ্ঞানী আল-বেরুনী ১১ শতকে Gravitation and Centrifugal force সম্পর্কিত তত্ত্বের নির্দেশনা দিয়ে গেছেন। পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ কোরআন নাজিল হওয়ার ১২০০ বছর পরে বিজ্ঞানী নিউটনের মহাকর্ষ সূত্র প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। সুতরাং মহাকর্ষ ও কেন্দ্রাতিগ বল আবিষ্কারের মাধ্যমে এটা দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে যে, অদৃশ্য স্তম্ভের অস্তিত্ব অবশ্যই আছে, যা উপরোল্লেখিত আয়াতসমূহে প্রতিফলিত হয়েছে।

দুই পর্বে সপ্ত আকাশ, মেঘ ও পানি সৃষ্টি

১৯২৯ সালে G. Lemaiter এবং Hubble কর্তৃক আবিষ্কৃত তথ্য থেকে জানা যায়, মহাকাশের সাতটি স্তর এবং জ্যোতিষ্ক সমূহ দু'পর্বে সৃষ্টি হয়েছে।

বিরাট বিস্ফোরণের বা Big Bang পর আদি অগ্নিবল বিস্ফোরিত হয়ে দ্রুত গতিতে প্রসারিত হতে থাকে এবং শীতল হয়ে ইলেকট্রন, প্রোটন ও নিউটন কণাগুলো গ্যাস-মেঘের সৃষ্টি করে। এগুলো আলোর বিচ্ছুরণের সমুদ্রে নিমজ্জিত হয়। প্রথম দিকে বিকিরণের চাপের দ্বারা স্বাভাবিক বিস্তৃতি বজায় ছিল। কিন্তু পরবর্তী পর্যায়ে কিছু হিলিয়ামসহ হাইড্রোজেন পরমাণুদ্বারা বস্তু কেন্দ্রিভূত হতে থাকে। গ্যাসের এ কেন্দ্রিভূত পিণ্ড বিচ্ছিন্নভাবে একে অপর থেকে দূরত্ব বজায় রেখে ছুটে বেড়ায়। যদিও বস্তুর একটি একক পিণ্ড যা তার নিজস্ব অভিকর্ষ শক্তি দ্বারা সংকুচিত হতে পারে। তবুও এ সময় দুটি বিপরীত শক্তি এ পিণ্ডের উপর ক্রিয়া করে। একটি হলো Gorce of Gravitation যা সংকুচিত করার চেষ্টা করে, অপরটি Force of Expansion, যা দূরত্ব সৃষ্টি করে।

কিন্তু সম্প্রসারণ শক্তির উন্মুক্ত গতিবেগের জন্য সংকোচনশীল গ্যাসপিণ্ড ((gas bolb) বিভিন্ন আকৃতি ধারণ করে। যথা-বৃত্তাকার, উপবৃত্তাকার ও সর্পিলাকার বা পেঁচানো ইত্যাদি। এগুলোর নাম গ্যালাক্সি। অর্থাৎ সৃষ্টির প্রথম পর্যায়ে বিভিন্ন আকৃতির গ্যালাক্সি গঠিত হয় এবং আকাশ সৃষ্টির কাজ সম্পন্ন হয়। সৃষ্টির এ পর্বে প্রায় ১৫০ মিলিয়ন বছর সময় অতিবাহিত হয়। কোরআনে এ ১৫০ মিলিয়ন বছর সময়ের ব্যাপ্তিকে 'ইওম' বলা হয়েছে। অর্থাৎ ১ দিন।

দ্বিতীয় পর্যায়ে গ্যালাক্সিপুঞ্জ বা সংকোচনশীল গ্যাস বলয়গুলো ভেঙ্গে গিয়ে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অংশে বিভক্ত হয়ে পড়ে। এ অংশগুলো যতবেশি সংকুচিত হলো তত দ্রুত গতিতে আবর্তিত হতে লাগল। এভাবে আবর্তিত হতে হতে চ্যাপটা আকার ধারণ করলো এবং জমাটবেঁধে আরো ছোট ছোট বলয়ে বিভক্ত হয়ে পড়লো। ধীর গতিতে পরিবর্তনের মাধ্যমে নক্ষত্র ও সৌরজগত (solor system) গঠিত

www.pathagar.com

হলো। গ্যাস ও ধূলিকণার গোলাকার মেঘপুঞ্জকে বলা হয় নীহারিকা (nebulae)। নীহারিকাসমূহ ঘূর্ণন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে সংকুচিত হতে লাগল এবং তাদের পশ্চাতে রেখে গেল গোলাকার বস্তুপিণ্ড। এ গোলাকার বস্তুপিণ্ডগুলো অবশেষে গ্রহ, উপগ্রহ ও গ্রহাণুতে রূপান্তরিত হলো। সুতরাং সৌরমণ্ডল, গ্রহ-উপগ্রহগুলো দ্বিতীয় পর্বে সৃষ্টি হয়েছিল এবং এরপর মহাবিশ্বের গোলাকার আবেষ্টনীতে আকাশের সাতটি বলয় গড়ে উঠল। সৃষ্টির দ্বিতীয় পর্বে সময় লেগেছিল ১ বিলিয়ন বছর। ২ পর্বের সময় কালকে কোরআনের আয়াতে বলা হয়েছে 'ইওমাইনে।'

কোরানিক সূত্র

"অতএব তিনি দুই পর্বে সপ্ত আকাশের সব কাজ সম্পন্ন করেন এবং প্রত্যেক আকাশে যথার্থ বিধান নির্দিষ্ট করে দেন। (হা-মীম-১২)

আরবী 'ইওম' অর্থ দিন। এ আয়াতে দ্বিবচন 'ইওমাইনে' ব্যবহৃত হয়েছে। কিন্তু যে আয়াতে সৃষ্টি তত্ত্ব আলোচনা করা হয় সেখানে পৃথিবীর নিজ অক্ষে আবর্তনের সময়কালকে নির্দেশ করে না।

যেমন সূরা হজ্বের ৪৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে ১ দিন= ১০০০ বছর। সূরা মা'আরেজের ৪ নং আয়াতে ১ দিন=৫০,০০০ বছর বলা হয়েছে। এ থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আল্লাহতাআলার নিকট ১ দিনের অর্থ একটি সময়কাল (A periods of time) এ সময়কাল দীর্ঘ হতে পারে অথবা ক্ষুদ্রও হতে পারে। অর্থাৎ একটি সৃষ্টিকর্মকে পূর্ণতা দান করতে যতটুকু সময় লাগে 'দিন' বলতে সে সময়কে বুঝিয়েছেন। তাই 'ইওম' এর আরও অর্থ হতে পারে। যেমন, দিন, কাল, কালের ব্যাপ্তি, Era, phase ইত্যাদি।

মহাকাশের পরিণতি

মৌলিক প্রশ্ন হলো এ যে মহাকাশ কি অসীমের দিকে বিস্তৃতি লাভ করেই চলবে? না মহাকর্ষ বল অধিক পরিমাণে জোরদার হবে এবং বিস্তৃতি ক্রমান্বয়ে মন্থর হয়ে পড়বে। আর সে-ই সাথে শুরু হবে সংকোচন।

এসব প্রশ্নের জবাবে বর্তমান সৃষ্টিতত্ত্ববিদগণ দৃঢ়ভাবে বলেছেন, এমন একটি সময় উপস্থিত হবে যখন মহাকাশের সম্প্রসারণ গতি (force of expansion) ক্রমান্বয়ে থেকে যাবে এবং মহাকর্ষ শক্তির (froce of gravitation) প্রাব্য বৃদ্ধি পাবে। এ প্রসঙ্গে যতগুলো তাত্ত্বিক ধারণা উপস্থাপন করা হয়েছে তার মধ্যে একটি হচ্ছে গ্রহ, উপগ্রহ সমূহের ওজন বৃদ্ধি এবং নক্ষত্রসমূহের ওজন হ্রাস। যেমন পৃথিবী গ্রহে মানুষের সংখ্যা বাড়ছে। সংখ্যা বাড়া মানেই ওজন বৃদ্ধি পাওয়া। ২০০০ সাল নাগাদ পৃথিবীতে লোক সংখ্যা দাঁড়িয়েছে ৬০০ কোটি।

www.pathagar.com

লোক সংখ্যা বৃদ্ধির এ ধারা অব্যাহত থাকলে ৫০০০ সালে মানুষের ওজন পৃথিবীর ওজনের সমান হবে। (বর্তমান পৃথিবীর ওজন 6x10 24kg)

আবার প্রতি মুহূর্তে পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহ উপগ্রহে মহাজাগতিক ধূলিকণা cosmic dust) এসে পড়ছে। বিজ্ঞানীদের সম্প্রতি সমীক্ষায় ধরা পড়েছে বেল পৃথিবীতে প্রতি বছরে ১০ হাজার টন মহাজাগতিক ধূলিকণা পতিত হয়। তাতে খুব স্বাভাবিকভাবে পৃথিবীসহ অন্যান্য গ্রহের ওজন বেড়ে চলেছে। এভাবে যতবেশি ওজন বাড়বে ততবেশি মহাকর্ষ শক্তি প্রবল হবে। অপরপক্ষে নক্ষত্রগুলো হাইড্রোজেন গ্যাস পুড়ে হিলিয়ামে রূপান্তরিত হওয়ার ফলে এদের ওজন হ্রাস পাচ্ছে। যেমন আমাদের সূর্য (একটি নক্ষত্র) প্রতি সেকেন্ডে ওজন হারাচ্ছে ৪ মিলিয়ন টন। এভাবে সকল নক্ষত্র একটি পরিণত দশায় এগিয়ে যাচ্ছে।

অতএব, মহাকাশের স্বতাড়িত সম্প্রসারণ গতি সংকোচনের দিকে ধাবিত হওয়ার জন্য মহাজগতিক বস্তুর গড় ঘনত্ব বৃদ্ধি পাচ্ছে। যার ফলে আকাশী বস্তুগুলো (celestial bodies) মহাকর্ষ শক্তি ক্রমান্বয়ে বাড়ছে। এক সময় এরা একে অপরের কাছাকাছি এসে গেলে মহাকাশের সাতটি অঞ্চল ভেঙ্গে একাকার হয়ে যাবে এবং গ্রহ, নক্ষত্রের মধ্যে পারস্পরিক সংঘর্ষ শুরু হবে।

মহাকাশের পরিণতি সম্পর্কে আল কোরআন বহু তথ্য আমাদের অবহিত কছেন তার মধ্যে নিম্নে কয়েকটি উদ্ধৃত করা হলো।

সেদিন আকাশ মেঘমালা সহ বিদীর্ণ হবে এবং ফেরেশতাগণ অবতীর্ণ হবে। (ফোরকান-২৫)

অতএব তোমরা সেদিনের প্রতীক্ষা করো যেদিন আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া নির্গত হয়ে আকাশকে দৃশ্যমান ধুম্ররাশিতে পরিণত হবে। (দুখান-১০)

এ আয়াতে বলা হয়েছে যে, আকাশ থেকে এক ধরনের ধোঁয়া নির্গত হয়ে আকাশকে আচ্ছন্ন করে ফেলবে। এ কথার অর্থ হলো আকাশে গ্যাসীয়-মেঘ দেখা দেবে এবং ঐ গ্যাসীয় মেঘে সূর্য ঢাকা পড়ে যাবে। এটা সকলের জানা আছে য, দুটি বিপরীত শক্তি সূর্য তা নক্ষত্রসমূহের উপর কাজ করছে। এ দু'শক্তির একটি হলো অভিকর্ষ বল অপরটি বিকিরণ চাপের দরুন প্রসারণ বল। সূর্যের কেন্দ্রে হাইড্রোজেন সংযোজন (hydrogen fusion) ক্রিয়ার কারণে বিকিরণ চাপের উদ্ভব হয়। বর্তমানে এ দু'টি বিপরীত শক্তি সাম্যাবস্থা প্রযুক্ত করে রেখেছে যার দরুন সূর্য কিংবা যে কোন তারকা ভারসাম্যতা লাভ করেছে। যখন সূর্যের মোট হাইড্রোজেনের ১০% হিলিয়াম গ্যাসে রূপান্তরিত হবে তখন সূর্যের ভেতরের সাম্যাবস্থা বিঘ্নিত হবে। বিকিরণ চাপের আধিক্যের ফলে সূর্যের বহিঃ গ্যাসীয় অংশ বিরাট আকারে বিস্তার লাভ করবে এবং ধুম্ররাশিতে ঢাকা পড়ে যাবে আকাশের বিশাল অংশ।

www.pathagar.com

সৌর পরিবার

ছায়াপথ গ্যালাক্সির একটি নক্ষত্র, যাকে এক দৃষ্টিতে তাকানো যায় না। চোখ ঝলসে যায়। তার নাম সূর্য (Sun)। সূর্য তার ১১টি গ্রহ, ৪৮টি উপগ্রহ হাজার হাজার ধুমকেতু এবং লক্ষ লক্ষ গ্রহানু, উল্কা, নীহারিকা প্রভৃতি জ্যোতিষ্ক নিয়ে ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে যে পরিবার গড়ে তুলেছে তার নাম সৌরজগত। ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত বিজ্ঞানীরা সৌরজগতে মোট ৯টি গ্রহ আবিষ্কার করেছিলেন। সে গ্রহগুলির নাম হচ্ছে বুধ, শুক্র, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি, শনি, ইউরেনাস:, নেপচুন এবং প্লুটো।

বর্তমান আমাদের সৌরজগতে আরো ২টি নতুন গ্রহের সন্ধান মিলেছে। তার একটি হচ্ছে ভলকান (Vulcan) অপরটি Planet-x। ফলে সৌরজগতে মোট ১১টি গ্রহ পূর্ণ হয়েছে এবং প্রত্যেক গ্রহ সূর্যকে কেন্দ্র করে ঘুরছে। সৌরজগতের ১১টি গ্রহ সম্পর্কে–

কোরআন অনেক আগেই তথ্য পেশ করেছে

"স্মরণ করুন, যখন ইউছুফ (আঃ) তাঁর পিতাকে বলল, পিতাজী, আমি এক স্বপ্নে ১১টি গ্রহ, সূর্য এবং চাঁদকে দেখেছি। আরও দেখেছি ঐ সব আকাশী বস্তু আমার প্রতি অবনত হতে। (ইউছুফ-৪)।"

"সকল আকাশী বস্তু তাদের কক্ষপথে ঘুরে বেড়ায়। (আম্বিয়া-৩৩, ইয়াসীন-৪০)"

আয়াতে সূর্য এবং চাঁদের কথা উল্লেখ থাকায় উক্ত ১১টি গ্রহ (কাওকাব) অবশ্যই আমাদের সৌরজগতের অন্তর্ভুক্ত গ্রহ। এতে কোন সন্দেহ নেই। আর নবীদের স্বপ্ন এক প্রকার ওহী। যাকে ওহী-এ-গাইরে মতলু বলা হয়।

অসীম অন্তরীক্ষের বিশালতার মধ্যে আমাদের সৌরজগত একেবারে ছোট একটি পরিমণ্ডল। সূর্যকে কেন্দ্র করে গ্রহ, উপগ্রহ, গ্রহাণুপুঞ্জ ধুমকেতু প্রভৃতি যথারীতি আবর্তন করে চলেছে। এসব গ্রহ উপগ্রহের নিজস্ব কক্ষপথ আছে এবং প্রত্যেকে আপন কক্ষপথে অবিরত পাক খায়। এ ঘূর্ণন প্রক্রিয়ায় সূর্যও

www.pathagar.com

স্থির নয়। তারও কক্ষপথ আছে। সে কক্ষপথ ব্যাপী সূর্য তার গোটা পরিবারকে নিয়ে ঘুরে বেড়ায়।

আরবী 'ফালাক' শব্দটি আকাশ এবং কক্ষপথ উভয় অর্থে ব্যবহৃত হয়। সৌরজগতের বাইরে বিজ্ঞানীরা এ যাবত নতুন ১৮টি গ্রহের (planet) সন্ধান পেয়েছেন। সর্বশেষ আবিষ্কৃত গ্রহের নাম HD-75289। এসব গ্রহ আমাদের সৌরজগত থেকে বিস্তর দূরত্বে অবস্থিত এবং এরা সবাই নির্দিষ্ট নক্ষত্রের চতুর্দিকে ঘুরছে।

গ্রহ	সূর্য থেকে দূরত্ব
	কিঃ মিঃ
বুধ	5,79,00.000
শুক্র	10,82,00.000
পৃথিবী	14,88,13.400
বৃহস্পতি	77,83,40.000
শনি	142,70,00.000
ইউরেনাস	186,96,00.000
নেপচুন	449,67,00.000
প্লুটো	590,00,00.000

www.pathagar.com

সূর্য

সৌরজগতের কেন্দ্রে সূর্য অবস্থিত। সকল গ্রহ সূর্যের চার পাশে আবর্তিত হয়। সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে বিজ্ঞানী জোহান্স কেপলার সৌরজগতের গ্রহগুলো সূর্যের চারিদিক যে নির্দিষ্ট নিয়মে আবর্তিত হয়ে থাকে তা প্রমাণ করার জন্য তিনটি সূত্র আবিষ্কার করেন।

: প্রথম সূত্রের ভাষ্য হলো, গ্রহের অক্ষগুলো সূর্যের সঙ্গে এক আলোক-রেখায় উপবৃত্তাকার।'

: দ্বিতীয় সূত্রের ভাষ্য হলো 'প্রত্যেক গ্রহের সাথে সূর্যের যোগাযোগ রেখা একই সময়ের ব্যবধানে সমান ক্ষেত্র অতিক্রম করতে পারে।

: তৃতীয় সূত্রের ভাষ্য, 'যে কোন গ্রহের নক্ষত্রকালের বর্গ তাদের সূর্য থেকে মধ্যবর্তী দূরত্বের ঘন অনুপাতের সমান।'

এ তিন সূত্রের একত্রিকরণ রীতি নিউটন আবিষ্কার করেন। এ তিন সূত্র থেকে তিনি অনুভব করেছিলেন যে, গ্রহগুলো সূর্যের কক্ষপথে টান খাচ্ছে। তাদের টানছে একটি শক্তি যাকে নিউটন মহাকর্ষ শক্তি বলে অবহিত করেছেন।

সূর্য তার অক্ষের চারপাশে আবর্তিত হয় খুব ধীর গতিতে। এটা একটা পার্থক্যধর্মী আবর্তন। এ আবর্তনের ফলে সূর্যের বিভিন্ন অংশের গতিবেগ বিভিন্ন ধরনের হয়ে থাকে। এ ভিন্নধর্মী আবর্তনের সময় সূর্যালোকের অক্ষাংশে সাথে বৃদ্ধি পায়। এ বৃদ্ধির কাল উত্তর দক্ষিণে নিরক্ষ রেখায় ২৭ দিন থেকে ৬০ অক্ষাংশে ৩১ দিন পর্যন্ত স্থায়ী হয়। বর্ণালী বীক্ষণ যন্ত্র দ্বারা যে পরিমাপ পাওয়া যায় তাতে দেখা যায় যে, আবর্তনের সময়কাল বৃদ্ধি পেতে পেতে মেরু অঞ্চল পর্যন্ত পৌছায়।

সূর্য বিষয়ে কোরানিক সূত্র

"তিনি চাঁদ, সূর্য এবং নক্ষত্র সৃষ্টি করে তাঁর আইনের অধীন করে রেখেছেন। কেননা সৃষ্টি যাঁর আইন চলে তাঁর। সুতরাং মহামহিম আল্লাহপাক মহাবিশ্বের প্রভু। (আ'রাফ-৫৪)।"

www.pathagar.com

স্বাভাবিকভাবে আমাদের মনে হয় সূর্য একটি উজ্জ্বল নক্ষত্র হিসেবে সৌরজগতের কেন্দ্রে অবস্থান করছে। আসলে পৃথিবীর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে সূর্যকে এতো উজ্জ্বল এবং তেজদীপ্ত মনে হয়। সূর্যের চেয়ে লক্ষ গুণ উজ্জ্বল নক্ষত্র মহাকাশে প্রতিষ্ঠিত আছে।

যেমন Rigel (বানরাজ) তারা। এটি সূর্য অপেক্ষা ৫০,০০০ (পঞ্চাশ হাজার) গুণ দীপ্ত। S. Doradus-সূর্যের চেয়ে ১০,০০,০০০ (দশ লক্ষ) গুণ ঔজ্জ্বল্যের অধিকারী। এসব নক্ষত্র সুবিশাল দূরত্বে থাকার কারণে পৃথিবী থেকে খালি চোখে এদের উজ্জ্বল রূপ দর্শন করা অসাধ্য। বিজ্ঞানীরা নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা পর্যবেক্ষণ করার জন্য আলোক দুরবীন এবং রেডিও দুরবীন ব্যবহার করে থাকেন।

প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীকে দীপ্তিময় করার জন্য সাত রং মিশ্রিত আলো অপরিহার্য। অন্য সব নক্ষত্র সূর্যের চেয়ে সহস্র লক্ষ গুণ উজ্জ্বল হলেও সাত রংয়ের সমাহারে যে আলো সৃষ্টি হয় তা দিনের আলো সৃষ্টি করার মতো নয়। অথবা ঐসব নক্ষত্রের তেজদীপ্ত আলোক রশ্মিতে পৃথিবীর সব কিছু জ্বলে পুড়ে ভস্ম হয়ে যেতে পারে। তাই অন্য সব নক্ষত্র ব্যতিরেকে সূর্যকে পৃথিবীর নিকটবর্তী করা হয়েছে যাতে আলো এবং তাপের যথার্থ ভারসাম্য বজায় থাকে এবং দিনের আলোতে মানবজাতি জীবনপকরণ তালাশ করতে পারে।

সূর্য যে তারামণ্ডলে অবস্থিত তার নাম ছায়াপথ তারা মণ্ডল (Milky way galaxy)। পৃথিবী থেকে ১৪,৮৮,১৪,৪০০ কিঃ মিঃ দূরত্বে থাকার কারণে সূর্যের আলো বসুন্ধরায় পৌছতে সময় লাগে ৮ মিনিট ১৯ সেকেন্ড। সূর্য এবং অন্যান্য নক্ষত্রের উজ্জ্বলতা সম্পর্কে–

কোরআনিক সূত্র

"তিনি মহামহিম আল্লাহ যিনি অন্তরীক্ষে নক্ষত্র পুঞ্জ সৃষ্টি করেছেন এবং তাতে ঔজ্জল্য ভরে দিয়েছেন এবং চন্দ্রকে করেছেন জ্যোৎস্নাময়। (ফোরকান-৬১)।"

"তিনি আল্লাহ, যিনি সূর্যকে তেজদীপ্ত আলোকবর্তিকা রূপে তৈরি করেছেন এবং চন্দ্রকে করেছেন আলোকিত উপগ্রহ। (ইউনূস-৫)।"

"আর তিনি চাঁদকে আলোর প্রতিফলক হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করেছেন এবং সূর্যকে করেছেন আলোকবর্তিকা। (নুহ-১৬)।"

"আর আমরা দিনে নিদর্শনকে করেছি উজ্জ্বল যাতে এ সময়ে তোমরা তোমাদের রবের অনুগ্রহ (জীবনোপকরণ) তালাশ করতে পার।"

অতএব সূর্যের গড় তাপমাত্রা প্রায় ৬০০০k. এর আলোকময় বহিরাবরণের উর্ধ্বে কয়েক হাজার কিঃ মিঃ দূরে যে অঞ্চল অবস্থিত তাকে বলা হয়

www.pathagar.com

বর্ণমণ্ডল। সূর্যের বর্ণমণ্ডলের বাইরের দিকে অবস্থিত হালকা গ্যাসীয় আবরণকে ছটামণ্ডল বলা হয়, যার বিস্তার প্রায় ১০ সৌর ব্যাসার্ধ। এ ছটামণ্ডল থেকে ইলেকট্রন ও প্রোটন আকারে বস্তুকণা সৌরবায়ু (Solar wind) হিসেবে প্রবাহিত হয়ে থাকে। পৃথিবীর বহির্দেশের বায়ুমণ্ডল যে পরিমাণ সৌর বিকিরণ গৃহীত হয় তাকে বলা হয় সৌর ধ্রুব (Solar constant) যার গড় মান 1.96 cal/min/cm2।

সূর্যের অভ্যন্তরে নিউক্লিয়ার বিক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতি সেকেন্ডে ৫০৮,০০০ বিলিয়ন অশ্ব শক্তি (Horse power) উৎপন্ন হয়। অন্যান্য গ্রহসহ পৃথিবী এবং পৃথিবীর আভ্যন্তরীণ সব কিছু সূর্য থেকে শক্তি লাভ করে জীবিত আছে।

সূর্যের গতি

সূর্য একটি গতিশীল তারা (Star)। পূর্বে ধারণা করা হতো এটি এটি স্থির নক্ষত্র। আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানে তত্ত্ব প্রকাশ করা হয়েছে যে, সূর্য তার নিজস্ব কক্ষপথে আবতন করে ক্ষান্ত নয়। বরং এটি গোটা সৌর পরিবারকে নিয়ে দৈনিক ২,৫৫,৬০,০০০ কিঃ মিঃ বেগে এক অজানা দিগন্ত সন্তরণ করে চলেছে। এ দিগন্তের সীমা সৌরচূড়া (Solar Apex) নামে পরিচিত। বিজ্ঞানীদের মতে সূর্য দৈনিক ২০৮,৬৫,৬০,০০০ কিঃ মিঃ বেগে তার অক্ষপথে ঘুরে এবং এই কক্ষপথ একবার ঘুরে আসতে সময় লাগে ২৫,০০০,০০০ বৎসর। তাহলে সূর্যের কক্ষপথের ব্যাপ্তি হবে ২০৮,৬৫,৬০, ০০০×২৫০,০০০,০০০×৩৬৫,২৫ কিঃ মিঃ। বর্তমানে সূর্যের মোট দুটি গতি (Motion) আবিষ্কৃত হয়েছে।

১। Forward movement

২। Orbital movement

১। Forward movement ১৯২৭ সালে Astronomer Shapley সূর্যের গতিবিধির উপর পরীক্ষা চালিয়ে একটি তত্ত্ব আবিষ্কার করেন এবং তত্ত্বটির নাম দেন Solar Apex (সৌর চূড়া)। এতে তিনি বলেন, 'The sun is moving towards an appinted goal' অর্থাৎ সূর্য একটি নির্ধারিত মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এ তত্ত্বটি কোরআন ৭ম শতাব্দীতে ঐশী ভাষায় বর্ণনা করেছে,

"সূর্য তার নির্ধারিত মঞ্জিলের দিকে অগ্রসর হচ্ছে। এটি সর্বশক্তিমান কর্তৃক আদিষ্ট সীমা যিনি সর্বজ্ঞানের অধিকারী আল্লাহ। (ইয়াসীন-৩৮)।"

২। ছায়াপথ গ্যালাক্সিতে অবস্থিত আমাদের সূর্য ঘুরে নিজস্ব কক্ষপথে। উপবৃত্তাকার ঐ কক্ষপথ সূর্যের ঘূর্ণন গতিবেগ দৈনিক ২০৮,৬৫,৬০,০০০ কিঃ মিঃ এবং একবার গোটা কক্ষপথ ঘুরে আসতে এর মোট সময় লাগে ২৫ কোটি

www.pathagar.com

বৎসর। এ বিশাল ভ্রমণ ব্যবস্থাপনায় কোন প্রকার বিচ্যুতি ঘটবার অবকাশ নেই এবং একটি সুশৃঙ্খল নীতিমালা অনুসরণ করে সূর্য ঘুরে। আল কোরআন সূর্যের orbital movement এবং হিসাব নীতির অনুসরণ সম্পর্কে স্পষ্ট তত্ত্ব প্রকাশ করেছে।

"তিনি রাত আর দিন সৃষ্টি করেছেন এবং চাঁদ আর সূর্য সৃষ্টি করেছেন। সকল আকাশী বস্তু আপন আপন কক্ষে ভ্রমণ রে। (আম্বিয়া-৩৩)।"

"চাঁদ এবং সূর্য যথাযথ হিসাবের অনুসরণ করে চলেছে। (রহমান-৫)।"

সূর্যের পরিণতি

পৃথিবী ও অন্যান্য গ্রহে দিনের আলো বর্ষণকারী সূর্য কখনো নিঃশেষ হবে কি? আধুনিক জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এর জবাবে বলেছেন, 'Yes indeed, the sun will one day be annihilated'।

তাত্ত্বিক গবেষণা থেকে জনা যায় সূর্যের বর্তমান বয়স ৫০০ কোটি বছর থেকে কিছু বেশি। এটি তার প্রথম পর্বের অস্তিত্বগত বয়সের অর্ধেক। অর্থাৎ মোট ১০০০ কোটি বছর অতিক্রান্ত হলে তার প্রথম পর্ব সমাপ্ত হবে। সূর্যের ওজন নির্ণয় করা হয়েছে 2x1030kg. বর্তমান অবস্থায় এটি প্রতি সেকেন্ডে ওজন হারাচ্ছে ৪ মিলিয়ন টন। কেননা সূর্যে প্রতিনিয়ত H_2 গ্যাস দগ্ধ হয়ে হিলিয়ামে (অতি হালকা গ্যাস) রূপান্তরিত হয়ে থাকে। এটি প্রতি সেঃ ৫০৮.০০০ বিলিয়ন অশ্বশক্তি (horse power) পরিমিত হারে বিকিরণ করে, যার মোট ওজন ৫০,০০,০০০ টন।

সূর্যের ব্যাস ১৩,৮৬,৪০০ কিঃ মিঃ। কিন্তু এ ব্যাস ক্রমশই হ্রাস পাচ্ছে। ১৭১৫ সা থেকে ১৯৯৯ সালের মধ্যবর্তী সময়ে পূর্ণগ্রাস-সূর্য গ্রহণ পর্যালোচনা করে দেখা গেছে ২৭৬ বৎসরে এর ব্যাস কমেছে প্রায় ৩৯ সেকেন্ড। এসব তথ্য থেকে সূর্যের একটি অবধারিত পরিণতির ইঙ্গিত পাওয়া যায়। অবশ্য সূর্যের দ্বিতীয় পর্বের বয়স কত হতে পারে হিসাব করা সুকঠিন হলেও সকল বিজ্ঞানী একযোগে বলেছেন সূর্য পৃষ্ঠে মওজুদ সমস্ত হাইড্রোজেন গ্যাস একদিন নিঃশেষ হবেই। তখন সে একটি নিষ্প্রভ নক্ষত্রে পরিণত হবে।

কোরআনিক সূত্র

"তিনি সূর্য এবং চাঁদকে কার্যরত করে রেখেছেন, প্রত্যেকে একটি নির্ধারিত সময় পর্যন্ত সচল থাকবে। আর আল্লাহ সকল সৃষ্টি নিবিড় নিয়মে বাধা। (রাআদ-২)।"

"সেদিন সূর্য নিষ্প্রভ হয়ে পড়বে। (তাকভীর-১)"

www.pathagar.com

সূর্য যখন তার পরিণত দশায় উপনীত হবে তখন সে কোন এক সময়ে স্ফীত হতে থাকবে। স্ফীত হতে হতে এ সময়ে তার আয়তন ভীষণভাবে বেড়ে যাবে। তখন তার চেহারা দেখাবে লাল রঙের অতিকায় গোলকের মতো। জ্যোতির্বিজ্ঞানীরা এ লাল রঙের নক্ষত্রের নাম দিয়েছেন লাল দৈত্য (red giant)। কারণ এরূপ দশায় উপনী হওয়ার পর সূর্য তথা সকল নক্ষত্র তাদের নাক্ষত্রিক চরিত্র হারিয়ে ফেলবে। লাল দৈত্য আসলে প্রবীণ নক্ষত্র যারা বার্ধক্যের সীমায় উপনীত হয়ে মৃত্যুর দিকে এগিয়ে চলেছে। সৃষ্টির গোড়ায় ছিল পরিব্যাপ্ত মহাজাগতিক হাইড্রোজেন মেঘ।

সে মেঘে মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে প্রথমে পুঞ্জিভূত হয়। ক্রমে সংকুচিত, আরো সংকুচিত হয়। এ অবস্থায় ঘনত্ব কিংবা তাপমাত্রা বাড়তে বাড়তে এমন অবস্থায় দাঁড়ায় যার ফলে হাইড্রোজেন নিউক্লিয়াস পরস্পর সংযোজিত হয়ে সৃষ্টি করে হিলিয়াম নিউক্লিয়াস। তখন পুঞ্জীভূত গ্যাস বিকশিত হয়ে ওঠে নক্ষত্র হিসেবে। সংযোজনের সময় নির্গত হয় প্রচণ্ড পরিমাণ তাপশক্তি। এ কারণে হাইড্রোজেনের সংযোজন প্রক্রিয়াকে হাইড্রোজেন প্রজ্বলনও বলা হয়ে থাকে। জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের ধারণা মহাজাগতিক গ্যাস সংকুচিত হয়ে সূর্য নামের নক্ষত্রটি তৈরি হতে সময় লেগেছিল প্রায় ৩ কোটি বছর।

কোন নক্ষত্রের হাইড্রোজেন গ্যাসের জ্বলন কত কাল চলবে সেটা অবশ্য নির্ভর করে তার ভরের উপর। যেমন সূর্যের বর্তমান বয়স ৫০০ কোটি বছরের চেয়ে কিছু বেশি। তার কেন্দ্রীয় অঞ্চলে যে পরিমাণ হাইড্রোজেন সঞ্চিত রয়েছে নিয়মিত জ্বলনের পর তা নিঃশেষ হতে সময় লাগবে ১০০০ কোটি বছর। সৃষ্টির পর থেকে মূলত কেন্দ্রীয় অঞ্চলের হাইড্রোজেনের সংযোজনের কারণে উৎপন্ন হয় প্রচণ্ড তাপশক্তি। তুলনামূলকভাবে কোন নক্ষত্রের ভর যদি সূর্যের ভরের তিন গুণ হয় তাহলে সে নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় হাইড্রোজেন ২ কোটি বছরে নিঃশেষিত হয়। কারণ ভর বেশি হলে মাধ্যাকর্ষণ শক্তিও বৃদ্ধি পায়। তাই কেন্দ্রীয় অঞ্চলের হাইড্রোজেনের উপর আরো বেশি চাপ প্রযুক্ত হয়। সেই অনুপাতে হাইড্রোজেনের জ্বরন চলে খুব দ্রুত গতিতে।

এভাবে হাইড্রোজেন নিঃশেষিত হওয়ার পর নক্ষত্রের কেন্দ্রীয় অঞ্চল মাধ্যাকর্ষণের প্রভাবে আবার সংকুচিত হতে থাকে। তার বাইরে অংশ যাকে জ্যোতিবির্জ্ঞানের ভাষায় বলা হয় 'এনভেলাপ' সম্প্রসারিত হতে শুরু করে। দ্রুত সম্প্রসারণের কারণে তাপমাত্রা কমতে থাকে। এ অবস্থায় কেন্দ্রীয় অঞ্চলে থাকে অবশিষ্ট হাইড্রোজেন। বাইরে হিলিয়াম। এ নিয়ে তৈরি হয় কোর (Core)। প্রচণ্ড সংকোচনের কারণে এ কোর এর তাপমাত্রা দারুণভাবে বাড়তে থাকে। ফলে বহুগুণ উজ্জ্বল হয়। আর বাইরের সে এনভেলপ সমতালে

www.pathagar.com

সম্প্রসারিত হয়ে যায়। এ অবস্থায় আমরা সেই এনভেলপ বা নক্ষত্রের বহিরাংশটিই শুধু দেখতে পাই দৈত্যকার অবস্থায়। অভ্যন্তরের উজ্জ্বল কেন্দ্রীয় অঞ্চল আমাদের চোখের আড়ালে থাকে। সেটি তখন লাল বর্ণ ধারণ করে। তাই এ অবস্থায় নক্ষত্রটিকে বলা হয় Red giant বা লাল দৈত্য।

বলা হয়েছে এমন দশা আমাদের সূর্যের ক্ষেত্রে অবশ্যই ঘটবে। অন্তত ৫০০ কোটি বছর পর তার কেন্দ্রীয় অঞ্চলের ঔজ্জ্বল্য বেড়ে দাঁড়াবে এখনকার চেয়ে প্রায় ১০০০ গুণ বেশি। ঐ অবস্থায় পৃথিবীর তাবৎ জীবজগত ভস্মীভূত হয়ে যাবে। সূর্যের বাইরের অংশের এখন তাপমাত্রা ৬০০০ ডিগ্রি k। তখন তার তাপমাত্রা হ্রাস পেয়ে দাঁড়াবে ৩০০০ ডিগ্রি k-এ। ব্যাসার্ধ এখনকার চেয়ে প্রায় ১০০ গুণ বেশি হবে। এ অবস্থায় সে বুধ ও শুক্র গ্রহকে গিলে ফেলবে। তারপর দ্বিতীয় পর্যায়ে সূর্যের কেন্দ্রীয় অঞ্চলের হিলিয়াম সংযোজনের কারণে যখন নিঃশেষিত হতে থাকবে, তার বহিরাংশের আয়তন আরো বেড়ে যাবে। তখন এগিয়ে আসবে পৃথিবীর দিকে।

কোরানিক সূত্র

"আর যখন আকাশ বিচূর্ণ হয়ে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে, তখন সেটা রক্ত রঞ্জিত চামড়ার মতো রূপ পরিগ্রহ করবে। (রহমান-৩৭)।"

"নিশ্চয়ই বিশ্বাসকারীদের জন্য পৃথিবীতে রয়েছে অনেক নিদর্শন।

(যারিয়াত-২০)।"

সূর্য সৃষ্টির সাথে সাথে পৃথিবী সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু হয়। বহু পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে পৃথিবী আজকের অবস্থান এসে পৌছেছে। সৌরজগতে তৃতীয় গ্রহ আমাদের পৃথিবী প্রায় ৪৬০০ মিলিয়ন বছর আগে যাত্রা শুরু করে। তাপমাত্রা পাওয়ার পরে তাকে একটি তরল ব্যবস্থা অতিক্রম করতে হয়। পরবর্তী ১০০০ মিলিয়ন বছর পর এর অধিকাংশ এলাকায় শক্ত আবরণ সৃষ্টি হয়। এক সময়ে পৃথিবীর উপরিভাগ ঠাণ্ডা হলো এবং জলীয় বাষ্প জমে ঘনীভূত হয়ে প্রচুর বৃষ্টিপাত শুরুহলো। এ বৃষ্টির পানিতে সৃষ্টি হলো নদী, লেক, সাগর ও মহাসাগর।

এটা লক্ষ্য করে বিস্ময়বোধ করতে হয় যে, সৌরজগতে ৯টি বড় ধরনের গ্রহ ভিন্ন ভিন্ন দুরত্ব বজায় রেখে সূর্যের চারিদিকে ঘুরছে। সে-ই গ্রহগুলোর মধ্যে কেবলমাত্র পৃথিবীতেই প্রাণের সৃষ্টি ও বৃদ্ধির সহায়ক ব্যবস্থা আছে। বড় বড় গ্রহগুলোর মধ্যে পৃথিবীর একমাত্র ঐ তাপমাত্রা আছে যা খুব বেশি গরমও নয়, খুব বেশি ঠাণ্ডাও নয়।

যার ফলে এখানে জীবন বেড়ে চলেছে অবিচ্ছিন্নভাবে। একমাত্র পৃথিবীতেই পানি ও বায়ুমণ্ডল রয়েছে। বায়ুমণ্ডলে আছে সুষম প্রাকৃতিক গ্যাসসমূহ। যা

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com

যথা, অক্সিজেন (O_2), নাইট্রোনে (N_2), কার্বন-ডাই-অক্সাইড (Co_2), আরগন (Ar) ইত্যাদি।

(N2)- 78.08%

(O-2) 20.95%

(Ar)-0.03%

(Co2)- 0.03%

অন্যান্য - O.01% 100%

গ্যাসসমূহের উল্লেখিত শতকরা হার বিদ্যমান না থাকলে মানুষ, উদ্ভিদ ও প্রাণী জগত অস্বস্তিকর পরিস্থিতির শিকার হয়ে বিলিন হয়ে যেত। তাদের জন্ম, বৃদ্ধি ও সমৃদ্ধি সম্ভব হতো না।

পৃথিবী ছাড়া অন্য কোন গ্রহে প্রাণের সহায়ক অবস্থা বিদ্যমান নেই। বরং সে সব গ্রহে আছে জীবন বিনাশী গ্যাসসমূহ। যথা : এ্যামোনিয়া মিথেন, হাইড্রোজেন, হিলিয়াম, ইত্যাদি।

"আমি-ই তোমাদেরকে ভূ-পৃষ্ঠে প্রতিষ্ঠিত করেছি, আর তাতে জীবিকা নির্বাহের যাবতীয় সামগ্রী পরিপূর্ণ করে দিয়েছি। তোমরা তো আল্লাহর প্রতি খুব কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (আ'রাফ-১০)।"০

"তিনি ভূ-পৃষ্ঠকে তোমাদের জন্য নমনীয় করেছেন যার উপর তোমরা বিচরণ কর এবং তার দেয়া রিযিক উপভোগ কর যা তিনি বিন্যস্ত করে রেখেছেন। অতএব তার প্রতি পুনরুজ্জীবিত হতেই হবে। (মূলক-১৫)।"

সূর্য থেকে পৃথিবীর দূরত্ব ১৪,৮৮,১৪,৪০০ কিঃ মিঃ এবং এটি সূর্যের চেয়ে তের লক্ষ গুণ ছোট। পৃথিবীর ব্যাস ১২৭৬৫ কিঃ মিঃ এবং ওজন 6×1024 কিলোগ্রাম। এ ওজন ক্রমেই বেড়ে চলেছে। কারণ পৃথিবীর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অবিরত মহাজাগতিক ধুলি (Cosmic Dust) পতিত হচ্ছে। By the earth and by Him Who spread it.

শপথ পৃথিবীর এবং যিনি তা বিস্তৃত করেছেন, তাঁর। (শামস-৬)।

www.pathagar.com

References:

1. Scientific indicatorns in the Holy Quran.
   Dr. M. Shamsher Ali and others; Islamic Foundation, Bangladesh
2. Earth Science, Edeward J. Tarbuck & Frederic K. Lutgens. Merill publich Co. A. Bell & howell information Co. Toronto. London. Columbus. 5th edition. edn.
4. Scientific Magazine.
5. The first three Minutes: Steven weindberg: Flamingo 1993
6. The Ultimate fate of the Univers: Jamal N. Islam, 1st Published 1983
7. Al-Quran and modern science: Mulla Shamsuddin Ahmed. 1st edn. Jan.1992
8. Towards Deeper understanding of Al-Quran. Md. Ferdoues Khan. 1st edn. April 1994.
9. The Holy Quran; Abdullah Yusuf Ali
10. Science Encyclopdia; Vov-2; Bangla Academy, Dhaka.
11, Bigganmoy Quran by – md Abu taleb

www.pathagar.com

www.pathagar.com

www.pathagar.com